শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে

প্রথম খণ্ড

সঙ্কলক ও সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী মুমুক্ষানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩
E-mail : info@udbodhan.org

প্রথম সংস্করণ
শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি
২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
মাঘ ১৪১১/February 2005

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ
অগ্রহায়ণ ১৪১৪
December-2007
2M2C

ISBN 81-8040-072-7 (Set)
ISBN 81-8040-073-5 (Vol.-I)

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০০৩০

সূচীপত্র

দ্বিতীয় পর্ব

প্রকাশকের নিবেদন

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ভক্ত ও পাঠক-সাধারণের নিকট অতি আদরণীয় ও প্রিয় একটি গ্রন্থ। কিছুকাল আগে প্রকাশিত স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত 'মাতৃদর্শন' গ্রন্থটিও বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে। দুটি গ্রন্থই শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে স্মৃতিনিবন্ধের সঙ্কলন। বলা যাইতে পারে, দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রথমটির অর্থাৎ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র সম্প্রসারণ। 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' নামে বর্তমান গ্রন্থটিও শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে বিভিন্ন স্মৃতিনিবন্ধের সঙ্কলন। সুতরাং এটিও পূর্বোক্ত ধারায় নূতনতর সংযোজন।

বস্তুতঃ ভক্তদের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে স্মৃতিকথার একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। সেজন্য 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র বাহিরে পরবর্তী কালে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাগুলি সংগ্রহ এবং একত্র-প্রকাশের একটি পরিকল্পনা আমাদের রহিয়াছে। 'মাতৃদর্শন' এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' সেই পরিকল্পনার ফলিত রূপ। শেষোক্ত অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থটি একাধিক খণ্ডে প্রকাশ করিতে আমরা পরিকল্পনা করিয়াছি। বর্তমানে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীশচন্দ্র সান্যালের স্মৃতিনিবন্ধটি ভিন্ন প্রথম খণ্ডের সবগুলি স্মৃতিনিবন্ধই পূর্বপ্রকাশিত। 'উদ্বোধন', 'Prabuddha Bharata', 'Vedanta Kesari', 'Vedanta for the East and West', 'সমাজশিক্ষা', 'বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র স্মরণিকা' পত্রিকায় এবং 'Sri Sarada Devi : The Great Wonder' ও 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে স্মৃতিনিবন্ধগুলি পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক নিবন্ধের শেষে উহার মূল বা আকর নির্দেশ করা হইয়াছে।

গ্রন্থটির বর্তমান খণ্ড দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে আঠারোটি এবং দ্বিতীয় পর্বে চারটি স্মৃতিনিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রথম পর্বের স্মৃতিনিবন্ধগুলি বাঙলায় লিখিত, দ্বিতীয় পর্বের স্মৃতিনিবন্ধগুলি মূল ইংরেজী হইতে বাঙলায় অনূদিত। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম স্মৃতিনিবন্ধটি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের। তাঁহার স্মৃতিনিবন্ধের শিরোনাম অনুসারে গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়াছে।

আশা করি, গ্রন্থটি ভক্ত ও পাঠক-সাধারণের কাছে আদরণীয় হইবে।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদকের নিবেদন

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র সম্প্রসারণ হিসাবে শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নির্ভরযোগ্য স্মৃতিকথা সংগ্রহ ও সঙ্কলনের যে-পরিকল্পনা উদ্বোধন কার্যালয় থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল তার প্রথম প্রয়াস স্বামী চেতনানন্দ সঙ্কলিত 'মাতৃদর্শন' গ্রন্থটি। বর্তমান গ্রন্থটি ঐ ধারায় পরবর্তী সংযোজন। এখানে সর্বমোট বাইশটি স্মৃতিকথা সঙ্কলিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আঠারোটি স্মৃতিকথা বাঙলায় লেখা এবং চারটি ইংরেজী থেকে অনূদিত। বাঙলায় লেখা স্মৃতিকথাগুলি প্রথম পর্বে এবং ভাষান্তরিত স্মৃতিকথাগুলি দ্বিতীয় পর্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে এসেছেন অথবা শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছেন এমন সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত স্মৃতিকথাগুলি সংগ্রহ করতে শুরু করি গত আশির দশকের প্রথম থেকে। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত কয়েকটি স্মৃতিকথা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার প্রস্তাব জানালে ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সানন্দে সম্মতি দেন এবং সেগুলির মধ্যে দুটি 'শতরূপে সারদা'র মূল অংশে এবং কয়েকটি 'পরিশিষ্টে'র স্মৃতিকথা-পর্বে গ্রথিত হয়। পরে আরও কিছু স্মৃতিকথা সংগ্রহ করতে সমর্থ হই এবং সেই সংগ্রহ থেকে বিগত কয়েক বছরে 'উদ্বোধন'-এ কয়েকটি প্রকাশিতও হয়েছে। 'উদ্বোধন', 'শতরূপে সারদা' এবং অন্যত্র প্রকাশিত স্মৃতিকথাগুলিকে একসঙ্গে গ্রন্থবদ্ধ করে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'র সম্প্রসারণ হিসাবে আমরা ভক্তদের কাছে তুলে ধরলাম। আমাদের কাছে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের আরও যেসব স্মৃতিকথা ও সংশ্লিষ্ট উপাদান রয়েছে তাতে মনে হয় এই গ্রন্থের আরও দুটি খণ্ড হতে পারবে। সে-দুটির প্রস্তুতির কাজ চলছে। নয়াদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশনে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮১ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ যে-মাতৃপ্রসঙ্গ

করেছিলেন প্রধানতঃ সেটি স্বামী বুধানন্দ 'Sri Sarada Devi : The Great Wonder' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন। সেখানে স্মৃতিপ্রসঙ্গটির কোন শিরোনাম ছিল না। পরে 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে স্বামী লোকেশ্বরানন্দ তার যে বঙ্গানুবাদ করেন (বঙ্গানুবাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুমোদিত) সেখানেও কোন শিরোনাম ছিল না। বর্তমান গ্রন্থে উক্ত নিবন্ধের শিরোনামটি আমরা দিয়েছি এবং ঐ শিরোনামটিই গ্রন্থের নাম হিসাবে নির্বাচন করেছি।

এই সঙ্কলন-গ্রন্থটির জন্য 'উদ্বোধন' ভিন্ন যেসমস্ত পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে রচনা সংগ্রহ করেছি (সেগুলির প্রত্যেকটি সংশ্লিষ্ট নিবন্ধের শেষে উল্লিখিত হয়েছে) যেমন, 'Prabuddha Bharata', Vedanta Kesari', 'Vedanta for the East and West', 'সমাজশিক্ষা', 'বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র স্মরণিকা', 'Sri Sarada Devi : The Great Wonder' এবং 'শতরূপে সারদা'—প্রত্যেকটির সংশ্লিষ্ট প্রকাশকের কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৪ — স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
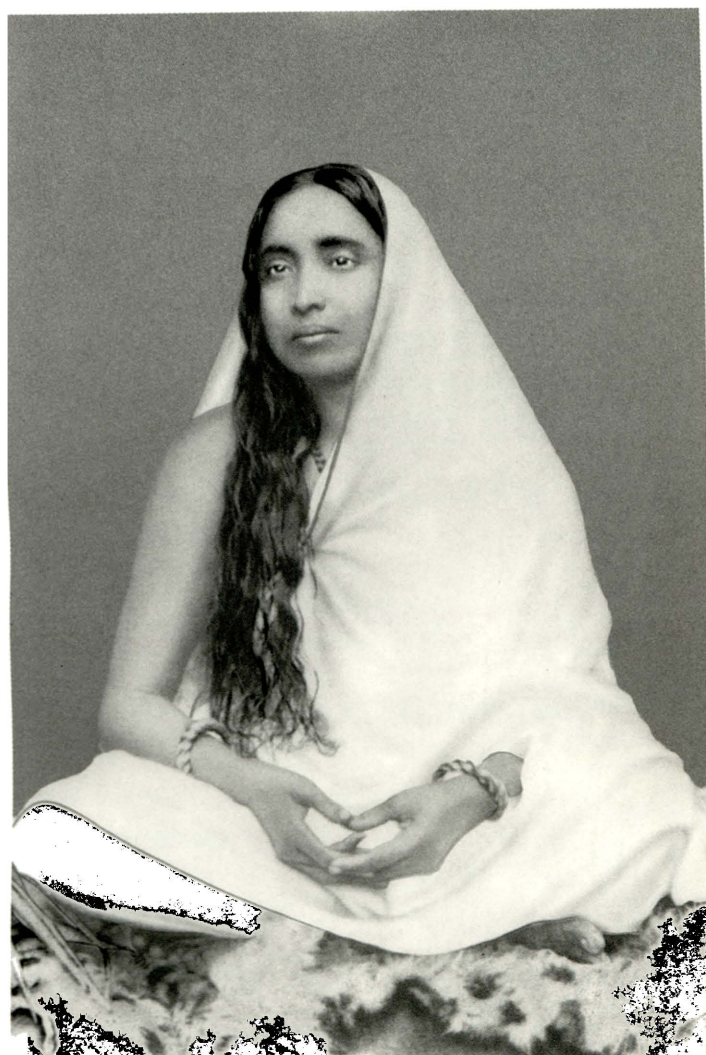
প্রথম পর্ব

"তোমার লিখিবার শক্তি আছে। কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপে লিখিলে লোকে ঠিক ঠিক [শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষত্ব, বক্তব্য, আচরণ এবং বাণীর তাৎপর্য] বুঝিতে পারিবে এবং কোন্ ঘটনার কতদূর প্রকাশ করা কর্তব্য—এই সকল বিষয়ে শিক্ষা করিতে হইবে। লেখনী অনেকস্থলে সংযত রাখিতে হয়।" —স্বামী সারদানন্দ

"শ্রীশ্রীমায়ের কথা যদি উদ্ধৃত কর, তবে খুব হিসাব করে করবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উল্লেখ করতে পার, কিন্তু তাও খুব সতর্কতার সঙ্গে করবে।" —স্বামী সারদানন্দ

ঐশ্বর্যময়ী মা

স্বামী হরিপ্রেমানন্দ

একদিনের ঘটনা বলি। সাল, তারিখ মনে নেই। আর সাল, তারিখের দরকারই বা কী? মায়ের ভাইঝি রাধু অনেকদিন থেকে একটা দুরারোগ্য রোগে ভুগছিল। ভুগতে ভুগতে চেহারা হয়েছে কঙ্কালসার। কথা বলতে পর্যন্ত পারে না, গলা থেকে চিঁচিঁ আওয়াজ বেরোয়। মায়ের বড় দয়া হলো। বললেন: "হরি, চল তো আমার সঙ্গে—মেয়েটাকে নিয়ে বাঁকুড়া যাই। বাঁকুড়ায় বৈকুণ্ঠ আছে, অ্যালোপ্যাথিক এম. বি. ডাক্তার, কিন্তু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে। খুব নাম হয়েছে।" তাঁর কথার মধ্যেই বাধা দিয়ে বললাম: "বৈকুণ্ঠ মানে বৈকুণ্ঠ মহারাজ? স্বামী মহেশ্বরানন্দ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। তুই তো বাঁকুড়া শহরে থাকিস। নিশ্চয় চিনিস।"

"হ্যাঁ, খুব চিনি। বাঁকুড়া মঠের অধ্যক্ষ। হোমিওপ্যাথিতে ধন্বন্তরী।"

"হ্যাঁরে। ওর কথাই বলছি।"

তা, মা তো এলেন ভাইঝিকে নিয়ে। আমি এলাম ওঁদের সঙ্গে। বাঁকুড়া মঠে তখন ঘরবাড়ি বিশেষ হয়নি। বাইরের লোককে, বিশেষ করে মেয়েদের থাকতে দেবার মতো জায়গা মোটেই ছিল না। তাই ফীডার রোডে একটা ছোট ঘর ভাড়া নেওয়া গেল। সেখানেই মায়ের ভাইঝির চিকিৎসা হতে লাগল। ঘরে মাত্র দুটি কামরা। একটিতে থাকে রুগী, আরেকটিতে মা আর আমি। সেদিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার মহারাজ (স্বামী মহেশ্বরানন্দ) রুগী দেখে ফিরে গেছেন। আমাদের কামরায় একটা ছোট টুল ছিল; মা তার ওপর বসে আছেন। আমার কী মনে হলো, মায়ের দুটি পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। শুষ্ক

দুখানি পা। মায়ের শরীর তখন জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ মনে প্রশ্ন জাগল—মা কি সত্যিই জগজ্জননী? জগজ্জননীর এমনি শিরা-বের-করা পা? প্রশ্নটা মনে উদয় হলেও মুখে কিছুই বলছি না। পায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে অনুভব করতে লাগলাম, এ তো একজন বৃদ্ধার শীর্ণ পা নয়, এক যুবতী নারীর সুপুষ্ট পা। কাছেই একটা হ্যারিকেন জ্বলছে; তার আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, আলতা-পরা অপরূপ দুটি চরণ, ঘন-সন্নিবিষ্ট পরিপুষ্ট অঙ্গুলিতে অর্ধচন্দ্রের মতো পদনখের শোভা। দুই চরণে সোনার নূপুর— নূপুরে খচিত রয়েছে মণি-মুক্তা।—এ কার পদসেবা করছি আমি!

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চরণ থেকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করলাম মায়ের মুখের ওপর। তাকিয়ে দেখি—স্বর্ণকান্তি, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা, নানা অলঙ্কার-শোভিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি! মাথায় মুকুট, হাতে অস্ত্র! তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপরূপ জ্যোতি! ভাল করে দেখবার আগেই 'মা' 'মা' বলে চৈতন্য হারালাম। কতক্ষণ যে ঐ অবস্থায় ছিলাম, কে জানে। যখন চেতনা ফিরে এল তখন দেখি, মা আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলছেন: "ও হরি, ও হরি, কি হলো তোর? ওঠ। ওঠ।"

উঠে বসলাম। দেখলাম, শীর্ণদেহা বৃদ্ধা মা রোগ-যন্ত্রণাকাতর ভাইঝিটির দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। এই আমাদের জগজ্জননী, মা সারদামণি, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী। জয় মা! জয় ঠাকুর!*

* উদ্বোধন, ৮৮তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৯৩

মাতৃসমীপে

স্বামী সারদেশানন্দ

প্রথমবার যখন মাকে দর্শন করতে উদ্বোধনে যাই তখন মা দেশে। তাই মাকে দর্শনের সৌভাগ্য সেবার আর হলো না। পূজনীয়া গোলাপ-মা তখন সেখানে। তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করলে তিনি, আমরা এত দূরদেশ থেকে কষ্ট করে এসেছি শুনে, বিশেষ স্নেহ ও সহানুভূতি দেখালেন এবং মায়ের দর্শন হলো না বলে দুঃখ করতে লাগলেন। আমরা তাঁর দর্শনেই আনন্দ প্রকাশ করলে গোলাপ-মা হেসে বললেন ঃ "মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।" তখন মায়ের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানতাম না। শুনেছিলাম ঠাকুরের সহধর্মিণী বেঁচে আছেন, উদ্বোধনে থাকেন। ভক্তরা তাঁকে দর্শন করেন এবং তিনি কোন কোন ভক্তকে দীক্ষাও দিয়ে থাকেন। কিন্তু উদ্বোধনেই গোলাপ-মার কথায় বুঝলাম, মা কিছু ভিন্ন প্রকৃতির এবং তাঁকে দর্শন করা খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে বলতে শুনি ঃ "মা আর ঠাকুর কি আলাদা ?" এই উক্তি শোনার পর মাকে দর্শন করার জন্য আমার মনে বিশেষ আগ্রহ হয়।

এরপর একবার মায়ের দর্শনে যাব বলে গাড়ি করে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাই, কিন্তু যে-বন্ধু গাড়িতে তুলে দিতে গিয়েছিল হঠাৎ পড়ে গিয়ে তার একটি হাত ভেঙে যায়। তখন তাকে নিয়েই আবার বাসায় ফিরে আসতে হয়। এর প্রায় দুবছর পরে আমার জনৈক বন্ধু (পরে স্বামী জ্ঞানানন্দ), তিনি তখন নবাসন গ্রামে ছিলেন, পত্র লিখে জানান, জয়রামবাটীতে গিয়ে মাকে দর্শন ও তাঁর কৃপালাভের বিশেষ সুবিধা। ইতিমধ্যে আমার বিশেষ শুভানুধ্যায়ী দুজন সুহৃদ মায়ের কৃপালাভ করেছেন—একজন উদ্বোধনে, অপরজন জয়রামবাটীতে। তাঁদের

মুখে মায়ের কথা শুনলাম। একদিন স্বপ্নে মায়ের দর্শন হলো। আকস্মিকভাবে মায়ের তিনখানি ফটোও পেলাম। তখন মায়ের ফটো পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। জয়রামবাটীতে পূর্বোক্ত বন্ধুর সঙ্গে প্রথম যেদিন সকালবেলায় উপস্থিত হই, মা সেদিন কালীমামার বাড়িতে ছিলেন। মায়ের ঘরের দরজায় জিনিসপত্র রেখে ঠাকুর প্রণাম করে আমরা কালীমামার বাড়ির দরজার সামনে এসেছি, মা-ও তখন সেই বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন। আমাদের দেখেই দরজার সামনে যে বিরাট পাথরের টুকরো আছে তাতেই বসে পড়লেন—নিচে পা মেলে, কোলের ওপর হাত দুখানা রেখে। পরনে লাল নরুনপেড়ে সাদা কাপড়। মাথায় আধা ঘোমটা টানা, ডানদিক অনাবৃত। অল্প কোঁকড়ানো চুলের রাশি ডান কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে। হাতে বালা, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে লোহার আংটি, গলায় খুব সরু রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে, উন্নত দেহ। তখন তাঁকে বেশ সুস্থ-সবল মনে হয়েছিল। প্রসন্নবদনে মৃদু হেসে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন : "এ ছেলেটি কে গো ?" বন্ধু উত্তর দিলেন : "মা, আপনারই ছেলে, আমার বাল্যবন্ধু।" দুজনে মাকে প্রণাম করলাম। মা আমাদের স্নেহাশীর্বাদ জানিয়ে ডেকে ঘরে নিয়ে চললেন। মায়ের রূপ দেখলাম, কথা শুনলাম—মা সত্যিই মা। মনে পড়ে গেল স্বপ্নে দেখা সেই মুখের কথা। অজানা অচেনা কোথাও এসেছি বলে মনে হলো না। এক মুহূর্তেই আপনার হয়ে গেলাম। ভয় ভাবনা সঙ্কোচ সব কাটিয়ে দিলেন। প্রসাদ পাবার সময় মা নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। নানা কথা হলো। আমার বন্ধুটি কথাপ্রসঙ্গে বললেন : "ওর [লেখকের] কাছেই আমি প্রথম ঠাকুরের কথা শুনেছিলাম।" আমিও বললাম : "আবার ওই আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।" মা শুনে খুব খুশি হয়ে বন্ধুকে ডেকে বললেন : "ভালই হলো, ও তোমার উপকার করেছিল, তুমি আবার ওর উপকার করলে।"

মায়ের করতল ছিল রক্তাভ, অনেকেই তা দেখার সুযোগ পেয়েছেন। পদতলও ছিল লাল—ঠিক স্থলপদ্মের আভা। মাথায়

ছিল সুদীর্ঘ ঘন কালো একরাশ চুল। সূক্ষ্ম রেশম সুতোর মতো উজ্জ্বল, মসৃণ। সামনের দিকটা অল্প কোঁকড়ানো। সুগঠিত মুখে দীর্ঘ নাসা—অপূর্ব সুন্দর। দৃষ্টি প্রশান্ত, স্থির, কৃপা-মাখানো—যা সকলের অন্তরে সর্বদা করুণা-বর্ষণ করত। প্রশস্ত উজ্জ্বল কপাল, প্রসন্ন মুখ—দেখলেই চিত্ত শান্ত হয়। শ্যামগৌর রঙ প্রথমে ছিল উজ্জ্বল, শেষ বয়সে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। চেহারা ছিল লম্বা। হাত-পাও অপেক্ষাকৃত লম্বা। একটু বাঁদিকে কাত হয়ে চলতেন ধীরে ধীরে। পরে হাঁটুতে বাত ধরেছিল।

সন্ন্যাসী ও গৃহী সকল সন্তানের উপরই ছিল মায়ের সমান স্নেহ-ভালবাসা। গৃহস্থ সন্তানেরাও যখন মায়ের কাছে এসেছেন কখনো তাঁদের মনে হয়নি যে, তাঁদের প্রতি মায়ের কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ হচ্ছে বা স্নেহমমতার কিছু কমতি আছে। মায়ের সহানুভূতি ও সমবেদনা তাঁদের সুখ-দুঃখের সংসারযাত্রায় অন্তরের দুঃখ-বেদনা লাঘব করত ও আনন্দ-উৎসাহ বৃদ্ধি করত। মা অনেকেরই বাড়িঘর, পরিবার-পরিজন, চাকরি-রোজগার, সাংসারিক অবস্থার খোঁজ নিতেন। তাঁরা কোন সমস্যার কথা নিবেদন করলে মা তা মনোযোগ দিয়ে শুনে সঠিক কর্তব্য নির্দেশ করতেন ও উপদেশ দিতেন।

কী আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল মায়ের, ভেবে অবাক হয়ে যাই। জয়রামবাটীতে বিভিন্ন স্থানের ভক্ত সমাগত হলে মা রাঁধুনী-মাসীকে ঠিক বলে দিতেন, কে কি খাবে, কতটা খাবে, এমনকি রুটির সংখ্যা পর্যন্ত! তাই মায়ের বাড়িতে, মায়ের কাছে খেয়ে ছেলেমেয়ের এত তৃপ্তি! ঠাকুরের কথায় : 'মা ঠিক জানে, কোন্ ছেলের পেটে কি সয়!'

জয়রামবাটীতে দেখা যেত, সব পুরুষ-ভক্তকে খাইয়ে পরে স্ত্রী-ভক্তদের নিয়ে মা নিশ্চিন্তে আহার করতে বসতেন। দৈবাৎ কোন কাজের জন্য কোন ছেলে বাইরে গেলে, সে না ফেরা পর্যন্ত, যত বেলাই হোক, মা অপেক্ষা করতেন। রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতেন,

এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেন—"বাছা এত বেলা পর্যন্ত খায়নি, খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে"।

উদ্বোধনে কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার! ছেলেদের না খাইয়ে মা খাবেন না। আর গুরুগতপ্রাণ নিষ্ঠাবান ভক্ত সারদানন্দ ইষ্টদেবীর আহারের আগেই বা কিভাবে খাবেন! সেজন্য ব্যবস্থা হয়েছে, মা মেয়েদের নিয়ে একটা ঘরে আহারে বসবেন, আর শরৎ মহারাজ ছেলেদের সঙ্গে বসবেন অন্য একটি ঘরে, একই সময়ে। মা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দেরিতে খাওয়া অভ্যাস। সেজন্য শরৎ মহারাজেরও হাতের কাজ শেষ হতে হতে বেলা হয়ে যায়! শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ প্রথমে মায়ের পাতে পরিবেশন করা হলো। মা তাড়াতাড়ি মুখে দিয়ে শরতের জন্য মহাপ্রসাদ করলেন। গোলাপ-মা সে প্রসাদ এনে দিলেন মহারাজকে। ভাগ্যবান সঙ্গীরাও সে প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হলো না।

একবার জয়রামবাটীতে মায়ের জন্মদিনে ভক্তগণের ইচ্ছা হলো মা প্রথমে খাবেন, সন্তানেরা পরে প্রসাদ পাবে। একজনের[১] উৎসাহ বেশি। অগ্রণী হয়ে মাকে এই আকাঙ্ক্ষার কথা জানাল। মা আজ আর কোন আপত্তি করলেন না, নীরবে সায় দিলেন। ঠাকুরের ভোগের পর থালায় সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য সাজিয়ে দিয়ে আসনের সম্মুখে রেখে তাঁকে ডাকলে তিনি ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিতের মতো আসনে গিয়ে বসলেন। করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত দ্রব্য দেখলেন, এটা-ওটা একটু-আধটু মুখে দিলেন। তারপর সামনে যে সন্তানটি ছিল তার মুখের দিকে চেয়ে অতি কাতরভাবে বললেন: "ছেলেদের খাওয়ার আগে গলার নিচে যায় না, তাড়াতাড়ি তোমাদের খাবার ব্যবস্থা কর।" এই বলেই হাতমুখ ধুয়ে উঠে পড়লেন এবং নিজের ঘরে এসে দরজার গোড়ায় ছেলেদের খাওয়া দেখতে বসলেন। সব ব্যবস্থাই ঠিক ছিল, মুহূর্তের মধ্যেই ছেলেরা খেতে বসল। মায়ের প্রাণ ঠাণ্ডা হলো। যে আহাম্মক-সন্তান অগ্রণী হয়ে মাকে আজ আগে খেতে রাজি

---

১ লেখক স্বয়ং—সম্পাদক।

করিয়েছিল এবং বিশেষ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, এতক্ষণে তার হুঁশ হলো, তাইতো কি কাজ করলাম ! আজ মায়ের খাওয়া নষ্ট করলাম ! প্রতিদিনের মতো ছেলেদের খাওয়ার ব্যবস্থা আগে করে পরে মেয়েদের সঙ্গে তাঁকে বসালেই তো ভাল হতো। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে সোয়াস্তিতে খেতে পারতেন। হায় ! ঐশ্বর্যের দাস আমরা। এই মাধুর্যলীলার কথা কি করে বুঝব ? তাঁকে ঠাকুর-দেবতা সাজিয়ে পূজা-ভোগরাগের ব্যবস্থা করে নিজেদের ঐশ্বর্য-লিপ্সার রসাস্বাদন করি; কিন্তু তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের আবরণ ভেদ করে শুদ্ধ মাধুর্যময় মানুষ-শরীর ধারণ করেছেন, আমাদের মা হয়ে এসেছেন তাঁর স্নেহামৃত পান করাবার জন্য—একথা আমরা বিশ্বাস করতে ও বুঝতে পারলাম কই ?

সন্তানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে ছিল মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ছেলেদের শুকনো মুখ, দীন বেশ, ক্ষীণ শরীর মা দেখতে পারতেন না। তাই উদ্বোধনে ছিল সকলের জন্য প্রতিদিন মাছের ব্যবস্থা। কারণ বাঙালী ছেলেদের মাছ না হলে পেট ভরে না। আহারের পরে সকলেই পান খাবে, তাই মা নিজেই পান সেজে রাখতেন। আবার, যারা পান বেশি ভালবাসত তারা বেশি পেত। ছেলেরা মুখ ভরে পান চিবাচ্ছে দেখলে মা ভারী খুশি। ছেলেদের সাদা থান-ধুতি পরা মায়ের মোটেই পছন্দ ছিল না। ভক্তেরা তাঁকে অনেক সরু-পাড়ওয়ালা কাপড় দিতেন, তাঁর নিজের ছিল সামান্যই প্রয়োজন। সেইসব কাপড় অকাতরে বিলিয়ে দিতেন ছেলেদের। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ সৌখীন, মা জানতেন। তাকে মিহি সুন্দর-পাড় কাপড় দিতেন। যে মোটা ভালবাসে তাকে তাই দিতেন। কারও কারও কাপড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়—মা তাকে বেশি কাপড় দিতেন। খাওয়া, জল খাওয়া সব ব্যাপারেই যে যেমন চাইত, যার পেটে যেরূপ সহ্য হতো মা তাকে ঠিক সেই রকমই দিতেন।

উদ্বোধনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ বিভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু সকলেই মায়ের সন্তান, মায়ের স্নেহের সমান অধিকারী। তাঁদের সকলেরই

খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধার জন্য মা বিশেষভাবে ভাবতেন। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। উদ্বোধনের ডাক্তার মহারাজ (স্বামী পূর্ণানন্দজী) রাত্রে কোন কোন দিন ঠিক সময়ে খেতে আসতে পারতেন না এবং সেজন্য গঞ্জনাও ভোগ করতেন। একদিন খুব বেশি দেরি হওয়াতে গঞ্জনা খুব বেশি হলো দেখে মা তাঁকে আড়ালে ডেকে সস্নেহে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। স্বামী পূর্ণানন্দ মায়ের স্নেহের স্পর্শে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ "রাজা মহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর] আদেশ, 'নিত্য দশ হাজার জপ করবে, সংখ্যা ঠিক রেখে, এবং ভুল হলে প্রথম থেকে পুনরায় জপ করবে। সংখ্যা ভুল হলে জপের ফল রাক্ষসে খেয়ে ফেলে'।" মা রাক্ষসে খাওয়ার কথা শুনে হেসে উঠলেন এবং বললেন ঃ "বাবা! তোমরা ছেলেমানুষ, চঞ্চল মন, একাগ্রচিত্ত হয়ে জপ করার জন্যই রাখাল এরকম বলেছে। তা বাবা! আমি বলছি, খাবার ঘণ্টা বাজলেই তুমি ঠিক সময়ে চলে এসে খাবে, জপের সংখ্যা পূর্ণ না হলেও দোষ হবে না। পরে আবার সুবিধামত জপ করো।" মায়ের ভরসা পেয়ে সন্তান নির্ভয় হলেন এবং যথাসময়ে খেতে আসতে লাগলেন।

মা প্রতিদিন সকালের পুজোর পর প্রসাদী মিশ্রির সরবত একটু খেতেন। এ তাঁর বরাবরের অভ্যাস। এই ছিল তাঁর সকালের প্রধান জলযোগ—পিত্তরক্ষা। এইটুকু মুখে দিয়ে মা সন্তানদের জলখাবার খাওয়াতেন। মনে পড়ে জয়রামবাটীতে সেই সুমধুর আহ্বান ঃ "বাবা! বেলা হয়েছে, জল খাবে এস!" সেই ডাক এখনো যেন কানে বাজে, প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। মনে হয় 'পাখি হয়ে উড়ে যাই' সেখানে, সেই বারান্দায়, যেখানে আসন বিছিয়ে জলের গ্লাস ও কাঁসিতে গুড়-মুড়ি, পাতায় প্রসাদী ফল-মিষ্টি রেখে দরজার দিকে মা চেয়ে আছেন সস্নেহ নয়নে, ব্যগ্র হয়ে 'বৎসের প্রতীক্ষায় গাভীর ন্যায়'। কিন্তু সে ভাগ্য তো আর হবে না। সারা বিশ্ব খুঁজলেও পাওয়া যাবে না সে মাতৃস্নেহ! ছেলেদের জল-খাওয়া হয়ে গেলে মেয়েদের খেতে দিয়ে মা নিজেও একটু গ্রহণ করেন। ভক্তরা যে ফল-মিষ্টি আনে তা

অপরেই পায়, তিনি সামান্য একটু মুখে দেন মাত্র। অল্প চারটি মুড়িই তাঁর জলখাবার ! পরে দাঁত পড়ে যায়, চিবোতে পারেন না। তাই আঁচলে করে মুড়ি নিয়ে একটা নোড়া দিয়ে সেগুলি গুঁড়িয়ে নেন আর নবাসনের বৌকে ডেকে বলেন ঃ "বৌমা, দাও তো একটু নুন লঙ্কা।"

জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির খাওয়া সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো—সকালে মুড়ি, দুপুরে সিদ্ধ মাঝারি চালের ভাত, কলায়ের ডাল, পোস্ত, একটা ঝাল তরকারি, একটু টক; কখনো শাক, ডালনা, ভাজা। অন্যকিছুও থাকে অনেক সময়। মাছ একটু প্রায়ই থাকে। যতদিন শরীর সুস্থ সবল ছিল মা নিজেই রান্না করে পরিবেশন করতেন। পরে আর পারতেন না। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খাওয়ার সামনে বসে থেকে দেখতেন। আসন, পাতা, জল সব যেন ঠিকমতো হয়—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। গ্লাসে জল যেন কমবেশি না হয়। পাতা যেন ঠিক আসনের মাঝখানে থাকে। আসনগুলি ঘনও হবে না, দূরেও থাকবে না—সমান ফাঁক ফাঁক। পরিবেশন হচ্ছে, মায়ের সুমধুর আহ্বান ছেলেদের কানে গেল ঃ "বাবা, বেলা হয়েছে, দেরি হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি এস, পাতে ভাত পড়েছে, খাবে এস।" ছেলেদের একটু দেরি হচ্ছে, হাতের কাজ শেষ না করে আসতে পারছে না ; মা পাতা আগলে বসে আঁচল দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। ছেলেরা খাচ্ছে—মায়ের চোখে মুখে কী গভীর আনন্দের প্রকাশ ! সুমধুর স্বরে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করছেন ঃ "কেমন হয়েছে ?" কারও পাতে ভাত নেই, কারও বা ডাল কম, কার কিসে রুচি দেখে শুনে বলে কয়ে পেটভরে খাওয়াচ্ছেন।

কোন নবাগত ভক্তছেলের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, মায়ের প্রসাদ পাবে। মা তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে প্রথমেই খাইয়ে দিলেন। বললেন ঃ "এখন বসে পেট ভরে খাও, আমার খেতে দেরি হবে। আমি প্রসাদ রাখব তোমার জন্য, পরে পাবে ঠিক !" দুপুরে মা একটু দুধভাতও খান। তরকারি একটু একটু সব মুখে দিয়ে বাটিতে দুধে চারটি ভাত মাখলেন। নিজে একটু মুখে দিলেন, তারপর প্রসাদপ্রার্থী ভক্তকে

ডাকলেন। সে উপস্থিত হলে প্রসন্নমুখে বললেন ঃ "বাবা ! এই ধর গো ! প্রসাদ চেয়েছিলে, বসে বসে তৃপ্তি করে খাও।" সন্তানের প্রাণ জুড়াল, মায়েরও পরমানন্দ ! আবার এরকমও হয়েছে যে, কোন ভক্তের মায়ের প্রসাদ পাবার জন্য খুব আগ্রহে মা একটা সন্দেশ হাতে নিলেন; ঠাকুরকে দৃষ্টিভোগ দিয়ে তারপর নিজের জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিয়ে পরম স্নেহের সাথে সহর্ষে দিলেন সন্তানকে ঃ "বাবা ! খাও প্রসাদ।"

রাতে মায়ের বাড়িতে (জয়রামবাটীতে) খাওয়া রুটি-তরকারি, গুড়, একটু দুধ। রুটি খুব চমৎকার হয়। মা নিজে হাতে আটা মাখেন—অনেকক্ষণ সময় নিয়ে টিপে টিপে, অতি মোলায়েম করে। সন্ধ্যার পর ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সেই খাবার ভালভাবে ঢাকা দিয়ে কাছে নিয়ে বসে থাকেন, যাতে ঠাণ্ডা না হয়ে যায়। ছেলেরা একটু রাত হলে খাবে—সন্ধ্যাবেলা ঠাকুরকে ডাকবে, তাঁর স্মরণ করবে ; আবার একটু রাত্রি না হলে খিদে পায় না, পেট ভরে খেতে পারবে না ; তাই মা প্রতীক্ষা করছেন। মিট্ মিট্ করে প্রদীপ জ্বলে। ঠাকুরকে ধূপ দিয়ে প্রণাম করে, আলো কমিয়ে দিয়ে মা পা মেলে বসে থাকেন। কোথায় কোন্ রাজ্যে তাঁর মন বিচরণ করে কে জানে ! সব নিস্তব্ধ।

মায়ের প্রতিদিনের ঠাকুর-পূজার জন্য আমি ফুল, বেলপাতাদি চয়ন করে আনতাম। একদিন তুলসীপাতা আনতে ভুল হওয়ায় মা অতিশয় দুঃখিত হন এবং বলেন ঃ "তুলসী আননি ! তুলসী কত পবিত্র, যাতে দাও, শুদ্ধ করে।" আমি ব্যস্ত ও দুঃখিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তুলসীপাতা এনে দি এবং তখন থেকে সারাজীবন তুলসীর বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়ি। প্রতিদিনের পূজা শেষে মা মাটিতে মাথা স্পর্শ করে ঠাকুর প্রণাম করতেন। তারপর চরণামৃত পান করার সময় পূজার নির্মাল্য থেকে একটা প্রসাদী তুলসী ও একটুকরো বেলপাতা মুখে দিতেন।

এক ভক্ত-দম্পতি জয়রামবাটীতে এসেছেন মায়ের কাছে। পথশ্রমে ক্লান্ত দেহ। সঙ্গে চারটি শিশুসন্তান। একজনের আবার ম্যালেরিয়া জ্বর। এসে দেখলেন অতি ছোট একটি খড়ের বাড়ি, তাও

আবার লোকে ভর্তি। কোথায় থাকবেন কোথায় বসবেন কে জানে? মা-ই বা কোথায়? মা সংবাদ পেলেন। ডেকে আনালেন ভেতরে। নিজে অগ্রসর হয়ে পরম স্নেহে সন্তানসহ কন্যাকে নিজের ঘরের বারান্দায় আনলেন। মায়ের মুখে আদরের "মা এস" ডাক শুনে কন্যার বিপন্ন ও বিষণ্ণ ভাব কেটে গেল, হৃদয় ভরে উঠল, মুখের ভাব হলো প্রফুল্ল। মায়ের স্নেহের ইন্দ্রজালে মুহূর্তে সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল। শিশুদের শোয়াবার, নিজেদের বসবার বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা হলো তৎক্ষণাৎ। মা নিজের ঘরের দরজার একপাশে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, শিশুর দুধ, এমনকি ওষুধ পর্যন্ত চলে এল। মায়ের ঘরে মেয়ের কি কোন অভাব থাকে? বা সঙ্কোচ? কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল মায়ের বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বোনের মতো তিনি কলসী কাঁকে বাঁড়ুজ্জে-পুকুরে চলেছেন স্নান করে জল আনতে।

ভক্ত-দম্পতি ফিরে যাচ্ছেন। মা সদর দরজায় দু-চোখ ভরা জল নিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন যতক্ষণ দেখা যায়। তাঁরা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিরে এসে, পা মেলে কোলের উপর হাত রেখে খুব বিমর্ষভাবে বসে পড়লেন নলিনীদিদির ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ কিছুক্ষণ পর দেখা গেল ভক্ত-দম্পতির একটি গামছা পড়ে আছে। মা দেখে খেদ করতে লাগলেন। সেবক সন্তান[২] তখন সেই গামছা হাতে নিয়ে ছুটে চললেন তাঁদের দিয়ে আসতে। তাঁরা তখনো বেশি দূরে যাননি। গামছা দেখে তাঁরা লজ্জিত হলেন এবং সন্তানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গামছা নিয়ে আবার সহর্ষে পথ চলতে আরম্ভ করলেন। সন্তান ফিরে এসে মাকে সংবাদ দিলেন, মায়ের মনও প্রসন্ন হলো।

মা তখনো শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে বসে আছেন পূর্বোক্ত স্থানে। সন্তানটি

---

২ লেখক স্বয়ং—সম্পাদক।

বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে যাবেন, হঠাৎ শুনলেন মায়ের শোকার্ত কণ্ঠে কান্নার স্বর ঃ "আহা-হা বাছা আমার, কালকে সে স্নান করে পরতে পাবে না ! যখনই শাড়ি খুঁজতে যাবে, তখনই মনে হবে ফেলে এসেছি মায়ের বাড়ি ।" সন্তান ব্যগ্র হয়ে ছুটে মায়ের সামনে দাঁড়ালেন । ভক্তমহিলা স্নানান্তে ভিজে শাড়িখানি পুণ্যপুকুরের পাড়ে শুকোতে দিয়েছিলেন, মনে নেই, যাবার সময় ভুলে ফেলে গিয়েছেন । এতক্ষণ যে শোকোচ্ছ্বাস হৃদয়ে চেপে রেখেছিলেন, এখন তা ফুটে বের হলো, কান্নার স্বরে খেদ করতে লাগলেন । জনৈকা নিঃসন্তানা রূঢ়ভাবে বললেন ঃ "মাগী কোন্ দিক সামলায়, এতগুলো কাচ্চা-বাচ্চা !" তাঁর কর্কশ স্বর, কঠোর বাণী মায়ের শোকের মাত্রা বাড়িয়ে তুলল । অশ্রুবর্ষণ করতে করতে ভগ্নস্বরে বলতে লাগলেন ঃ "ভুল তো হবারই কথা । মন কি ছেড়ে যেতে চায় ? একটি রাত কাছে থাকতে পেলে মা, প্রাণ খুলে দুটি কথা বলতে পেলে না ।" সন্তানটি কাপড়ের দিকে চাইতেই নলিনীদিদি মুরব্বিয়ানার সুরে বললেন ঃ "এই একবার ছুটে এল, আর যেতে হবে না, তারা এতক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে !" মায়ের দিকে চেয়ে সন্তান স্থির থাকতে পারলেন না । শাড়িখানা হাতে নিয়ে মাকে বললেন ঃ "বেশিদূর যাননি, এক্ষুণি দিয়ে আসছি ।" মায়ের মুখ প্রসন্ন হলো, স্নেহ-স্বরে বললেন ঃ "বাবা ! রোদ আছে, ছাতা নিয়ে যাও ।" ভক্তেরা অনেক দূর গিয়েছিলেন । তাঁকে দৌড়ে আসতে দেখে অতীব বিস্মিত হলেন, এবং শাড়ি দেখে তখন ভক্তপরিবারের মনে পড়ল—শাড়ি রোদে শুকোতে দিয়েছিলেন, আনতে ভুলে গেছেন । ভক্তেরা লজ্জা ও বিনয় প্রকাশ এবং আফসোস করে বললেন যে, এত কষ্ট করে শাড়ি আনবার প্রয়োজন ছিল না । সন্তান যখন মায়ের দুঃখ ও উদ্বেগের কথা জানালেন, তখন প্রথমে তাঁদের মন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলো, পরে মাতৃস্নেহে দেহ পুলকিত ও হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল ।

এ তো পাতানো মায়ের সন্তানের প্রতি স্নেহ নয় । এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন সম্পর্ক পাতানো সম্ভব নয় । ক্ষণিকের দেখা ।

কিন্তু যে স্নেহের স্পর্শ তাঁরা পেলেন তা চিরস্থায়ী। এ যেন দীর্ঘকাল পথে ঘোরা মা-হারা সন্তানের মাকে ফিরে পাওয়া।

মায়ের কাছে ভাল-মন্দ সবরকম সন্তানেরাই আসে। কৃতী ছেলের প্রশংসা শুনে মা খুশি হন, অপরের কাছে উৎফুল্ল হয়ে বলেন ঃ "আমার ছেলে"। মন্দ ছেলের নিন্দার কথাও মাকে শুনতে হয়, মা কষ্ট পান। কিন্তু মায়ের স্নেহ-ভালবাসা উভয় সন্তানের প্রতি সকল অবস্থাতেই সমান থাকে। ব্যবহারেও কোন তারতম্য হয় না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে নবাসনবাসী এক সন্তানের প্রতি মায়ের অপার স্নেহের কথা। মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত এই যুবক ভদ্রবংশজাত, শিক্ষিত, গুণবান। তার পদস্খলন হয়। মায়ের প্রতি তার ভক্তি ঠিকই আছে—আগের মতোই নিয়মিত আসা-যাওয়া করে। অন্য ভক্তদের কিন্তু এটা ভাল লাগে না। তাঁরা মাকে বলেন, তিনি যেন যুবকটিকে আসতে নিষেধ করে দেন। মা ছেলের জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন ঠিকই, কিন্তু বললেন ঃ "বাবা, আমি মা হয়ে তাকে 'এস না'—এ বলতে পারব না।" সন্তানের আসা-যাওয়া বন্ধ হলো না। মায়ের স্নেহাদরও কিছু কমল না। কিন্তু ছেলের মনে ক্রমে ক্রমে অনুশোচনা আসে। সে নিজের ভুল বুঝতে পারে।

নয় দশ বছরের বালক গোবিন্দ—জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির গরুর দেখাশোনা করে। একবার তার বেশ খোস-পাঁচড়া হয়। একদিন রাতে যন্ত্রণার তীব্রতা খুব বেড়ে যাওয়ায় সে অধীর হয়ে কাঁদতে থাকে। ছেলের কান্নায় রাতে মায়ের চোখে ঘুম আসে না। পরদিন ভোরবেলায় দেখা যায়—মা গোবিন্দকে ডেকে নিয়েছেন বাড়ির ভেতরে, নিজের হাতে নিমপাতা হলুদ বাটছেন। বেটে একটু একটু তার হাতে দিচ্ছেন, কিভাবে লাগাতে হবে দেখাচ্ছেন। আর গোবিন্দ সেইভাবে লাগাচ্ছে। মায়ের স্নেহ-আদরে তার মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে প্রফুল্ল। দুজনের মুখ দেখে কথাবার্তা শুনে কে বুঝবে নিজের ছেলে নয়?

মায়ের বাড়িতে কুলি-মজুর, গাড়িওয়ালা, পালকি-বেহারা, ফেরিওয়ালা, মেছুনী-জেলে যেই আসুক সকলেই মায়ের ছেলে-

মেয়ে। সকলেই ভক্তের মতো স্নেহ-আদর পায়। সেই সকরুণ স্নেহদৃষ্টি ইহ-পরকালে কেউই আর ভুলতে পারবে না। যদি বা কোনসময় বিস্মরণ হয়, দুঃখকষ্টে পড়লেই মনে ভেসে উঠবে সেই স্নেহকোমল কৃপাদৃষ্টি।

একবার এক নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী মেয়ে কোন ভক্তপ্রদত্ত জিনিসপত্র নিয়ে দুপুরবেলায় এসেছে মায়ের কাছে। মা তাকে স্নানাহার ও বিশ্রাম করে যেতে বললেন। বিশ্রামের পর বেলা গিয়েছে দেখে মা রাতেও তাকে থেকে যেতে বললেন। মায়ের ঘরের বারান্দায় দরজার পাশেই তার শোয়ার ব্যবস্থা হলো। মেয়েটির বয়স হয়েছিল আর সে ছিল ম্যালেরিয়ার রুগী। অনেক দূর হেঁটে এসেছে। পথশ্রমে ক্লান্ত। রাতে সে অসাড়ে বিছানা নোংরা করে ফেলল। মা বরাবরের অভ্যাসমতো ভোররাতে উঠেছেন—দরজা খুলেই দেখেন এই অবস্থা। কি উপায়! অন্যেরা উঠে টের পেলেই মায়ের দুঃখিনী মেয়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শেষ থাকবে না। মায়ের চিত্ত ব্যাকুল হলো। মেয়েটি তখনো ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। মা ধীরে ধীরে তাকে জাগালেন। মিষ্টি কথায় আশ্বস্ত করলেন, চুপি চুপি জলখাবারের জন্য মুড়ি-গুড় আঁচলে দিয়ে বললেন : "মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে রোদে কষ্ট হবে না।" সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করে বিদায় নিল। মা স্বহস্তে সব পরিষ্কার করলেন। গোবরমাটি দিয়ে বারান্দা লেপলেন, চাটাইখানা ভাল করে ধুয়ে পুকুরের পাড়ে মেলে দিলেন। কেউ কিছু টের পেল না। পরে জনৈকা ভক্তমহিলা কে বারান্দায় 'ন্যাতা' দিল এবিষয়ে অনুসন্ধান করে সব ঘটনা জানতে পেরেছিলেন।

জয়রামবাটীতে এক বালবিধবা ছিল। খুব গরিব। অতি কষ্টে মজুর খেটে দিন গুজরান করত। কবে বিয়ে হয়েছিল, স্বামী কেমন ছিল, কবে বিধবা হয়েছে, কিছুই জ্ঞান নেই। যখন একটু বয়স হলো তখন বুঝল যে, সে বিধবা, তার আর বিয়ে হবে না, সংসার-সুখ ভোগে তার অধিকার নেই। ভক্তদের জিনিসপত্রের বোঝা বইবার জন্য মায়ের বাড়িতে তার যাতায়াত আছে। মা তাকে স্নেহ করেন।

ক্রমে সে পূর্ণযৌবনা হয়। একটি যুবকের সাথে অবৈধ মেলামেশার ফলে ব্যাপার বহুদূর গড়িয়ে জানাজানি হয়ে যায়। হৃদয়হীন সমাজপতিরা এতদিন এই অনাথার কোন খোঁজখবর রাখেননি। তাকে সৎশিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থাই করেননি। এখন এই দুঃখিনীর প্রতি তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ল। অভাগিনীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা চলল। মা সব কথা শুনে সেই কন্যার ভবিষ্যতের কথা ভেবে অত্যন্ত দুঃখিতা ও চিন্তিতা হলেন। কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া তিনি কি-ই বা করতে পারেন!

ভগবানের করুণা হলো। মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত, সন্তানস্থানীয় একজন জমিদার হস্তক্ষেপ করে সামাজিক গোলমাল মিটিয়ে দিলেন। মা শুনে নিশ্চিন্তবোধ করলেন। কয়েকদিন পর তাঁর সেই জমিদার সন্তানটি প্রণাম করতে এলে মা প্রসন্নচিত্তে তাঁকে আশীর্বাদ করে বললেন ঃ "বাবা! দুঃখিনীকে বাঁচিয়ে দিয়েছ, রক্ষা করেছ, শুনে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়েছে। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।"

যাদের আমরা অতি অধম বলে ঘৃণা করি, তাদেরও ভালবেসে তাদের বিপদের সময় এই সমবেদনা, এই অপার স্নেহ জগজ্জননী ছাড়া, 'জন্ম-জন্মান্তরের মা', 'সতেরও মা, অসতেরও মা' ছাড়া আর কে দেখাতে পারে!

গৃহস্থ ভক্তদের সংসারে অমনোযোগ ও বিশৃঙ্খলা মা পছন্দ করতেন না। ভগবানেরই সংসার, সেখানে আমাদের যে-কাজে তিনি রেখেছেন, তাঁর উপর নির্ভর করে তা যথাসাধ্য সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা আমাদের সবসময়ই প্রয়োজন—তাঁর সকল সন্তানকে এই তাঁর শিক্ষা। নিজের কর্তব্যপালনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে দুঃখপ্রকাশ করে মা বলতেন ঃ "ঠাকুর, যাঁর পরনের কাপড় ঠিক থাকত না, তাঁরই আমার জন্য কত চিন্তা!'

একবার জনৈক ভক্তসন্তান বহুটাকা মূল্যে একখানা কাপড় মাকে দেবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলে মা তাতে অস্বীকৃত হয়ে বলেন ঃ "টাকা খরচ করতে নিতান্ত আগ্রহ করলে বরং একটুকরো

ধানের জমি কিনে দিক—সাধুভক্তের সেবা হবে।" ভক্তটি টাকা দিলে একখণ্ড জমি কেনার কথা হয় কিন্তু বিক্রেতা মত পরিবর্তন করায় জমি কেনা হয় না। মা এই ব্যাপারে একটি সন্তানকে জানালেন: "বাবা, জমিতো এখন কেনা হলো না, টাকা হাতে থাকলেই খরচ হয়ে যায়, সেজন্য কোয়ালপাড়ায় কেদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, ধান কিনে রাখবার জন্য—এই সময় ধান খুব সস্তা। যখন প্রয়োজন হবে ধান বিক্রি করলেই টাকা পাওয়া যাবে।" জমি সুবিধামতো না পাওয়ায় কেনা হয়নি, কিন্তু কিছুকাল পরে যখন এই ধান খরচ করা হয় তখন তার দাম চারগুণ বেড়ে গেছে।

জয়রামবাটীতে নতুন বাড়ি তৈরি হলে গ্রাম পঞ্চায়েত তার ওপর চৌকিদারী ট্যাক্স ধার্য করেছিল এবং মায়ের অনুপস্থিতিতে প্রথম বৎসর সেবক ব্রহ্মচারী জ্ঞানানন্দ, যিনি তখন সেখানে ছিলেন, বার্ষিক ট্যাক্স চার টাকা দিয়েছিলেন। পরবর্তী বৎসরে মা দেশে ছিলেন। ট্যাক্স নিতে আসলে চেষ্টা করে ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য উপস্থিত সেবককে[৩] আদেশ করলেন। মা তাঁকে বলেন: "এখন আমি এখানে রয়েছি, না হয় ট্যাক্সের টাকা দিয়ে দিলুম, কিন্তু পরে যে সাধু-ব্রহ্মচারী থাকবে, তাকে হয়তো ভিক্ষে করেই খেতে হবে। সে কোথায় টাকা পাবে? চেষ্টা কর ট্যাক্স বন্ধ করার জন্য।" এজন্য মা বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে নিজের নামে চিঠি[৪] লিখিয়ে সন্তানকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং সেবার ট্যাক্স দিতে হলেও পরবর্তী বৎসরে

---

৩ লেখক স্বয়ং—সম্পাদক।

৪ এসম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের একখানি পত্র:

জয়রামবাটী

১৩২৪। ৫ই চৈত্র

শ্রীশ্রীগুরুদেব

আশীঃ পত্র সমাচার—

বাবাজীবন, তোমার বোধ হয় জানা আছে যে, আমাদের বাড়ির জন্য ৪ (চারি) টাকা চৌকিদারী টেক্স ধার্য আছে। ইহা অত্যন্ত বেশি বোধ হওয়ায় গতকল্য একখানা পত্রসহ শ্রীমান গোপেশকে (বর্তমান লেখক) শ্রীযুক্ত শম্ভুবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলাম, পত্রে লিখিয়াছিলাম, এই বাড়িটি দেবোত্তর করিয়া দেওয়ায় আমার

ট্যাক্স বন্ধের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। পরবর্তী বৎসরে মা আবার যথাসময়ে একজন সন্তানকে পাঠিয়ে তদারক করেন এবং তা বন্ধ হয়।

জয়রামবাটীতে ডাকপিয়ন মনি-অর্ডারের টাকা নিয়ে আসে। মা টিপসই দেন। একজন লিখে দেয় ঃ 'শ্রীসারদাদেব্যার টিপসই...।' পিয়ন টাকা গুণে দিয়ে যায়। মা টাকা মুঠো করে নিয়ে ঘরে রেখে দেন। পিয়নকে প্রসাদ দেন, মিষ্ট কথা বলে বিদায় করেন। কেউ জানতে পারে না কত টাকা এসেছে, কে পাঠিয়েছে। পরে অবসরমতো কাউকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে প্রাপ্তিস্বীকার ও আশীর্বাদ জানান। সেবক কেউ উপস্থিত থেকে মনি-অর্ডার গ্রহণ করলেও টাকা বেশি নাড়াচাড়া ও গোনাবাছা করতে মা নিষেধ করে বলতেন ঃ "বাবা, টাকার শব্দ শুনলেও গরিবের মনে লোভ জন্মায়। টাকা এমন জিনিস, দেখলে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।"

সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। আমি এখানের স্থায়ী অধিবাসী নই। বাড়ির কিছুমাত্র আয় নাই। যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবক থাকিবে, তাহার ভরণপোষণ এই সংসার হইতে চলিবে না। এমতাবস্থায় স্থায়ী এই গুরুভার বহন করা অসম্ভব। আমার নিজেরও ভক্তেরা যখন যাহা দেয়, ভগবান-ইচ্ছায় তাহাতে কোন রকম চলিয়া যায় মাত্র। সংসারে কিছুমাত্র আয় নাই ইত্যাদি।

শম্ভুবাবু তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, তিনি এবিষয়ে পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছিলেন, ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানা দরখাস্ত করিবার জন্য। এ সম্বন্ধে তুমি কিছু করিয়াছ কি না জানি না। আশা করি পত্রপাঠ মনোযোগী হইবে, এবং যাহা ভাল মনে কর তাহা করিবে। শম্ভু রায় বলিয়া দিয়াছেন, দরখাস্তে যেন উল্লেখ থাকে যে, ইহা একটি Religious Institution—আয় কিছুমাত্র নাই। সহৃদয় জনগণের প্রদত্ত সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার কুশল সমাচার সহ আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আশীঃ তোমার মাতাঠাকুরাণী

[উদ্বোধন, ৮০-তম বর্ষ, পৃঃ ২২৮]

পত্রটির অপরদিকে স্বামী সারদেশানন্দ শ্রীমায়ের নির্দেশে প্রবোধবাবুকে লিখেছিলেন : "পত্রখানা লিখিয়া মাকে শুনাইবামাত্র [মা] বলিলেন—'টেক্স যাহাতে উঠিয়া যায় তাহা তোমাকে করিতেই হইবে'।" [দ্রঃ উদ্বোধন, ৮৩-তম বর্ষ, পৃঃ ৫৯১]—সম্পাদক।

স্বামীজী যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে সাধুদের জনসেবার কাজে লাগিয়েছেন, এটা ঠাকুরের ভাবানুগ কিনা, এ সংশয় প্রথমদিকে অনেকেরই মনে উঠেছে। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এবিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জিজ্ঞাসাও করেছেন কেউ কেউ। মা কখনো বলেছেন : "এ সবই ঠাকুরের কাজ।" আবার কখনো বলেছেন : "বাবা, তোমরা কাজ করে খাও। কাজ না করলে কে খেতে দেবে ? রোদে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে মাথা ঘুরে যাবে। ভাল করে খেতে না পেলে শরীরে অসুখ করবে। তোমরা ওসব কথা শুনো না। কাজ কর, ভাল করে খাও দাও, ভগবানের ভজন কর।"

মা জপধ্যান করবার জন্য যেমন উৎসাহিত করতেন, তেমনি আবার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে মাথা গরম না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনমতো সাবধান করেও দিতেন। অত্যধিক কঠোরতা করতে নিষেধ করতেন এবং আহারে পোশাকে অসংযম বিলাসিতাও পছন্দ করতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁর সন্ন্যাসী-সন্তানগণের খাওয়া-থাকার কষ্ট, অভাব-অনটন ইত্যাদি মায়ের মনে ভীষণ দুঃখের কারণ হয়েছিল—বোধগয়া মঠের ঐশ্বর্য, সাধুদের সুখ-সুবিধা দেখে তাঁর নিঃসম্বল পরিব্রাজক সন্তানদের কথা মনে পড়ায় কেঁদে আকুল হয়েছিলেন আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাঁর সন্তানদের জন্যে। তাই পূজনীয়া যোগেন-মা একদিন আমাকে বলেছিলেন : "যা কিছু দেখছ (মঠ-আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায় ! যেখানে যা দেখেছেন—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'ঠাকুর ! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।' মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।"

জয়রামবাটীতে নিজের হাতে গেরুয়া দিয়ে মা অনেক ছেলেকে সন্ন্যাস দেন দেখে মেয়েদের হৃদয়ে আতঙ্ক, শোকের সঞ্চার হয়। মা হাসেন উৎফুল্ল হৃদয়ে—তাঁর একটি সন্তান সংসারের দারুণ জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেল। সংসারী ছেলেদের অর্থোপার্জন, বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবন যাপনে নিরুৎসাহ না করলেও মা ত্যাগী-সন্তানকে ত্যাগের পথ দেখিয়ে দিতেন পরম উল্লাসে।

মায়ের একটি সন্তান একবার লিখেছেন ঃ তিনি বিয়ে না করে ত্যাগের পথেই জীবনযাপন করতে চান। কিন্তু তাঁর পিতা এর ঘোর বিরোধী। নানা উপায়ে তাঁকে সংসারে টেনে ডুবাবার চেষ্টা করছেন। পুত্রের করুণ আর্তি শুনে মায়ের হৃদয় গলে যায়। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলতে থাকেন ঃ "দেখ দেখ, বাপ হয়ে ছেলের মাথায় কুড়ুল মারতে চায়, ছেলের সর্বনাশ করতে চায়—ছেলে দুঃখে লিখেছে !" মা ছেলেকে আশ্বাস দিয়ে আশীর্বাদ জানিয়ে জবাব দিলেন। তাঁর কৃপায় ছেলের সকল বিপদ কেটে যায়। ধীরে ধীরে পিতার মতিগতি পরিবর্তিত হয় ও তিনি ছেলের উপর প্রীত হয়ে তাঁর ধর্মপথের সহায়ক হন। ছেলেও প্রাণপণে বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করে শেষ সময়ে আন্তরিক প্রীতি ও শুভাশীর্বাদ লাভ করেন।

আর একবার এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাকে লিখেছিলেন যে, তাঁর যে-ছেলেটিকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন—তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে রোজগার করে খাওয়াবে বলে ভরসা করেছিলেন, সে কিছুদিন আগে মায়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিল এবং সম্প্রতি সে পিতামাতাকে ছেড়ে সাধু হবার জন্য এক আশ্রমে চলে গেছে। তার মা শোকে শয্যাশায়ী। তিনি বৃদ্ধ—নিরুপায়। চোখে অন্ধকার দেখছেন। চিঠিতে অতি করুণ ভাষায় তাঁদের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করেছেন ও ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। চিঠি শুনে মা খুবই আফসোস করলেন, বলতে লাগলেন ঃ "হায় ! না জানি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে কত অভিসম্পাত করছেন ! করবারই তো কথা। কত কষ্ট, কত আশা-ভরসায় ছেলেকে মানুষ করেছেন, এখন সে হঠাৎ পালিয়ে গেল !" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে খুব সান্ত্বনা দিয়ে জবাব লেখা হলো। মা জানালেন, তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না। ছেলে তাঁকে কিছুই জানায়নি। সে নিজের ইচ্ছাতেই সাধু হয়েছে—তিনি কি করবেন ? এ-বিষয়ে তাঁর কোন হাত নেই। ভগবানের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে বললেন। বললেন, ভগবান অবশ্যই তাঁদের রক্ষা করবেন,

তাঁরা যেন দুশ্চিন্তা ত্যাগ করেন। পরে মা পত্রলেখককে[৫] সম্বোধন করে বললেন : "বাবা! এই বোকাগুলো কেন হঠাৎ এইরকম করে, আর বাপ-মাকে কষ্ট দেয়, নিজেও কষ্ট ভোগ করে! কিছুকাল ধরে আশ্রমে যাতায়াত, কিছুকাল সাধুসঙ্গে বাস করতে হয়, দেখে দেখে বাপ-মায়ের সহ্য হয়ে যায়, বুঝতে পারে ছেলের মতিগতি, তখন ছেড়ে গেলে আর মনে এত লাগে না।" মায়ের এই সন্তানটি তখন বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, তবে কিছুকাল বাপ-মায়ের নিকটে থেকে ধীরে ধীরে তাঁদের মত করিয়ে সংসার ত্যাগ করেন এবং তাঁরা যতকাল জীবিত ছিলেন, পরস্পর খোঁজখবর রাখা, দেখাসাক্ষাতে ঘনিষ্ঠতা ও স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

সংসারত্যাগী সাধুদের প্রতি মায়ের স্বাভাবিক এক প্রীতি ছিল। মায়ের খুড়তুতো বোনের ছেলে বাঁকু (বঙ্কিম) অল্প বয়সে সাধু হয়ে গৃহত্যাগ করে। মা শুনে বলেন : "সাধু হয়েছে খুব ভাল কাজ করেছে! কি আছে এই হাড়মাসের খাঁচাটায়! এইতো দেখ না—বাতে ভুগে মরছি! এই দেহটাতে আছে কি? কিসের জন্য এত মায়া! দু-দিন পরেই তো শেষ হয়ে যাবে। তখন পুড়ালে হবে দেড়সের ছাই! ঐ দেড়সের ছাই বইতো নয়! বাঁকু সাধু হয়েছে, ভগবানের পথে গিয়েছে, বেশ করেছে, বেশ করেছে।"

মায়ের সাধুপ্রীতি সম্বন্ধে আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। একদিন সন্ধ্যার পরে জনৈক সন্তান[৬] মাকে চিঠি পড়ে শুনাচ্ছেন। মা পা মেলে মেঝেতে আসনের উপর বসেছেন। সামনে হ্যারিকেন লণ্ঠন। ছেলেটি মায়ের পাশেই বসে মাথা নিচু করে চিঠি পড়ছেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল—মস্ত বড় একটা তেঁতুল-বিছা মায়ের দিকে এগিয়ে আসছে। দেখামাত্রই সন্তানের মনে হলো মাকে কামড়াবে না তো? সঙ্গে সঙ্গে এক লাথি মেরে সেটাকে পিষে ফেললেন। তাঁর লাঠি বা অন্য কিছু নেবার সময় ছিল না। মা মৃত জীবটির দিকে সকরুণ

---

৫ লেখক স্বয়ং—সম্পাদক। ৬ লেখক স্বয়ং—সম্পাদক।

দৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে ধীরে বললেন ঃ "সাধুর পায়ের আঘাতে প্রাণ গেল।" এমনভাবে বললেন, যেন তার আত্মার সদ্‌গতি হলো !

মায়ের সন্ন্যাসী-সন্তানগণ তাঁর ইচ্ছার তিলমাত্র বিরুদ্ধেও কখনো কিছু বলতেন না। তবে তাঁর পাদপদ্মে আকুল আবেদন ও প্রার্থনা জানাতেন। মা-ও তা পূর্ণ করতেন সময়বিশেষে। মায়ের ছেলেরা অবোধ, তাই তারা নিঃসঙ্কোচে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে ফেলেন, মা হাসেন। কখনো শোনেন, কখনো শোনেন না—ভুলিয়ে অন্যমনস্ক করে দেন। পূজনীয় কপিল মহারাজ মায়ের বিশেষ স্নেহের অধিকারী, উদ্বোধনে বহুদিন মায়ের পদচ্ছায়ায় বাস করেছেন। একবার জয়রামবাটীতে মায়ের অসুখের পর মা সারতে না সারতেই তাঁকে কলকাতা যাবার জন্য বার বার বলতে লাগলেন। মা কিন্তু সেসকল কথায় কান দিলেন না। অপরের কাছে বললেন ঃ "ওরা হলো ন্যাংটা-পোঁদা সন্ন্যাসী, উঠ্ বললে উঠল, বস্ বললে বসল, ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কম্বল কাঁধে ফেলে—চলল ! আমার কি তা চলে ? আমার কত দিক ভেবে কাজ করতে হয়। যাতে অপরের কোন অসুবিধা না হয়।"

সামান্য ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ হট্টগোল সৃষ্টি করা আমাদের স্বভাব এবং ফলে দুঃখ-অশান্তিও ভোগ করি। মা সব ব্যাপারেই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে নীরবে সব সহ্য করার জন্য শিক্ষা দিতেন ঃ 'শ, ষ, স— যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।'

নিজের দুঃখকষ্টের জন্য মাকে কখনো অপরকে দোষ দিতে দেখা যেত না। মা সকলকেই শিক্ষা দিতেন ঃ "মানুষ স্বীয় কর্মেরই ফল ভোগ করে, এজন্য অপরকে দোষী না করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা ও তাঁর কৃপার উপর নির্ভর করে ধীরভাবে সকল অবস্থায় সহ্য করে যাওয়াই প্রয়োজন।"

শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে যাঁদের কিছুদিনও বাস করবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, মা তাঁর সন্তানদের জীবনগঠনের জন্য চরিত্রবল, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, সংযম, ভগবৎ-ভজন এবং সর্বাবস্থায় ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাস, নিষ্ঠা-ভক্তি ও নির্ভরতা শেখাতেন।

তাঁর নিজের যেমন, তেমনই তাঁর সন্তানগণের মধ্যেও ভাবুকতার আড়ম্বর কখনো দেখা যেত না। সকলেই ছিলেন সৌম্য, শান্ত, ধীর, স্থির। *

* 'উদ্বোধন'-এ যখন ধারাবাহিকভাবে (আষাঢ় ১৩৮১—ফাল্গুন ১৩৮৬) স্বামী সারদেশানন্দের স্মৃতিকথা প্রকাশ হচ্ছিল তখনই সেখান থেকে সঙ্কলন করে তাঁর অনুমোদনক্রমে বর্তমান নিবন্ধটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মঠে সঙ্কলিত নিবন্ধটি তাঁকে পড়িয়ে শোনান এবং তিনি তা অনুমোদন করেন (২১ অক্টোবর ১৯৮১)। নিবন্ধটিতে তিনি একটি 'ভূমিকা' এবং 'উপসংহার' সংযোজন করেন। তিনি বলে যান, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ শ্রুতিলিখন করেন। পরে নিবন্ধটি 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান গ্রন্থে আমরা মূল স্মৃতিকথা অংশটিই শুধু উপস্থাপন করেছি। —সম্পাদক।

মাতৃসান্নিধ্যে

স্বামী নির্বাণানন্দ

মাকে আমি প্রথম দেখি কাশী সেবাশ্রমে। যতদূর মনে পড়ে সেটি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথমদিকের ঘটনা। কালীপুজোর পরদিন[১] মা এসেছিলেন সেবাশ্রমে। আমি সেবাশ্রমে এসেছি এর কদিন আগে মাত্র—সঙ্ঘে যোগদানের উদ্দেশ্য নিয়ে। এখানে আসার আগেই আমি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও অন্যান্য সূত্রে শ্রীমায়ের কথা জেনেছিলাম। মহারাজও (স্বামী ব্রহ্মানন্দও) তখন সেবাশ্রমে অবস্থান করছিলেন। মা ছিলেন অদ্বৈত আশ্রমের কাছে বাগবাজারের কিরণ দত্তদের বাড়ি 'লক্ষ্মীনিবাসে'। মা সেদিন সেবাশ্রমের সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন। সেবাশ্রমের সাধুদের নারায়ণজ্ঞানে রোগীর সেবা দেখে মা অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন ঃ "দেখছি ঠাকুর এখানে স্বয়ং বিরাজ করছেন। আর আমার ছেলেরা প্রাণপণে রোগীদের সেবা করে তাঁরই পূজা করছে।" অনেকক্ষণ সেবাশ্রমে কাটিয়ে মা 'লক্ষ্মীনিবাসে' ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই চারু মহারাজের (স্বামী শুভানন্দের) কাছে একটা দশটাকার নোট পাঠিয়ে দিলেন মা। চারু মহারাজ কাশী সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তখনো তিনি অবশ্য সাধু হননি। তখন তিনি চারুবাবু—চারুচন্দ্র দাস। যিনি টাকাটা নিয়ে এসেছিলেন তিনি বললেন ঃ "মা সেবাশ্রমের কাজ দেখে খুব খুশি হয়েছেন। তাই এই টাকা পাঠালেন। মা আরও বলেছেন, 'সেবাশ্রম দেখে আমার এত ভাল লেগেছে যে, এখানেই স্থায়িভাবে থাকতে ইচ্ছা করছে'।" সেকথা শুনে মহারাজ, মহাপুরুষ

---

১ সেদিনটি ছিল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ৮ নভেম্বর। —সম্পাদক।

মহারাজ, হরি মহারাজ, কেদারবাবা (স্বামী অচলানন্দ), চারু মহারাজ প্রভৃতির সে কী আনন্দ ! মাস্টারমশাইও তখন কাশীতে ছিলেন। সেবাশ্রমের কাজ তাঁর মনঃপূত ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল রোগীর সেবা, হাসপাতাল চালানো—এগুলি সাধুদের কাজ নয়। এসব ঠাকুরের ভাবেরও পরিপন্থী। সাধুরা শুধু সাধনভজন নিয়ে থাকবেন। সেবাশ্রম দেখে মায়ের মন্তব্য এবং দশটাকা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে মহারাজ মাস্টারমশাইকে বললেন : "শুনলেন তো সব ?" মাস্টারমশাই বললেন : "মা যখন বলেছেন তখন আর কি কথা ! এসব নিশ্চয়ই ঠাকুরের কাজ—না মেনে উপায় আছে ?"

মা সেবার কাশীতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। মাঝে মাঝে অদ্বৈত আশ্রমে এবং সেবাশ্রমে তাঁর পদধূলি পড়ত। মহারাজ রোজই সকালে 'লক্ষ্মীনিবাসে' যেতেন মাকে প্রণাম করতে। সঙ্গে আমরাও থাকতাম কখনো কখনো। মায়ের সঙ্গে তখন কথা খুব বেশি না হলেও মা আমাকে যে বিশেষ স্নেহ করতেন তা টের পেতাম।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষে মহারাজের নির্দেশে সেবাশ্রম থেকে মঠে আসি। মা তখন উদ্বোধনে। মঠে ফিরে আসার পর মাকে দর্শন করতে উদ্বোধনে গিয়েছি। মঠে আসার আগে মাস-দুয়েক বন্যাত্রাণের কাজে কাশী থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলাম। পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে আমার শরীর তখন একটু খারাপ হয়েছিল বোধ হয়। মায়ের চোখ তা এড়ায়নি। আমাকে দেখেই খুব উদ্বেগ-ব্যাকুল স্বরে মা বললেন : "এ কি চেহারা করেছ তুমি ?" আমি বললাম : "কিছুদিন বন্যাত্রাণের কাজে থাকতে হয়েছে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক ছিল না। সেজন্য হয়তো শরীর একটু খারাপ হয়েছে।" মা বললেন : "একটু না, বেশ খারাপ করেছ শরীর। এবার কদিন ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করে শরীর সেরে নাও। কত কাজ করবে তোমরা ঠাকুরের। শরীর ঠিক না হলে কি করে চলবে ?" মঠে ফেরার সময় আবার মা ঐকথা মনে করিয়ে দিলেন। সেবার মঠে কয়েকমাস মহারাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। এই সময় আমার মনে উত্তরাখণ্ডে

গিয়ে কিছুদিন তপস্যা করার জন্য প্রবল বাসনা হয়। মা আছেন 'উদ্বোধনে'র বাড়িতে। সেঁখানে গিয়ে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানালাম তপস্যায় যাবার অনুমতি দিতে। মা প্রথমটায় কিছুতে রাজি হলেন না। ব্যাকুলভাবে বললেন : "না বাবা, তুমি ছেলেমানুষ। তোমার এখন তপস্যায় গিয়ে কাজ নেই। সেখানে কোথায় থাকবে, খাওয়া কি করে জুটবে ?" কিন্তু আমিও ছাড়ব না। মাকে মিনতি করতে থাকি অনুমতি দেওয়ার জন্য। মা আবার বলেন : "না বাবা, তোমার কষ্ট হবে। তপস্যায় যাবার দরকার নেই বাবা তোমার।" মায়ের কণ্ঠে ব্যাকুলতা আর উৎকণ্ঠা যেন ঝরে পড়ে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। বার বার মিনতি করে যেতে থাকি যাতে তিনি অনুমতি দেন। মা শেষে বললেন : "আচ্ছা বাবা, তপস্যার জন্য যখন তুমি এত ব্যাকুল হয়েছ, তখন বলি, তুমি বাবা কাশী যাও। সেখানে সেবাশ্রমে থাকবে আর বাইরে ভিক্ষা করে খাবে। অন্য কোথাও আর যেও না।" আমি তখন মাকে বললাম : "আমি কিন্তু মা তাহলে পায়ে হেঁটে কাশী যাব।" মা প্রথমে তাতে রাজি হননি। পরে আমার মিনতিতে রাজি হন। বিদায় নেবার আগে মা আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন : "খুব আশীর্বাদ করছি বাবা, তোমার সিদ্ধি হোক।" মাস পাঁচ-ছয় পর মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পদব্রজে কাশী রওনা হলাম। সেবার সাত-আট মাস কাশীতে ছিলাম। কাশী থেকে মঠে ফিরে এসে আবার মহারাজের সেবায় নিযুক্ত হলাম।[২]

মহারাজ বলরাম-মন্দিরে থাকতে খুব ভালবাসতেন। প্রায়ই মঠ থেকে আসতেন বলরাম-মন্দিরে। বলরাম-মন্দিরে মহারাজের কাছে থাকবার সুবাদে প্রায়ই উদ্বোধনে যেতাম। তাই তখন মাকে প্রণাম ও দর্শন করার সৌভাগ্য প্রায় রোজই হতো। কথাবার্তাও হতো।

---

২ স্বামী নির্বাণানন্দ তপস্যার জন্য ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে কাশী গিয়েছিলেন এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার আগে, সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে, তিনি কাশী থেকে মঠে ফিরে আসেন। —সম্পাদক।

মায়ের গলার স্বর খুবই মিষ্টি ছিল। অন্যদের সামনে সাধারণত লম্বা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখলেও আমি কখনো মাকে ঐভাবে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমি মাকে যখনই দেখেছি, মায়ের শ্রীমুখ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে।

মায়ের শেষ অসুখের সময় মহারাজ ছিলেন ভুবনেশ্বরে। আমিও ছিলাম সেখানে তাঁর সেবায়। মায়ের মহাসমাধির দিন (১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২১ জুলাই, মঙ্গলবার) রাত দেড়টা নাগাদ আমি মহারাজের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি একটি আলোয়ানে সারা শরীর ঢেকে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। মুখ খুব গম্ভীর। আমাকে দেখে মহারাজ বললেন : "সুজ্জু, রাত এখন কত ? কেন জানি না মা-ঠাকরুনের জন্যে মনটা কেমন করছে। তিনি কেমন আছেন কে জানে।" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : "শোবেন না ?" মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। মহারাজের মুখের ঐ গম্ভীর ভাব দেখে এবং মায়ের জন্যে তাঁর মন-খারাপের কথা জেনে, তাঁর মন একটু হালকা করার জন্যে বললাম : "তামাক সেজে নিয়ে আসব মহারাজ ?" মহারাজ কোন উত্তর না দিয়ে একইভাবে বসে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হলো না। আস্তে আস্তে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরদিন সকালে মহারাজকে একটু অস্থির বলে মনে হলো। অন্যান্য দিন সকালে একটু বেড়াতে বেরোতেন। সেদিন গেলেন না। সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। সেদিনই পোস্টাপিস থেকে পিওন একটি টেলিগ্রাম নিয়ে এল। শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দের) টেলিগ্রাম : আগের রাত্রে দেড়টার সময় উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমা দেহরক্ষা করেছেন। আমার মনে পড়ল : গতরাত্রে প্রায় ঐসময়েই মহারাজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলেন আর বলেছিলেন মায়ের জন্যে মন কেমন করছে। খবরটি পেয়ে মহারাজের মুখ এক অব্যক্ত বেদনায় থমথম করতে লাগল। তিনি শুয়ে পড়লেন। খানিক পরে আবার উঠে বসলেন। বললেন : "আমি হবিষ্যি করব। মায়ের শিষ্য যারা আছে তারা তিনদিন হবিষ্যি করবে,

জুতো পরবে না।" তিনদিন তিনি কারও সঙ্গে কথা বলেননি। বারোদিন হবিষ্যান্ন খেয়েছিলেন এবং জুতো ব্যবহার করেননি। একদিন বললেন ঃ "এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম।"

শুনেছি, মায়ের শরীর দাহ হয়ে যাবার পর মহাপুরুষ মহারাজ উপস্থিত সাধু ও ভক্তদের বলেছিলেন ঃ "সতীর শরীরের এক একটি অঙ্গ বুকে নিয়ে সারা দেশে একান্নটি পীঠ গড়ে উঠেছে। সেই সতীর সমস্ত শরীর আজ বেলুড় মঠের মাটিতে মিশে রইল। তাহলেই বুঝে দেখ, বেলুড় মঠ কত বড় তীর্থ!"

মঠে গঙ্গার ধারে যে তিনটে মন্দির আছে (রাজা মহারাজের মন্দির, মায়ের মন্দির আর স্বামীজীর মন্দির) তার মধ্যে মায়ের মন্দির গঙ্গার দিকে মুখ করা— অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। মায়ের গঙ্গাবাই ছিল। গঙ্গাস্নান করতে, গঙ্গাদর্শন করতে ও গঙ্গাতীরে থাকতে মা ভালবাসতেন। তাই মায়ের মন্দির গঙ্গার দিকে মুখ করা। মা সবসময় গঙ্গাদর্শন করছেন।

মহারাজ বলতেন ঃ "মাকে চেনা বড় শক্ত। ঘোমটা দিয়ে সাধারণ মেয়েদের মতো থাকেন, অথচ তিনি সাক্ষাৎ জগদম্বা। ঠাকুর না চিনিয়ে দিলে আমরাই কি মাকে চিনতে পারতাম?" একজন ভক্ত আমাকে একবার বলেছিলেন, তাঁকে মা নিজে বলেছিলেন ঃ "আমিই সীতা।"

অনুলিখন ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী অভয়ানন্দ

১৯১২ খ্রীস্টাব্দে আমি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পেয়েছি। কেমন করে তাঁর আশ্রয় পেয়েছি সেকথা বলতে হলে তার আগে সংক্ষেপে জানাতে হয় আমার বেলুড় মঠে প্রথম আগমনের বৃত্তান্তটি—ঢাকা থেকে অল্প কয়েকদিনের জন্য বেলুড় মঠে এসে কেমন করে এখানে বরাবরের জন্য থেকে গেলাম সেই কথাটি।

ঢাকায় আমি একটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। দলটি হলো অনুশীলন সমিতি। তখন আমি ছেলেমানুষ, সব জিনিস ভাল বুঝি না। অনুশীলন সমিতির একটা আড্ডা ছিল ঢাকায়—হোস্টেলের মতো। বাড়িঘর ছেড়ে আসা কিছু ছেলে সেখানে থাকত। কিছুদিন থাকার পর দেখলাম, দলের কিছু কিছু নীতি আমি মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। তাই এমন কারও কাছে যেতে চাইছিলাম যিনি এ-বিষয়ে আমাকে যথার্থ উপদেশ দিতে পারবেন। নানা কারণে আমার রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ প্রার্থনার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু কোন্ সূত্রে তাঁর কাছে যাব? কে-ই বা তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে? এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করে আমার বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ বসু। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাকে জানতেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করতে উৎসুক একথা বীরেন জানত। একদিন, সম্ভবত দুর্গাপূজার পর (১৯১০ খ্রীস্টাব্দে ?), বীরেন একটি চিঠিতে জানাল, সে কলকাতায় যাচ্ছে, যদি আমি চাই সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে। কলকাতা থেকে বেলুড় মঠে নিয়ে গিয়ে মহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দের] সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দেবে, এই প্রতিশ্রুতিও সে চিঠিতে দিয়েছিল। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে আমি ঢাকায় ওদের বাড়ি গেলাম। পরদিন একসঙ্গে কলকাতার পথে যাত্রা করা হলো। শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছানোর পর বন্ধু আমাকে নিয়ে গেল বেলুড় মঠে। স্টীমারে গঙ্গার এপারে এসে সালকিয়ার ভেতর দিয়ে হাঁটা-পথে আমরা বেলুড় মঠে উপস্থিত হয়েছিলাম। মঠে প্রথমেই দেখা হয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গে। তিনি একটি আরাম-কেদারায় বসে গড়গড়ায় তামাক সেবন করছিলেন। আমরা প্রণাম করলাম। বীরেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মহারাজকে বলল: "অনেকদিন থেকে আমার এই বন্ধু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিল। ওর কিছু কথা আছে।" সেইসঙ্গে বীরেন জিজ্ঞাসা করে নিল, আমি কিছুদিন মঠে থাকতে পারি কিনা। মহারাজ সম্মতি দিলেন। বীরেন কলকাতায় ফিরে গেল। বীরেনের সঙ্গে কথা রইল, কিছুদিন পরে ওর সঙ্গে ঢাকায় ফিরব; মাঝের সময়টুকু বেলুড় মঠে থাকব।

মঠে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো, প্রতিদিন যথাসময়ে প্রসাদ গ্রহণেরও। মহারাজ সেইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ঠাকুরের স্থানে কিছু কাজ ছাড়া অন্নগ্রহণ করা অনুচিত। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) আমার জন্য যে-কাজ ঠিক করে দেবেন, রোজ তা-ই করব, পরে প্রসাদ পাব—এই স্থির হলো। স্বামী ব্রহ্মানন্দ উক্ত ভাবটি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন এবং আমিও বাবুরাম মহারাজের নির্দেশমতো রোজ কিছু কাজ করতাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে আরও বলেছিলেন: "রোজ তুমি আমার সঙ্গে একটু বেড়াবে।"

তিনি বেড়াতেন মঠবাড়ি থেকে স্বামীজীর মন্দির পর্যন্ত—তখন স্বামীজীর মন্দিরের শুধু নিচের অংশটুকু ছিল, উপরের অংশ তৈরি হয়নি। বেড়ানোর সময়ে আমাদের কথাবার্তা হতো। মনে অনেক-কিছু জিজ্ঞাসা ছিল—যেমন, সাধুজীবন সম্পর্কে। কিন্তু সেই সময়ে সবচেয়ে বড় যে-প্রশ্নটি আমার মন অধিকার করে থাকত সেটি

ঐ বিপ্লবী দলের নীতিগত ব্যাপার নিয়ে। সেটি এক সঙ্কটের মতো। মহারাজকে একদিন খোলাখুলি সব বলে তাঁর মতামত জানতে চাইলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সে-সম্পর্কে যে উপদেশ দিলেন, তা আমার মনে খুব দাগ কাটল। তাঁর সস্নেহ কথাবার্তাও খুব ভাল লাগত।

এদিকে সাতদিন হয়ে গেল, বীরেনের দেখা নেই, তার কোন খবরও পাচ্ছি না। কিছুদিন পরে একটা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, বিশেষ প্রয়োজনে তাকে বর্ধমান যেতে হয়েছিল, সেখান থেকে কলকাতায় এসে তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফিরে যেতে হয়, যোগাযোগ করবার সময় পায়নি। আমার সঙ্গে দেখা করতে না পারার জন্য দুঃখপ্রকাশ করে সে লিখেছে, আমি যেন সময়মতো ঢাকায় ফিরে যাই। আমি চিঠিখানি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে দেখালাম। তিনি পড়ে বললেন : "তাইতো, ও চলে গেছে ! তা যাক না, তোমার এক বন্ধু চলে গেছে, আমরা তো অনেক বন্ধু রয়েছি !" সময়ে সময়ে তিনি বলতেন : "বীরেনই তোমার বন্ধু, আমরা কি বন্ধু হতে পারি না ?"

আমার তবু ফিরে যাবার খুব ইচ্ছা হতো। মহারাজকে জানালাম সেকথা। মহারাজ বললেন : "এখনই যেতে চাইছ কেন ? আর একটা মাস থাক না, স্বামীজীর জন্মতিথি আসছে, সেই উৎসব পর্যন্ত থেকে যাও।" আমার তখন ফিরে যাবার ইচ্ছাটা তীব্র। যাই হোক, মহারাজ বলেছেন বলে স্বামীজীর জন্মোৎসব পর্যন্ত থাকব, ভাবলাম। স্বামীজীর জন্মোৎসবে খুব আনন্দ হলো। মহারাজকে সেকথা জানাতে মহারাজ বললেন : "চলে গেলে এই আনন্দ কোথায় পেতে ?"

স্বামীজীর জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়ে গেলে আবার ফিরে যাবার প্রসঙ্গ তুললাম। মহারাজ তখন শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পর্যন্ত থেকে যেতে বললেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসব আর এক আনন্দমেলা। মনে হলো, এই আনন্দের তুলনা নেই। এই উৎসব-আনন্দের শরিক হওয়ার পর লক্ষ্য করলাম, আমার মনে ঘরে ফেরার তাগিদ আর নেই। মনের ভেতর থেকে তখন যেন একটি নতুন রাজ্যের খবর শুনতে পাচ্ছিলাম। অনুভব করছিলাম, সেই রাজ্যটি যেন আমার কত

আপনার। মহারাজকে আর বলতে হলো না, নিজের অন্তরের তাগিদেই মঠে থেকে গেলাম। অবশ্য তাঁর আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

আমার সাধুজীবনের প্রথম পর্বে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছাড়া আর যাঁর বিশেষ প্রভাব আমার ওপর পড়েছিল তিনি হলেন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ। আজও সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁকে স্মরণ করি। এমন প্রেমিক, দরিদ্রবৎসল, বিশেষতঃ এমন কর্মঠ সাধু আমি দেখিনি। এই বাবুরাম মহারাজের শুভেচ্ছা আর প্রেরণাতেই আমি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করি।

তারিখ ঠিক মনে নেই, একদিন বাবুরাম মহারাজের নির্দেশমতো মঠ থেকে কলকাতায় গেলাম। বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন তিনি বলরাম বসুর বাড়িতে থাকবেন; আমাকেও রাত্রিটা সেখানেই কাটাতে বলেন। সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। যেসময়ের কথা বলছি তখন আমাদের কলকাতায় থাকবার আর কোন জায়গা ছিল না। সাধুদের আস্তানা বলতে বলরামবাবুর বাড়ি। সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে ওঠা যেত এবং আহারাদিও করা যেত। আবার অসুখ-বিসুখ হলে সেখানে থেকে যাওয়াও চলত। বলরামবাবুর পরিবারের সকলেই সাধুদের খুব আদরযত্ন করতেন। সেদিন সন্ধ্যায় খুব লম্বা-চেহারার একটি ছেলেকে দেখলাম, বলরামবাবুর বাড়িতে এসেছে। বাবুরাম মহারাজের পরিচিত মনে হলো, তবে আমি তাকে মোটেই চিনতাম না। বাবুরাম মহারাজ আমাকে বললেন ঃ "দ্যাখ, ও যখন আজ এসেছে তোকে একটা কাজ করতে হবে। ছেলেটি কলকাতা শহরের কিছু চেনে না, কাল আবার মা-ঠাকরুনের কাছে ওর দীক্ষা হবে। তুই ওকে কাল সকালে নিয়ে যাবি। প্রথমে উদ্বোধন-বাড়ির কাছে গঙ্গার যে ঘাট আছে সেখানে গিয়ে গঙ্গাস্নান

করবি, ওকেও করাবি। তারপর উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের কাছে ওর দীক্ষার কথা বলবি। পারবি তো?" বললাম: "হ্যাঁ, মহারাজ। কেন পারব না?"

যথাসময়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোররাত্রে শুনতে পেলাম বাবুরাম মহারাজ জেগে উঠে ডাকাডাকি শুরু করেছেন: "বীরেন, উঠে পড়, উঠে পড়, তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে যে।" ঐ ছেলেটির নাম বীরেন। তারপর আমাকে ডেকে বললেন: "উঠে পড়, মুখ-টুখ ধুয়ে নে।" আমি উঠে পড়লাম। মুখ-টুখ ধুয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। সিঁড়ি তখনো অন্ধকার। সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছি, বাবুরাম মহারাজ তখন আমাকে বললেন: "শোন, দাঁড়া একটু। হ্যাঁরে, তোর দীক্ষা হয়েছে? তুইও দীক্ষা নে। মহারাজের সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে কথা হয়েছে; আমার মনে আছে। তিনি তোর দীক্ষার কথা বলেছেন।" একটু থেমে তিনি আবার বললেন: "আমার কথা শুনবি? আমার কথা মানবি?" "কেন মানব না? বলুন মহারাজ", আমি সবিনয়ে বললাম। তিনি বললেন: "শোন, তুই মায়ের কাছে দীক্ষা নে।" আমি প্রশ্ন করলাম: "কিন্তু মায়ের কাছে দীক্ষা নেব কেমন করে? তিনি তো আমাকে ভাল করে চেনেন না। আমি যাই, প্রণাম করেই চলে আসি।" বাবুরাম মহারাজ বললেন: "না, তিনি তোকে চেনেন।" "তাহলে কি বলব আমি?"—জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন: "তুই শরৎ মহারাজের কাছে যাবি, তাঁকে গিয়ে বলবি। সারদানন্দ স্বামী তো তোকে চেনেন?" বললাম: "হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আমাকে চেনেন। পূজনীয় শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) যখন অসুস্থ অবস্থায় উদ্বোধনে ছিলেন, তখন আমি ওখানে ছিলাম। কিছুদিন ওঁর সেবা করেছিলাম। সেই সময়ে স্বামী সারদানন্দ আমাকে দেখেছেন।" বাবুরাম মহারাজ বললেন: "হ্যাঁ, শরৎ মহারাজ তোকে খুব ভালই চেনেন। তোর উপর খুব সন্তুষ্ট। শশী মহারাজের সেবা করলি এতদিন, সেই সময়ে কত পরিশ্রম করেছিলি! তোর সম্পর্কে ওঁর খুব ভাল ধারণা।" আমি বললাম: "সে আমি জানি না।" তিনি

বললেন : "যাই হোক, ওকে সঙ্গে নিয়ে যা। আর তোর নিজের জন্যও নতুন কাপড় নিয়ে যা। দুজনে গঙ্গাস্নান করে উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করবি, বলবি, 'বাবুরাম মহারাজ আমাদের পাঠিয়েছেন; আপনাকে বলেছেন মা-ঠাকরুনের কাছে আমাদের দীক্ষার কথা বলতে আর সেইমতো ব্যবস্থা করতে'।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে আমি পথনির্দেশের প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার প্রার্থনা অবশ্য জানাইনি। তবে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্য তাঁর উপদেশ চেয়েছিলাম। তাছাড়া এই মঠে তাঁরই সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাই তাঁর নিকট দীক্ষালাভের একটি আকাঙ্ক্ষাও মনে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু বাবুরাম মহারাজ এমনভাবে জোর করেছিলেন যে, আমার আর অন্যথা করার উপায় ছিল না। তিনি বলেছিলেন : "আমার উপর তোর বিশ্বাস নেই? তুই আমাকে ভালবাসিস না? দ্যাখ, তোর ভালর জন্যই বলছি, তুই মায়ের কাছে দীক্ষা নে।" এই কথার উত্তরে আমি কি বলব? বুঝেছিলাম যা স্থির হয়েছে, তা-ই আমাকে মেনে নিতে হবে এবং মেনে নেওয়াই উচিত। তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব।

অতএব যথাসময়ে উদ্বোধনে গিয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে সব কথা নিবেদন করলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন : "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে।" তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে আমি যে পূজনীয় শশী মহারাজের সেবা করেছি সেকথাও বললেন। শ্রীশ্রীমা সব কথা শুনে বললেন : "হ্যাঁ, বাবা, তোমার দীক্ষা হবে। যাও, বাবা, নিচে গিয়ে বসো, পরে ডেকে নেব।"

যথাসময়ে দীক্ষা আরম্ভ হলো এবং একে একে আমাদের ডাক আসতে লাগল। প্রথমে আমার সঙ্গীর ডাক এল, তারপর আমার। মা ছিলেন উদ্বোধনের যে-ঘরে এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হয় সেই ঘরটিতে। শ্রীশ্রীমা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন সব সময়ে। আজ কিন্তু ঘোমটা ছিল না। আসন পাতা ছিল। ঘরে ঢুকে সেই

আসনে বসলাম। আসনে বসবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমা আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। যতদূর মনে পড়ে, আমার ইষ্ট সম্বন্ধে বা ঐরকম কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম: "আমার কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না তা তো জানি না। আপনার যা ভাল মনে হয় তা-ই আমাকে দিন, মা।" মা বললেন: "তা-ই দেব।" এরপর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন, তারপর আমাকে মন্ত্র দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, এতদিন যে-ভাব নিয়ে আমি আছি ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী তিনি মন্ত্র দিয়েছেন। আমি তো শ্রীশ্রীমাকে আমার পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে কিছু জানাইনি। তাঁর ইচ্ছামতো মন্ত্র দিতেই অনুরোধ করেছিলাম। আমার পছন্দ তো কত রকমেরই হতে পারে, কিন্তু কী আশ্চর্য, বিশেষ যে-ভাবটি নিয়ে এতদিন অগ্রসর হচ্ছিলাম মা আমাকে ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী মন্ত্র দিলেন! মা-ঠাকরুন তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে আমার মনের কথা ঠিক জেনে নিয়েছেন। এর ফলে আমার মনে খুব তৃপ্তি ও আনন্দ হলো। এইভাবে আমার দীক্ষা হলো।

দীক্ষার পরেও আমি বেলুড় মঠেই আছি। গঙ্গার এপারে আছি আমরা, ওপারে শ্রীশ্রীমা আর তাঁর লীলাসঙ্গী ও সঙ্গিনীরা। এখনকার মতো তখন ইচ্ছামতো মঠ থেকে বেরিয়ে কোথাও যাতায়াত করা যেত না। তাছাড়া মঠের গাড়িও ছিল না। কাজেই ইচ্ছা হলেই শ্রীশ্রীমাকে যে দর্শন করব, সেটি তখন সম্ভব ছিল না। তবে যখন বাবুরাম মহারাজ আমাকে কোন কাজের জন্য কলকাতায় পাঠাতেন, তখনই বলে দিতেন: "মায়ের বাড়িতে প্রসাদ পাবে আর ওখানে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করবে।"

মা-ঠাকরুনকে প্রণাম করা ছিল আবার একটি সমস্যা। সর্বদা তাঁকে মহিলারা ঘিরে থাকতেন। তাই প্রথমে দর্শনের কথা পূজনীয় শরৎ মহারাজকে বলতে হতো; তিনি রাসবিহারী মহারাজকে (স্বামী অরূপানন্দকে) বলে দিতেন; রাসবিহারী মহারাজ ভক্তদের মায়ের কাছে নিয়ে যেতেন। এই ছিল নিয়ম। শ্রীশ্রীমা ও মহিলা-ভক্তদের

অসুবিধা হবে ভেবে দর্শনের কথা বলতে আমার একটু অস্বস্তি হতো। যাই হোক, বাবুরাম মহারাজের নির্দেশ অনুসারে শরৎ মহারাজের কাছে গিয়ে দর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করতাম এবং ক্রমে ব্যবস্থা হয়ে যেত। শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে গিয়ে দেখতাম তাঁর মুখ লম্বা ঘোমটায় ঢাকা। মঠ থেকে এসেছি শুনে মাথার কাপড় একটু সরিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন ঃ "বাবা, মঠের খবর কি ? বাবুরাম কেমন আছে ? তারক (মহাপুরুষ মহারাজ) কেমন আছে ?" পরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মঠের প্রত্যেকের কুশল-সমাচার নিতেন—ভৃত্যদেরও। মাকে সব বলতে হতো। কিন্তু এই রকম দর্শন ঘটত বিশেষ কোন কাজের উপলক্ষে এবং সেরকম উপলক্ষও কচিৎ-কদাচিৎ পাওয়া যেত। শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার অথবা সেখানে তাঁর পরিমণ্ডলে দিনযাপনের সুযোগ আমার কখনো হয়নি।

শ্রীশ্রীমাকে একবার দুর্গাপূজার সময়ে বেলুড় মঠে দেখেছি। সেবার পূজার সময়ে পূজনীয় রাখাল মহারাজ মঠে ছিলেন না। মহাপুরুষ মহারাজ এবং তুরীয়ানন্দ স্বামীও ছিলেন না। উৎসব-আয়োজনের সবকিছুর মূলে ছিল বাবুরাম মহারাজের প্রেরণা। তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা। আর পূজার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন জনৈক ভক্ত। তখন কলকাতা থেকে নৌকায় প্রতিমা আনা হতো। পূজা হতো শ্রীরামকৃষ্ণের পুরানো মন্দির আর মঠবাড়ির মাঝের জায়গায়। ঐ জায়গাটা বাঁশ দিয়ে ঘিরে উপরে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো। সেবারও সেইখানেই পূজা হলো। যতদূর মনে পড়ছে, তন্ত্রধারক হয়েছিলেন পূজনীয় শশী মহারাজের বাবা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী।

মহাসমারোহে এবং মহানন্দে পূজা অনুষ্ঠিত হলো। একদিন সমাগত সব ভক্তের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য এখনকার তুলনায় তখন ভক্তের সংখ্যা অনেক কম ছিল। বাবুরাম মহারাজ আর একদিন বেলুড় মঠের নিকটবর্তী অঞ্চলের যেসব জেলে গঙ্গায় মাছ ধরত তাদের সকলকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই জেলেদের নৌকা মঠের ঘাটের কাছেই থাকত আর এরা প্রতিদিন মঠে কিছু মাছ দিয়ে যেত দাম না নিয়ে। ওদের সেদিন তিনি আনন্দ করে ভরপেট প্রসাদ খাওয়ালেন। গরিব এই মানুষগুলিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ খাইয়ে তিনি পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। মানুষকে, বিশেষতঃ গরিব মানুষকে, ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়ে আনন্দ-লাভ—এটি বাবুরাম মহারাজের অনন্য চরিত্রের একটি লক্ষণীয় দিক।

ভক্ত যাঁরা মঠে আসতেন তাঁদের যত্ন-আপ্যায়নের প্রতি তাঁর বিশেষ নজর থাকত। তিনি বলতেন : "দ্যাখ, ওরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসছে, তোর বা আমার কাছে নয়। তুই নিশ্চয় ঠাকুরকে ভালবাসিস, ভালবাসিস তো ? তাহলে ঠাকুরের কাছে যারা আসছে তাদেরও সেই নজরে দেখবি। প্রিয়জনের মতো দেখবি, দেখবি ভক্তি-শ্রদ্ধার সঙ্গে। সতর্ক দৃষ্টি রাখবি যাতে ওদের আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি না হয়ে যায়।" মনে হয়, এসব তিনি বলতেন যাতে ওঁদের সম্পর্কে আমাদের মনে কোন রকম উপেক্ষার বা বিরক্তির ভাব না আসে। তাঁর সেই মহৎ, উদার, আশ্চর্য প্রেমানুভূতি আমি লক্ষ্য করতাম—মানুষের প্রতি প্রেম, প্রত্যেকের প্রতি।

বাবুরাম মহারাজের ঐকান্তিক প্রেরণায় যেমন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার দীক্ষা লাভ হয়েছিল, তেমনই তাঁরই বিশেষ আগ্রহে জয়রামবাটীতে গিয়ে মায়ের দর্শনলাভ এবং তাঁর সান্নিধ্যলাভেরও সুযোগ হয়েছিল একবার। এই সুযোগটি ঘটে মায়াবতীতে তিন-চার বছর থাকার পর কিছুদিনের জন্যে যখন বেলুড় মঠে ফিরে আসি সেই সময়ে। মেদিনীপুরে বন্যার সময়ে সেখানে কয়েকমাস রিলিফের কাজ করবার পর আমাকে মায়াবতী আশ্রমে কর্মী হিসাবে পাঠানো হয়। বাবুরাম মহারাজের ইচ্ছা ছিল না আমি মায়াবতী চলে যাই। তিনি আমাকে আপত্তি জানাতেও বলেছিলেন। কিন্তু আপত্তি আমি

করিনি। কর্তৃপক্ষ—স্বয়ং স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ—যে-ব্যবস্থা করেছেন তা আমি বিনা বাক্যে মেনে নেব না কেন? বুঝতে পেরেছিলাম, আমি মায়াবতী চলে যাওয়ায় বাবুরাম মহারাজ মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এর মূলে অবশ্যই ছিল আমার প্রতি তাঁর অহেতুক স্নেহ-ভালবাসা।

যাই হোক, তিন-চার বছর পরে মায়াবতী থেকে কয়েকদিনের জন্যে যখন বেলুড় মঠে এসেছি, সেই সময়ে বাবুরাম মহারাজ একদিন সকালে আমাকে বললেন: "তুই তো এখন এদিক ছাড়া হয়ে গেছিস! হ্যাঁরে, এখানে এলি, মায়ের দর্শন হয়েছে? কখনো মায়ের বাড়ি জয়রামবাটী গেছিস?" আমি বললাম: "না মহারাজ, এবার দর্শন তো হয়নি। জয়রামবাটী কখনো যাইনি।" এমনিতে জয়রামবাটী সম্পর্কে আমার একটা ভীতি ছিল। জয়রামবাটী মশা আর ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি বলে শুনে এসেছি। এরকম জায়গায় নিজে থেকে কখনো আমার যাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। তীর্থযাত্রী যে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিয়ে তীর্থস্থানে যায়, সেই ভাব নিয়ে জয়রামবাটী যাওয়ার চিন্তা আমার মনে কখনো আসেনি। বাবুরাম মহারাজ বললেন: "এবার মায়াবতী ফেরবার আগে জয়রামবাটী ঘুরে আয় না কেন?" কিন্তু আমি যে যাব, যাবার জন্য তো কিছু টাকা-পয়সা চাই। মায়াবতী ফিরে যাওয়ার যতটুকু ভাড়া, ততটুকুই আমার কাছে ছিল, তার অতিরিক্ত এক পয়সাও ছিল না। তাহলে কি করে জয়রামবাটী যাব? তাঁকে সেইকথা জানালে তিনি বললেন: "টাকার জন্য তোকে ভাবতে হবে না, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" তারপর সন্ধ্যাবেলায় আমাকে ডেকে বললেন: "কাল সকালেই রওনা হয়ে যা। শ্রীরামপুর থেকে এক ভদ্রলোক ও এক ভদ্রমহিলা দীক্ষা নেবার জন্য জয়রামবাটী যাচ্ছেন। তাঁরা হাওড়া স্টেশনে তোর জন্য অপেক্ষা করবেন। তাঁদের সঙ্গে যাবি তুই।" যাওয়ার সময় সবকিছু সুষ্ঠুভাবেই হলো। ঐ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার বাসন্তী-পূজার সপ্তমীর দিন দীক্ষার কথা, আমরা পৌঁছালাম আগের দিন। ওঁরাই সব খরচপত্র বহন করলেন—টিকিট কেনা এবং অন্যান্য সবকিছুই।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে সেবার তিন-চার দিন ছিলাম। ওখানে দুটি ছেলেকে সেই প্রথম দেখ্‌লাম : রামময় ও বরদা। এছাড়া সেখানে ছিল এক বলিষ্ঠ যুবক, খুব শক্ত-সমর্থ চেহারা এবং দেখেই মনে হয় বেপরোয়া। সে সিলেটের জ্ঞান। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমাকে দেখেই সে অভ্যর্থনা জানাল : "আসুন, আসুন। ওদিকে চলুন, মাকে দর্শন করবেন।" জয়রামবাটীর বাড়ির কোথায় কি, কোন্ ঘরে কে থাকেন বা কি হয়, কিছুই আমার জানা ছিল না। জ্ঞান আমাকে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম। প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠলাম : "এ কি করছ তুমি, রান্নাঘরে নিয়ে যাচ্ছ কেন ? মা কোথায় ? আমি মাকে প্রণাম করতে এসেছি ঠিকই, কিন্তু তিনি এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত থাকেন তো সেখানকার কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তো আমি অপেক্ষা করতে পারি।" কিন্তু এসব বললে কি হবে, জ্ঞানকে নিরস্ত করা গেল না। সে আমাকে রান্নাঘরে শ্রীশ্রীমার সামনে হাজির করিয়ে ছাড়ল। আমি সেখানেই মাকে প্রণাম করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : "মা, আপনি এখানে কি করছেন, রুটি সেঁকছেন ?" তিনি বললেন : "বাবা, এখানকার লোক রুটি খায় না। কলকাতা থেকে আমার ছেলেরা যখন আসে তাদের জন্য রুটি করি।" সেই সময়ে জয়রামবাটীতে অনেক অতিথি। তাদের জন্য শ্রীশ্রীমা রুটি করছিলেন। মা আমাকে বললেন : "যাও বাবা, মুখ হাত ধুয়ে নাও। আমি একটু পরেই আসছি।" আমার সঙ্গীদের দীক্ষাসংক্রান্ত পত্রটি শ্রীশ্রীমাকে দিলাম। সপ্তমীর দিন ওঁদের দীক্ষা হবে এই ঠিক হলো। আগেই বলেছি, আমরা ওখানে গিয়েছিলাম বাসন্তীপূজার সময়ে।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে দেখলাম ভিন্ন রূপে—কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে যেমন দেখেছিলাম ঠিক তেমন নয়। মা এখানে ঘরোয়া সাজে—ঘোমটা ছিল না। সরলতা আর পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। যাবতীয় গৃহস্থালির কাজে তিনি নিরত। একদিন ভোরবেলা তাঁকে দেখলাম, হাতে একটি পাত্র—কষ্ট করে হাঁটছেন।

বোধহয় পায়ে বাতের জন্যে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। পাত্রটি নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন কোন প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে। পথে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম: "এত ভোরে কোথায় যাচ্ছেন, মা?" বললেন: "গোয়ালার বাড়ি যাচ্ছি, দুধের জন্য। আমার কলকাতার ছেলেদের সকালে চা খাওয়ার অভ্যাস, তাই দুধ আনতে যাচ্ছি।" শ্রীশ্রীমা নিজেই চলেছেন দুধ জোগাড় করতে! বিস্মিত হয়ে গেলাম। উদ্বোধনের বাড়িতে তাঁর ঘোরাফেরার অবকাশ ছিল না, তাই সেখানে তিনি নববধূর মতো আড়ষ্ট হয়ে থাকতে বাধ্য হতেন। কিন্তু জয়রামবাটীতে তিনি স্বাধীন, আর সর্বদা কাজ করছেন—নিজেই করছেন সব কাজ। চলে যেতে যেতে তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন: "ঐ-ঘরের বারান্দায় কুটনো কোটার সময়ে তোমার কাছ থেকে মায়াবতীর গল্প শুনব।" তাঁর শয়নঘরের ঠিক বাইরে তরকারি কোটা হতো। তিনি আবার বললেন: "ঐখানে তুমি আসবে আর মায়াবতীর সব কথা, সবকিছু শুনব।"

তাঁর কথামতো আমি যথাসময়ে হাজির হলাম। তিনি কুটনো কুটতে থাকলেন আর আমি মায়াবতীর কথা বলে চললাম। যে তিন-চার দিন জয়রামবাটীতে ছিলাম, সেই কয়দিনই এইভাবে মায়াবতী-প্রসঙ্গ চলেছিল।

তিনি ধর্মপ্রসঙ্গে অথবা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাকে বিশেষ কিছু বলেননি, আমিও তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। তবে কথাপ্রসঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে বলতেন: "যেখানেই থাক, যে-কাজের মধ্যেই থাক, ঠাকুরকে সদাসর্বদা ধরে থেকো।" তিনি অল্পকথায় উপদেশ দিতেন। নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়ে আমার কাছে কখনো কিছু বলেননি।

শরীরত্যাগের পূর্বে তাঁকে আমার শেষ দর্শন হয় উদ্বোধনে—তখন তিনি বিশেষ পীড়িত। শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় তখন নিয়মিত উদ্বোধনের বাড়িতে এসে তাঁর চিকিৎসা করতেন। তাঁকে তখন দেখেছিলাম: শান্তভাবে সব রোগযন্ত্রণা সহ্য করছেন। সতীশ মহারাজ—কাশীর সত্যানন্দ স্বামী—আর আমি তাঁকে প্রণাম করতে

গিয়েছিলাম। বেলুড় থেকে আমার মায়াবতী ফিরে যাবার কথা, তারপর সেখান থেকে মানস সরোবরের পথে যাত্রা করবার কথা। আমি মায়ের আশীর্বাদ চাইলাম। সব শুনে তিনি বললেন : "বাবা, আমি শুনেছি, মানস বড় দুর্গম তীর্থ। খুব সাবধানে থাকবে। যা-ই কর, সর্বদা ঠাকুরকে ধরে থেকো।" মানসের পথে আমার একটি আশ্চর্য দর্শন হয়। স্বপ্নদর্শন। এই সূত্রে বলে রাখা দরকার, আমার সাধারণত দর্শন জাতীয় অভিজ্ঞতা হয় না।

মানসতীর্থে যাওয়ার পথে আলমোড়া জেলার ভেতর এক জায়গায় কয়েকদিন আমরা বিশ্রাম করেছিলাম। সেখানে কয়েকজন পরিচিত ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করি। একটি ছোট বাড়িতে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সেইখানেই প্রথম অথবা দ্বিতীয় রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখি। ঘুম ভাঙার পর ঘড়িতে দেখেছিলাম, রাত তখন দুটো।

স্বপ্নে দেখলাম শ্রীশ্রীমাকে। মাকে যেন অপূর্ব সাজে সাজানো হয়েছে, চরণ দুখানি আলতায় রাঙানো। সুন্দর, পরিষ্কার একটি শাড়ি পরনে, গলায় ফুলের মালা। মাকে খুব দীপ্তিময়ী দেখাচ্ছিল। যেখানে মাকে এনে রাখা হয়েছে, সেই জায়গাটিও স্পষ্ট দেখেছিলাম। সেটি হলো গঙ্গাতীরবর্তী সেই স্থান, যেখানে এখন তাঁর মন্দির। অনেক লোকের সমাবেশ সেখানে দেখলাম। কিন্তু মাকে ওরা কাঁধে বয়ে এনেছে না গাড়িতে এনেছে তা বুঝতে পারলাম না। ভিড়ের মধ্যে তিনজনকে স্পষ্ট দেখেছি : মাখন সেন, সুরেশ মজুমদার এবং ঐ দলের আর এক ভদ্রলোক যার নাম এখন মনে করতে পারছি না। আশ্চর্যের বিষয়, দ্বিতীয়বার এই দৃশ্য অথবা শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে অন্য কোনো দৃশ্য স্বপ্নে আসেনি।

মানস থেকে ফেরবার পথে আমরা তাকলাকোটে বিশ্রাম করেছিলাম। তাকলাকোট একটি বড় ব্যবসার জায়গা। ওখানে তখন সাধারণত পণ্য-বিনিময়ে ব্যবসা চলত। অর্থাৎ ভারতীয় জিনিসের বিনিময়ে ঐ জায়গার জিনিস পাওয়া যেত। পশম আর পশমে তৈরি

জামাকাপড়ের আদান-প্রদানই ছিল প্রধান ব্যবসা। ভারতের বাসিন্দা ভুটিয়ারাও ওখানে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করত। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একজন কমিশনার ওখানে গিয়ে দেখাশুনা করে আসতেন, দরদাম বেঁধে দিয়ে আসতেন। লোকজন নিয়ে তিনি একটি বিরাট তাঁবুতে থাকতেন।

যাওয়ার পথে তাঁকে দেখিনি, কিন্তু ফেরবার পথে সেই অফিসারকে দেখলাম। অফিসারটি পাঞ্জাবের অধিবাসী। যেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো সেখান থেকে তাঁর তাঁবু কিছু দূরে। ভদ্রলোকটি আমার্দের সেই তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমাকে নমস্কার করে তিনি বললেন ঃ "মহারাজ, আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।"

তাঁর তাঁবুতে গিয়ে আমাদের খুব আরাম হলো। সেখানে দু-একটা খবরের কাগজ আছে, দেখতে পেলাম। তিনি প্রথমে আমাদের সেসব পড়তে দিলেন না। চা খাওয়ার পর তিনি জানালেন, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের পক্ষে একটা দুঃসংবাদ আছে। পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত একটা খবরের কাগজ তিনি আমাদের পড়তে দিলেন। দুটি দুঃসংবাদ ঐ পত্রিকায় ছিল প্রথম খবরটি হলো ঃ শ্রীশ্রীমা দেহত্যাগ করেছেন। মোটামুটি বিস্তারিত আকারে সংবাদটি প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংবাদটি এক বিখ্যাত জননেতার পরলোকগমন সংক্রান্ত।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, যে-রাত্রে আমি শ্রীশ্রীমায়ের শরীরত্যাগের স্বপ্নটি দেখি, তার পরের দিন সতীশকে সেটি তার ডায়েরীতে লিখে রাখতে বলি। সে এই খবরের কাগজে সংবাদটি দেখার অনেক আগের কথা। পরে মিলিয়ে দেখেছি, ঠিক সেইদিনই শ্রীশ্রীমা শরীরত্যাগ করেন।

কিন্তু আর কখনো শ্রীশ্রীমা আমাকে স্বপ্নে দেখা দেননি। তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি সেই একবারই—কিন্তু সে-দর্শন অতিশয় স্পষ্ট। অতি স্পষ্ট দেখেছিলাম তাঁর মুখ, তাঁর চোখ এবং তাঁকে ঘিরে থাকা সব

লোককে। মনে আছে, অপূর্ব সুষমায় পূর্ণ সেই মুখমণ্ডল—আমার স্বপ্নে দেখা মায়ের সেই মুখখানি!*

---

* ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে স্বামী বুধানন্দ স্বামী অভয়ানন্দের স্মৃতিকথাটি টেপ রেকর্ডে ধরে রাখেন। পরে তা থেকে তুলে সম্পাদনা করে তিনি স্বামী অভয়ানন্দকে শোনান। অভয়ানন্দজী সম্পাদিত স্মৃতিকথাটি অনুমোদন করেন। বর্তমান স্মৃতিকথাটি স্বামী বুধানন্দের কাছে ১৯৮১-র অক্টোবরে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সংগ্রহ করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে স্বামী বুধানন্দ সঙ্কলিত নয়াদিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত 'Sri Sarada Devi : The Great Wonder' গ্রন্থে। স্মৃতিকথাটি তারপর 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক

মায়ের কৃপা

স্বামী অপূর্বানন্দ

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দ আমার জীবনের স্মরণীয় বছর। ঐ বছরেই আমি প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য লাভ করি, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ পুণ্যপীঠ বেলুড় মঠ দর্শন করি এবং ঐ বছরই আমি শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচজন সাক্ষাৎ শিষ্য—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী সুবোধানন্দের দর্শন লাভ করি।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর কয়েকদিন পরে প্রথম বেলুড় মঠে যাই এবং সেখানে আট-দশ দিন বাস করি। বেলুড় মঠ দর্শনেরও একটু ইতিহাস আছে। আমি একবার স্বপ্নে বেলুড় মঠ ও মহাপুরুষ মহারাজকে দেখি। ঐ স্বপ্নের কথা চিঠিতে মহাপুরুষ মহারাজকে জানিয়ে বেলুড় মঠ দর্শনের অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি তা দিয়েছিলেন। ঐ চিঠি পেয়ে বেলুড় মঠ অভিমুখে যাত্রা করলাম। মঠে পৌঁছে দেখলাম—সেই আমার স্বপ্নদৃষ্ট বেলুড় মঠ!

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলায় ঠাকুরঘরে (পুরানো মন্দির) প্রণাম করতেই সমগ্র মনপ্রাণ আনন্দে ভরে গেল। খানিক পরে উঠোনে নেমে এসে জনৈক সন্ন্যাসীকে মহাপুরুষ মহারাজের দর্শনের প্রার্থনা জানাতে আমায় তিনি নিয়ে গেলেন মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। মঠবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতেই একজন দিব্যকান্তি শান্তদর্শন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে দেখেই মন বলে দিল, ইনিই আমার স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ মহারাজ। সস্নেহে তিনি আমার দিকে তাকালেন—কৃপা ও করুণা যেন ঝরে পড়ছে ঐ চাহনিতে। আমি অভিভূতের মতো তাঁর চরণে প্রণত হলাম। তাঁর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ "আমি তো কাউকে দীক্ষা দিইনে। ঠাকুরই তোমার গুরু, তুমি পতিতপাবন

রামকৃষ্ণ-নাম জপ কর, এতেই তোমার কল্যাণ হবে। পরে যদি দীক্ষার প্রয়োজন হয়, সে ব্যবস্থাও তিনিই করে দেবেন।"

দু-তিন দিন মঠে থাকার পর একদিন সকালে যথারীতি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতে গিয়েছি, তিনি নিজেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কথা তুলে বললেন : "তুমি তো মাকে দেখনি। তোমার মহাভাগ্য যে এসময় শ্রীমা বাগবাজারের উদ্বোধনে আছেন—তাঁকে দর্শন করতে যেও। বলরাম-মন্দিরে মহারাজ, হরি মহারাজ রয়েছেন, তাঁদেরও দর্শন করবে।" পরদিন সকালেই যাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন : "উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজকে, আর বলরাম-মন্দিরে মহারাজ ও হরি মহারাজকে দর্শন করে বলবে যে, আমি তোমাকে মঠ থেকে পাঠিয়েছি।"

পরদিন সকালবেলা নৌকায় বাগবাজারে পৌঁছালাম। নৌকা থেকে নেমে জিজ্ঞেস করে যখন উদ্বোধনে মায়ের বাড়ী পৌঁছালাম, তখন দেখলাম মায়ের বাড়ীর সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমি পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার গাড়িটি চলে গেল। মায়ের বাড়ীর ভেতরে ঢুকতেই একজন সাধু বললেন : "শ্রীমা এইমাত্র ঘোড়ার গাড়িতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বলরাম-মন্দিরে গিয়েছেন। এ-বেলা তাঁর দর্শন হবে না। বিকেলে মহিলা-ভক্তদের দর্শনের সময়। অতএব আগামীকাল সকালে ছাড়া মায়ের দর্শন অসম্ভব।"

মায়ের দর্শন হবে না শুনে মনটা খুব দমে গেল। এই সময় একজন স্থূলকায় প্রবীণ সাধু গঙ্গাস্নান করে ফিরলেন। ভিজে গামছা পরা, কাঁধে পাটকরা ভিজে কাপড় ও হাতে গঙ্গাজলের ঘটি। প্রণাম করতে গেলেই গম্ভীর স্বরে বললেন : "দাঁড়াও, আগে পা-টা ধুয়ে নিই।" ঐ সাধু জানালেন : "ইনি স্বামী সারদানন্দ।" পা ধুয়ে বারান্দায় দাঁড়াতেই তাঁকে প্রণাম করে মাকে দর্শন করার প্রার্থনা জানালাম। আরও জানালাম যে, পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমায় পাঠিয়েছেন। স্বামী

সারদানন্দও বললেন, সেদিন শ্রীমায়ের দর্শন সম্ভব নয়। পরদিন সকালে মায়ের দর্শন হতে পারে।

তখন উদ্বোধনে আরও দু-এক জন সাধুকে প্রণাম করে বলরাম-মন্দিরে রাজা মহারাজ ও হরি মহারাজকে দর্শন করতে রওনা হলাম। বলরাম-মন্দিরে গিয়ে রাজা মহারাজের দর্শন পেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন তো ভাগ্যে ঘটেনি—কিন্তু তাঁর মানসপুত্রকে স্থূল শরীরে দর্শন ও প্রণাম করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হলো। কিন্তু হরি মহারাজের দর্শন পেলাম না। তাঁর সেবক-মহারাজ বললেন, সন্ধ্যার পরে তাঁর দর্শন হবে—এ-বেলা নয়। সন্ধ্যার পরে আবার গেলাম বলরাম-মন্দিরে। সেবক-মহারাজের সঙ্গে দেখা হলো।

সেবক-মহারাজ আমাকে হরি মহারাজের ঘরে নিয়ে গেলেন। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম, তারপর পাদস্পর্শ করলাম। তিনি আমায় পাশের ছোট বেঞ্চিতে বসতে বললেন এবং সস্নেহে নানা কথা বলতে লাগলেন। মায়ের দর্শন পাইনি, তাতে মনটা খুবই খারাপ ছিল। মমতা-ভরা স্বরে তিনি আমায় বললেন ঃ "মায়ের দর্শন কি সোজা কথা ? তিনি তোমার অন্তরে ব্যাকুলতা বাড়াবার জন্য আজ দর্শন দেননি। পরে তাঁর দর্শন পাবে। সেজন্য দুঃখ করো না। তোমার মনে তাঁর অভাববোধ আরও বাড়লে ঠিক সময়ে তিনি দর্শন দেবেন। খুব কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা কর। তিনি প্রসন্না হয়ে অবশ্যই দর্শন দেবেন।" শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের পেছনে যে এত কথা আছে, এত প্রস্তুতির প্রয়োজন—তা আমার ধারণা ছিল না। তাঁর কথায় মনটা শান্ত হলো। তাঁকে প্রণাম করে বাসস্থানে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালবেলা শ্রীমায়ের দর্শনে গেলাম, হলো না। সাধু-মহারাজরা বললেন যে, সেদিন সকালে বিশেষ কারণে পুরুষ-ভক্তদের দর্শন হবে না। আগামী দিন সকালে আসতে বললেন। মনটা খুব দমে গেল। বলরাম-মন্দিরে গেলাম পূজনীয় মহারাজ ও হরি মহারাজের দর্শনে, তা-ও হলো না। দিনটি যেন শতযুগের মতো

বড় মনে হতে লাগল ! যতটা সম্ভব ধ্যান ও প্রার্থনাদি করলাম, কিন্তু মনের ভেতর একটা বিরাট শূন্যতা—শূলবিদ্ধবৎ ছটফট করে কাটালাম। সন্ধ্যায় আবার গেলাম হরি মহারাজের কাছে। নানাভাবে তিনি আমায় সান্ত্বনা দিলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কাছে বসে তাঁর স্নেহে আপ্লুত হয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিলাম। রাত্রে প্রাণের অস্থিরতায় ঘুম হলো না।

আমি উঠেছিলাম এক ভক্তের বাড়িতে। পরদিন ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে ভক্তটির ঠাকুরঘরে একটু বসেছি ধ্যান করব বলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। আনন্দ ও বিস্ময়ে বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে অনেকক্ষণ আসনে বসেছিলাম। আসন থেকে যখন উঠলাম তখন সাড়ে ছটা বেজে গেছে—আমিও ধ্যানের কথা ভাবতে ভাবতে আশাভরা প্রাণে মায়ের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

উদ্বোধন-বাড়িতে পৌঁছে দেখি, ততক্ষণে পনের-বিশ জন ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করছেন। জানা গেল যে, মায়ের দর্শন হবে। আনন্দে অধীর হয়ে গেলাম। সাড়ে সাতটার পরে একজন মহারাজ একটি বড় রেকাবিতে শালপাতায় সাজানো প্রসাদ নিয়ে এসে সকলের হাতে হাতে দিয়ে বললেন : "মা প্রসাদ পাঠিয়েছেন, প্রসাদ খেয়ে অপেক্ষা করুন। মায়ের দর্শনের জন্য ডাকা হলে সকলে দর্শন করতে যাবেন।" তিনি আরও বললেন যে, মা নিজের হাতে প্রসাদ সাজিয়ে ভক্তদের জন্য পাঠিয়েছেন। ঐ প্রসাদ খেতে খেতে খুব আনন্দ হলো। মা প্রসন্না হয়ে নিজের হাতে প্রসাদ পাঠিয়েছেন। এর চাইতে বড় প্রাপ্তি আর কি হতে পারে ? ঐ প্রসাদে ছিল শ্রীমায়ের স্পর্শ, তাঁর স্নেহ ও মমতা।

ভক্তরা বলাবলি করছিলেন : "সামনের এক সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হবে, মাকে দর্শন করে অন্যদিক দিয়ে নেমে আসতে হবে। মা পুরুষ-ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন না", ইত্যাদি। আমি এসব জানতাম না। মা পুরুষ-ভক্তদের সঙ্গে কথা বলেন না শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। আমি তো মা বলে ডাকব, তিনি কি সাড়া দেবেন না ! একটা

কথাও বলবেন না ! মন এ-চিন্তায় যেন শতধা বিখণ্ডিত হচ্ছিল। এমন সময় দেখলাম ভক্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে। উপরে উঠবার সিঁড়ি দিয়ে চলেছেন সবাই সারিবদ্ধ হয়ে। সিঁড়ি পর্যন্ত সকলে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার মনে হলো ঃ আমি সকলের পেছনে থাকব। সকলের শেষে আমি প্রণাম করব। বালক-বুদ্ধি ! শেষটায় আবার ভয় হলো—মা যদি ততক্ষণে চলে যান, যদি প্রণাম করতে না পাই।

কিন্তু তখন আর এগিয়ে গিয়ে অন্য রকম কিছু করার উপায় ছিল না। ঐ লাইনে সকলের শেষে চুপচাপ প্রার্থনারত হয়ে দাঁড়িয়ে মায়ের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। ভোরবেলার ধ্যানের চিত্রটি অন্তরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ভক্তরা সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছেন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে, আমিও অনুসরণ করে চলেছি। ক্রমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখা গেল একটি ঘরের দরজার সামনে এক-একজন ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করছেন এবং অন্য দিক দিয়ে নেমে যাচ্ছেন। এগিয়ে চলেছি—আমার পেছনে আর কেউ নেই। ঘরের দরজার সামনে প্রণামের স্থানে এসে দেখি শ্রীমা আপাদমস্তক একখানি গরদের সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে অবগুণ্ঠিতা হয়ে বসে আছেন—মায়ের পা-ও দেখা যায় না—সবই ঢাকা। মনটা দমে গেল—অপেক্ষা করার সময় ছিল না। আমিও নতজানু হয়ে মায়ের সামনে ভূমিতে মাথা রেখে প্রণাম করলাম—হয়তো তিরিশ-চল্লিশ সেকেণ্ড বা এক মিনিট মাথা নিচু করে ছিলাম—চোখ জলভরা। মাথা তুলেই দেখি মা চাদরটি সরিয়ে দিয়েছেন, মুখে অবগুণ্ঠন নেই। সস্নেহে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলাম। তাঁর পাদস্পর্শ করবার জন্য হাত বাড়াতেই মা স্মিতমুখে আমার মুখে হাত বুলিয়ে চোখের জল মুছে দিলেন এবং আমার চিবুক ধরে চুমু খেলেন। আর মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "বাবা ! প্রসাদ খেয়েছ ?" আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু বললাম ঃ "হ্যাঁ মা, খেয়েছি।" ব্যস্, এই দুটি মাত্র কথা।

মায়ের স্নেহস্পর্শ মধুর-বচনে অন্তর ভরে গিয়েছিল—আমি অবাক হয়ে শুধু দেখছিলাম মাকে—ভোরবেলায় ধ্যানের সময় এঁকেই তো দর্শন করেছিলাম। সেই সরু লালপেড়ে কাপড়খানি পরা মাতৃমূর্তি আমাকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে সর্বাঙ্গে চুম্বন ও স্পর্শ দিয়ে হাত বুলিয়ে কতভাবে আদর করেছিলেন। সবই স্বপ্নবৎ মনে হচ্ছিল। ইচ্ছা হলো মাকে জিজ্ঞাসা করি—কিন্তু তা করিনি। মাকে আর একবার প্রণাম করে বিদায় নিলাম। একটু এগিয়ে গিয়ে ফিরে চেয়ে দেখি মা তখনো বসে আছেন—আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে। তিনি দৃষ্টির ভেতর দিয়ে আমায় অনুসরণ করছেন। এত বৎসর পরে এখন ঠিক জেনেছি, বুঝেছি—আমি যত দূরেই যাই না কেন, তাঁর দৃষ্টিরেখার বাইরে যেতে পারি না কিছুতেই।

নেমে এসে প্রথমেই মনে হলো, আমার এই সৌভাগ্যের সমাচারটি ছুটে গিয়ে আগে পূজনীয় হরি মহারাজকে দেব। তখন বেলা সাড়ে আটটা। তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কি না সে এক কথা। তাছাড়া সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হলো—মঠ থেকে তিনদিন এসেছি, একদিনের জন্য এসেছিলাম, দর্শনাদি সেরে সেদিনই মঠে ফিরে যাবার কথা ছিল, বিশেষ করে অনিশ্চয়তার জন্য কোন খবরও মঠে পাঠাতে পারিনি। তাই তখনই মঠে ফিরে যাওয়া স্থির করলাম।

পূজনীয় হরি মহারাজের সঙ্গে স্থূল শরীরে আর দেখা হয়নি। তাঁর আশীর্বাদেই আমি শ্রীমায়ের দর্শন পেয়েছিলাম। তিনিই পুণ্যস্পর্শ দিয়ে আমার দেহমন পবিত্র করে দিয়েছিলেন—প্রার্থনার দ্বারা মাতৃদর্শনের সব বাধা করেছিলেন অপসারিত এবং শক্তিপূর্ণ প্রেরণায় অগ্রগতির পথে করেছিলেন চালিত। আমার অন্তরের সকল কৃতজ্ঞতা তাঁকে জানাতে পারিনি বলে এখনো অনুশোচনা হয়।

মঠে গিয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে সব বললাম। তিনি খুশি হয়ে বললেন : "তোমার ভাগ্য ভাল, নইলে এমন সব যোগাযোগ হওয়া। শ্রীমাকে দর্শন করেছ—তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন—আশীর্বাদ করেছেন—এ কি সাধারণ কথা ! তোমার মঙ্গল হবে—আমি বলছি—খুব মঙ্গল হবে। ঠাকুর তোমায় কৃপা করেছেন।"

সেবার আট-দশ দিন বেলুড় মঠে বাস করে, নিজেকে মঠে রেখে শুধু দেহটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

আগস্ট ১৯১৯। রামকৃষ্ণ মিশন বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য সেবা করছিল। মহাপুরুষ মহারাজ আমায় লিখলেন : "বাঁকুড়া জিলার ইঁদপুর অঞ্চলে আমাদের মঠ হইতে দুইজন সাধু দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছে। ওখানে একজন কর্মীর প্রয়োজন, অতএব তুমি পত্রপাঠ মঠে চলিয়া আসিবে। আমরা তোমাকে বাঁকুড়ায় সেবাকার্যে পাঠাইব।" চিঠিখানা পাবার দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমি একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে বেলুড় মঠের দিকে যাত্রা করলাম এবং তৃতীয় দিন মঠে পৌঁছে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি আনন্দে বললেন : "এসেছ ? বেশ করেছ। আজ রাতেই বাঁকুড়া যেতে হবে।"

ইঁদপুরে গিয়ে সেবাকাজে যোগ দিলাম। মায়ের বাড়িও ঐ বাঁকুড়া জেলায়, আর মা তখন জয়রামবাটীতেই আছেন। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার এবং তাঁর কৃপা লাভের এটাই প্রশস্ত সুযোগ মনে করে মহাপুরুষ মহারাজকে মনের ইচ্ছা জানিয়ে চিঠি লিখলাম—তিনি যদি দয়া করে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার দীক্ষা সম্বন্ধে একটু লিখে দেন, তবেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা পাওয়া সম্ভব।

আমার চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজ জবাব দিলেন : "শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতি উত্তম। তুমি যাইয়া তাঁহাকে বলিও, 'শিবানন্দ স্বামী (তারক মহারাজ) আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আমায় আপনার শ্রীচরণ সমীপে পাঠাইয়াছেন। বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করিতে তিনি আমায় পাঠাইয়াছিলেন, সেখান হইতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ও কৃপা লাভের জন্য আসিয়াছি। আপনি কৃপা করুন।'—এইকথা বলিলেই তিনি তোমায় দয়া করিবেন। তিনি দয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে যায় কাহাকেও বিমুখ করেন না। অতএব আমার স্বতন্ত্র পত্র দিবার প্রয়োজন নাই। এই পত্রখানি তাঁর শ্রীচরণ সমীপে পাঠ করিও, তাহা

হইলেই হইবে।" মহাপুরুষ মহারাজের চিঠিখানি পেয়ে খুবই আনন্দ হলো—আনন্দে ও আশায় অন্তর ভরে উঠল। কিন্তু যে-কাজে এসেছি তার ক্ষতি করে তো যাওয়া যায় না। মাতৃদর্শনের সুযোগের জন্য তাই প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ঐ চিঠিতেই মহাপুরুষ মহারাজ দুখানি গামছা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। স্থানীয় হাট থেকে কিনে রেজিস্ট্রি ডাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। গামছা দুখানি পেয়ে মহাপুরুষ মহারাজ লিখলেন : "তোমার প্রেরিত গামছা দুইখানি আজ পাইলাম। শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ বড় ভাগ্যে ঘটে। তুমি যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া বলিবে, 'মা, আমাকে কৃপা করুন।' তারপর তিনি দয়া করিয়া যাহা বলিবেন, তাহাই শিরোধার্য করিবে। যদি তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে মন্ত্র দান করেন, জানিবে তুমি ভাগ্যবান। তিনি আমাদের সকলের মা। তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র পাইলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে। ইহাতে আমারও পরম আনন্দ হইবে, জানিবে। তিনি প্রভুরই নাম তোমায় দিবেন—সকলকেই তিনি তাহাই দেন।"

তাঁর চিঠিখানি পেয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য মন খুবই ব্যাকুল হলো। শ্রীভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করতে লাগলাম, সুযোগও হয়ে গেল। কয়েকদিনের ছুটি পেয়ে যাত্রা করলাম মায়ের দর্শনে।

হেঁটে বাঁকুড়া আশ্রমে—ওখান থেকে ট্রেনে গড়বেতা। স্থানীয় আশ্রমে একরাত্রি কাটিয়ে ভাদ্রের প্রথম দিকে এক ভোরে রওনা হলাম পুণ্যপীঠ জয়রামবাটীর দিকে। খালি পা, জলকাদা ও পিচ্ছিল পথ, হালকা এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় যখন জয়রামবাটী গ্রামের উপকণ্ঠে এলাম তখন বুকের ভেতর যেন ঢেঁকির পাড়-পড়ার মতো শব্দ হতে লাগল। পথের দুধারেই ছোট ছোট মেটে ঘরগুলি অতিক্রম করে উপনীত হলাম মায়ের বাড়ির দরজায়। যদিও আমি কোন চিঠিপত্র দিইনি, তবু মা যেন জানতে পেরেছিলেন। সেবক-মহারাজদের পরিচয় দিয়ে মাকে দর্শন করার প্রার্থনা জানাতেই তাঁরা আমায় বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীমা তখন ভেতরের দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রণাম করে মাথা তুলতেই মা আবেগভরে বললেন ঃ "আহা ! বাছার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে—সারাদিন খাওয়া হয়নি। ওকে কিছু খেতে দাও।" আমি পকেট থেকে মহাপুরুষ মহারাজের লেখা চিঠিখানি বের করে পড়তে যাচ্ছি, তখন মা বললেন ঃ "চিঠি পরে শুনব। এখন বাবা, হাত-মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নাও।"

হাত-মুখ ধোয়ার পর সেবক-মহারাজ আমায় পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। আসন পাতা, গ্লাসে জল, একথালা মুড়ি ও তালক্ষীর। আমি মাথা নিচু করে মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে সব খেয়ে ফেললাম। সে কী অমৃত ! মুড়ি-তালক্ষীর তো কত খেয়েছি জীবনে, কিন্তু এমন মধুর তো কখনো লাগেনি !

জয়রামবাটীতে মাকে দেখলাম ঠিক মায়ের মতোই—মলিন বস্ত্রে দাঁড়িয়েছিলেন, আমার আগমন-প্রতীক্ষায়, কত স্নেহ ও করুণা মূর্তিতে ! প্রায় দশমাস পূর্বে বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ীতে' মাকে যখন দর্শন করি, তখন তাঁকে এত কাছের মনে হয়নি।

একটু পরেই আমি পুনরায় মায়ের কাছে গেলাম। তিনি পা ছড়িয়ে বসেছিলেন তাঁর মাটির ঘরটির বারান্দায় এবং কুটনো কুটছিলেন। মাকে প্রণাম করে পাশে বসে মহাপুরুষ মহারাজের চিঠিখানি পড়ে শোনালাম। তিনি 'তারকের' (মহাপুরুষ মহারাজের) খবর জিজ্ঞেস করলেন, সস্নেহে দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যের সব খবর নিলেন। পরে দীক্ষা সম্বন্ধে বললেন ঃ "তা বাবা, কাল বেশ ভাল দিন (বোধহয় জন্মাষ্টমী ছিল), কালই তোমায় মন্ত্র দেব। সকালে কিছু খেও না, স্নান করে অপেক্ষা করো। আমি সময়মতো ডেকে নেব।" তারপর পাশের ঘরে (তাঁর ঠাকুরঘরে) প্রণাম করতে বললেন।

আমি শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ওষুধ নিয়ে গিয়েছিলাম—বাঁকুড়ার ডাক্তার-স্বামী বৈকুণ্ঠ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের 'আমবাতের' জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ পাঠিয়েছিলেন আমার হাতে। মাকে তা দিতেই তিনি করুণস্বরে বললেন ঃ "বৈকুণ্ঠ ওষুধ পাঠিয়েছে ? দাও বাবা,

দাও। বৈকুণ্ঠের ওষুধে অসুখ সেরে যায়। দেখ, সারা গায়ে কি হয়েছে—আমবাতের যন্ত্রণায় মরে গেলুম।" এই বলতে বলতে গায়ের কাপড় সরিয়ে সারা বুকে-পিঠে আমবাত দেখাতে লাগলেন। মায়ের কষ্ট দেখে চোখে জল এল।

মা ওষুধটি নিয়ে একপাশে রেখে দিলেন এবং খুব আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ মহারাজ প্রভৃতির সব খবর জিজ্ঞেস করলেন। আরও কত কথা!

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—ঘরে ঘরে দীপ জ্বালা হলো। মায়ের ঠাকুরঘরেও আলো, ধূপ-ধুনো দেওয়া হলো। আমি বহির্বাটীতে চলে এলাম।

ঐদিন জয়রামবাটীতে অন্য কোন ভক্ত উপস্থিত ছিল না। রাত্রে মা একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমার খাওয়া দেখছিলেন। আমার সারাদিন খাওয়া হয়নি বলে কত যত্ন করে আমাকে খাওয়ালেন। শুভ প্রভাতের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে এক প্রকার বিনিদ্র অবস্থায় রাতটি কেটে গেল। সকালে পুকুরে স্নান করে বসে আছি মায়ের ডাকের প্রতীক্ষায়। দীক্ষার জন্য কি প্রস্তুতির প্রয়োজন—তা জানিও না, জিজ্ঞেসও করিনি, টাকাকড়িও কিছু ছিল না। আন্দাজ আটটায় সেবক-মহারাজ আমায় ডেকে শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুরঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। মা পূজার আসনে বসে পূজা করছিলেন—পাশে আর একখানি আসন। মা আমায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে ঐ আসনে বসতে বললেন। বসতেই আমার হাতে একটু গঙ্গাজল দিলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। মায়ের স্পর্শে রোমাঞ্চ হতে লাগল, এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল অন্তর। মা খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: "ঠাকুরকে তোমার ভাল লাগে?"

আমি সম্মতি জানাতেই তিনবার একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে পরে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে তা উচ্চারণ করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ পাশের দেওয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন ঃ "এই, এই তোমার ইষ্ট।" সঙ্গে সঙ্গে ওদিকটা চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তাতে ভেসে উঠল একটি দেবীমূর্তি—জীবন্ত ও জ্যোতির্ময়ী—আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে আছেন। চকিতে কি যেন হয়ে গেল ! আমি আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হয়ে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। মায়ের মূর্তিও তখন অন্য রকম। একটু পরেই মা সস্নেহে বললেন ঃ "বাবা, ভয় হয়েছিল কি ?" আমি চুপ করে রইলাম মাথা নিচু করে—জবাব দেবার শক্তি ছিল না। তারপর মা আমার ডানহাতটি ধরে প্রত্যেকটি 'কর' স্পর্শ করে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন ! মা কথা বলছিলেন; কিন্তু আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। মা বার বার 'কর' স্পর্শ করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জপ-করা দেখাতে লাগলেন, আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন। তা-ই করলাম। তারপর মা ঠাকুরের পটমূর্তি দেখিয়ে বললেন ঃ "ঠাকুরকে প্রণাম কর, ইনিই তোমার ইষ্ট, ইনিই গুরু—তোমার ইহকাল পরকাল সর্বস্ব। ঠাকুরই সর্বদেবদেবীস্বরূপ।" আমি ঠাকুরকে প্রণাম করে মাকেও প্রণাম করলাম। তারপর তিনি কত জপ করতে হবে তা বললেন এবং ধ্যান সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। মা যে কি বা কে তা তখন বুঝতে পারিনি, এখনো কিছুই বুঝি না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল—তিনি ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিতে পারেন।

মায়ের পূজার আসনের পাশেই দুটি ফল ছিল, তা হাতে নিয়ে তিনি বললেন ঃ "ফলগুলি আমার হাতে দাও।" আমি তা-ই করলাম। ঐ বোধহয় গুরুদক্ষিণা। আমি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাইনি—টাকাকড়ি বা ফলফুল কিছুই না। আমার সারা শরীর কাঁপছিল।

মাকে পুনরায় প্রণাম করলাম। তাঁকে এত কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছিল, খুব ভাল লাগছিল। মা সস্নেহে বললেন ঃ "এখন ঘরে গিয়ে বসে যেমনটি দেখিয়ে দিলুম তেমনিভাবে একটু জপ কর। তারপর জল খাবে।"

★

বিকেলে আবার মায়ের কাছে গিয়েছি—তিনি বারান্দায় মাটির রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসে কুটনো কুটছিলেন। বাঁকুড়ার বৈকুণ্ঠ মহারাজের ওষুধে উপকার হয়েছে, আমবাত একটু কমেছে বললেন। একথা-সেকথার পর দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য কিভাবে করা হয় তা জিজ্ঞেস করলেন। কথাবার্তায় বোঝা গেল তাঁর প্রাণ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য খুবই কাতর হয়েছে। কিভাবে ঘরে ঘরে গিয়ে গরিবদের টিকিট দিয়ে আসি, কিভাবে তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের খোঁজ নিই, টিকিট নিয়ে তারা কিভাবে চাল নিয়ে যায়, মেয়েদের কিছু কিছু কাপড়ও দেওয়া হয়—এসব প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বললাম যা মায়ের অন্তর খুব স্পর্শ করেছিল। বললাম যে, একদিন সকালের দিকে এক গ্রামে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা গেল যারা চাল নিচ্ছিল, তারা কেউ বাড়িতে নেই। বুঝলাম কোথাও কাজ করতে গিয়েছে। কাজ পেলে আর চাল দেওয়া হয় না, তাই তাদের খোঁজ করতে বের হলাম। গ্রামের বাইরে একটি ধানখেতে হাঁটুসমান জলকাদার মধ্যে অনেকে ধান-রোপা করছে দেখা গেল। সেদিকে এগিয়ে যেতেই দূর থেকে দেখলাম একটি মেয়ে-মুনিষ খেত থেকে উঠে গিয়ে একধারে রোপা করার জন্য যে ধানের চারার বোঝা রয়েছে তার পেছনে আত্মগোপন করল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল—গতরাত্রে ঐ স্ত্রীলোকটির একটি সন্তান হয়েছে, তাকে নিয়েই সে খেতে কাজ করতে এসেছে। সদ্যঃপ্রসূত সন্তানটিকে নেকড়া জড়িয়ে খেতের ধারে রেখে সে খেতে ধান-রোপা করছে পেটের দায়ে। খেতে কাজ করছে তা ধরা পড়লে আমাদের কাছে চাল পাবে না, তাই আমাকে দূর থেকে দেখেই লুকোবার চেষ্টা করছিল। ঘটনাটি শুনে মনের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হলো, কী অবস্থায় পড়লে পূর্বরাত্রে সদ্যঃপ্রসূত সন্তানটিকে নিয়ে প্রসূতি মাঠে কাজ করতে আসতে পারে! দারুণ আঘাত পেলাম প্রাণে। আমি শুধু ঐ কামিন-এর কাছে গিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললাম: "না মা, তোমার চাল কাটব না।" তাতেই সে একটু সাহস করে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে

বলল : "বাবু, বড্ড কষ্টে পড়েছি। তাই খেতে কাজ করতে এসেছি।" খেতে কাজ করলে দু-সের ধান পাবে একদিনে।

শ্রীশ্রীমা ঐ ঘটনাটি শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন : "বল কি গো! অমন পোয়াতী মাঠে কাজ করতে এসেছে। অমন অবস্থায় চাল কাটতে আছে! বেশ করেছ বাবা। ঠাকুর তোমার কল্যাণ করবেন।" তারপর ঠাকুরের কাছে যেন অভিমান করে মা প্রার্থনা করলেন : "ঠাকুর! তুমি এসব দেখতে পাচ্ছ না?—লোকের এত দুঃখ-দুর্দশা! এভাবে মানুষ কি করে! এর একটা বিধান কর।" মায়ের কণ্ঠে কাতর উৎকণ্ঠা—এখনো যেন তা কানে ঝঙ্কৃত হচ্ছে। মা মূর্তিমতী করুণা—আবেগময়ী প্রার্থনা।

তিনি সেবাকার্যের খুঁটিনাটি সব খবর জিজ্ঞেস করছিলেন—আমরা কি খাই, কেমনভাবে থাকি, কি কি কাজ করতে হয়। আমি বললাম : "একদিন গ্রামান্তরে কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছি। একটি শুকনো পাহাড়ে ছোট নদী—কুড়ি-পঁচিশ হাত চওড়া, হাঁটুজল—হেঁটে পেরিয়ে গেলাম। এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়েছিল। ফিরবার সময় দেখি যে, ঐ শুকনো নদী লাল জলে কানায় কানায় পূর্ণ ও ভীষণরূপে খরস্রোতা হয়েছে। বেলাও হয়েছিল অনেক। নদী পার হওয়ার উপায়ান্তর না দেখে গায়ের জামাকাপড় খুলে মাথায় জড়িয়ে, একহাতে ছাতাটি ধরে, কৌপীনপরা অবস্থায় নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং এক হাতে সাঁতার কাটতে কাটতে স্রোতে ভেসে কোন প্রকারে পরপারে এলাম। অনেকটা দূর পর্যন্ত আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। নদীর ধারে কাঁটাঝোপের দরুন প্রাণসংশয় হয়েছিল।" ঐ ঘটনাটি শুনতে শুনতে মায়ের মুখখানা বেদনায় মলিন হয়ে গেল। তিনি করুণস্বরে বললেন : "বাবা, ঠাকুর তোমায় রক্ষা করেছিলেন। ঐ কাঁটাঝোপের মধ্যে ঢুকে গেলে আর তো বেরুতে পারতে না! অমনটি আর কখনো করো না বাবা।" আমার সব দুঃখ-বেদনা মা অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাঁর মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সন্তানের দুঃখে। এখনো বিপদে-আপদে মায়ের ঐ সাবধানবাণী প্রাণে বল দেয়।

কথায় কথায় পরদিন কামারপুকুর-দর্শনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মা তাতে অনুমতি দিলেন না। বললেন : "না বাবা, এখন কামারপুকুরে গিয়ে কাজ নেই, পরে কখনো যেও। এখানে কোন রকমে 'তেরাত্র' কাটিয়ে যাও। এ ঘোর ম্যালেরিয়ার সময়—ঘরে ঘরে জ্বর। এসময় কাউকে এখানে আসতে বলি না। তা তারক তোমায় পাঠিয়েছে।"

মায়ের নির্দেশ মেনে নিলাম। এবং অনেক পরে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে কামারপুকুর দর্শন করি, জয়রামবাটীতেও আসি। মা যে-ঘরটিতে থাকতেন, যেখানে বসতেন, যে ঠাকুরঘরে দীক্ষা দিয়েছিলেন—সেসব স্থান দর্শন ও প্রণাম করি।

আমার সঙ্গে মাত্র একটি টাকা ছিল, গুরুদক্ষিণাও দিতে পারিনি, গুরুসেবার কোন সুযোগ পাইনি—সেজন্য মনের ভেতর খুবই অশান্তি। পরের দিন যখন শুনলাম যে, মায়ের সেবক বরদা মহারাজ যাচ্ছেন কোতুলপুরের হাটে, আমিও মাকে প্রণাম করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হাটে গেলাম। মেঠো রাস্তা—জলকাদা—ছয় মাইল পথ অতিক্রম করে যেতে হয়। বরদা মহারাজ ঐ হাটে একঝুড়ি আনাজপত্র ও অন্যান্য জিনিস কিনলেন। আমি একথালা মিছরি কিনলাম মায়ের জন্য এবং দুপুরে কোয়ালপাড়া আশ্রমে খাওয়া-দাওয়া করে বিকেলে ঐ ঝুড়িটি মাথায় করে জয়রামবাটীতে ফিরে এলাম। ঐ ঝুড়িতে মায়ের ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র ছিল—তা বয়ে আনাও তো মায়েরই সেবা। জয়রামবাটীতে পৌঁছে আমি যে একথালা মিছরি এনেছিলাম, মাকে দিতেই তিনি দুহাত বাড়িয়ে তা নিলেন এবং খুশি হয়ে বললেন : "বেশ করেছ বাবা! আমি রোজ একটু একটু মিছরি পানা করে খাব।" আমার চোখে জল এল। মাত্র পাঁচ আনার মিছরি—তা মা এমন আদর করে গ্রহণ করলেন! মায়ের কোন সেবাই তো করতে পারিনি।

তাই সন্ধ্যার পূর্বে যখন দেখলাম যে, পুণ্যপুকুরের ধারে বেগুনচারা লাগাবেন বলে সেবক হরিপ্রেম মহারাজ বাগানে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর হাত থেকে কোদালটি নিয়ে ঐ জমি তৈরি করে তাঁর সঙ্গে বেগুনের চারা লাগালাম। ঐ গাছে বেগুন হবে—মায়ের সেবাতে লাগবে।

এইভাবে 'তেরাত্র' কেটে গেল। চতুর্থ দিন বিকেলের দিকে মাকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলাম। আমি প্রণাম করতেই তিনি চিবুক ধরে চুমু খেলেন। আমি বালকবুদ্ধিতে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে হাতজোড় করে কাঁদতে কাঁদতে বললাম ঃ "মা, আপনি আমায় মনে রাখবেন।" তিনিও করুণাভরে বললেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, তোমাকে মনে রাখব।" আমি ঐভাবে তিনবার প্রার্থনা জানালাম, তিনিও প্রত্যেকবারই বললেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, মনে রাখব।" তিনি আমায় মনে রাখবেন—এই ভেবে আমার অন্তর আনন্দে ভরে গেল, আর বাক্যস্ফূর্তি হলো না। পুনরায় মাকে প্রণাম করে তাঁর দিকে মুখ করে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে সদর দরজা পর্যন্ত এলাম—মা ততক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শেষবার মাকে দেখে দরজার বাইরে এলাম এবং মায়ের করুণ মুখখানি ও তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় তিন মাইল অতিক্রম করে এলাম কোয়ালপাড়া আশ্রমে। আমি মায়ের কাছে ভক্তি-মুক্তি প্রার্থনা করিনি—মনেও আসেনি।

মাকে পেলেই তো সব পাওয়া হলো—তাঁর করুণা থাকলেই তো সবকিছু হলো। আমি মাকে ভুলে যেতে পারি সংসারের পেষণে দলিত হয়ে, ধূলি-কাদায় মলিনদৃষ্টি হয়ে, কিন্তু মা যদি আমায় স্মরণে রাখেন তাহলেই তো সুপথে চলতে পারব। মা যদি স্মরণ করে কোলে তুলে নেন—কোলে কোলে রাখেন, সংসারের মৃত্তিকা গায়ে মাখতে না দেন, তবেই তো আমি হব নির্মল সুন্দর। এই ভেবে মায়ের কাছে শুধু একটি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম ঃ "মা, আপনি আমায় মনে রাখবেন।" তিনবার এই প্রার্থনা জানাই, তিনবারই তিনি অভয় দিয়ে বলেছিলেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, তোমাকে মনে রাখব।" পরে সেবক বরদা

মহারাজের মুখে শুনেছিলাম—আমি চলে আসার পর মা তাঁকে ডেকে বলেছিলেন ঃ "দেখ গো, ছেলেটি তিন সত্যি করিয়ে নিলে !" মায়ের মুখ থেকে যা-কিছু বেরুবে তা-ই সত্যি। তিনি ত্রিসত্য করে বলেছিলেন—আমায় ভুলবেন না। এই আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি, পরম আশীর্বাদ, পরম অভয়, বল, ভরসা ও সান্ত্বনা।

কোয়ালপাড়া আশ্রমে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে অল্প অল্প বৃষ্টির মধ্যে রওনা হলাম কোতুলপুর হয়ে বিষ্ণুপুর। চব্বিশ মাইল জলকাদায় হেঁটে, ছাতা ছিল না—জোর বৃষ্টির মধ্যে গাছের আড়ালে আশ্রয় নিতে নিতে সন্ধ্যার পূর্বে যখন বিষ্ণুপুর পৌঁছালাম, তখন আমি আধমরা।

সেবাকেন্দ্রে নিরাপদে পৌঁছে সে-খবর দিয়ে শ্রীশ্রীমাকে যে-চিঠি লিখেছিলাম, তাতে কোয়ালপাড়া থেকে বিষ্ণুপুর, এই চব্বিশ মাইল বৃষ্টি ও জলকাদায় পথের কষ্টের কথাও লিখেছিলাম। শ্রীশ্রীমা ঐ চিঠি পেয়ে আমার জন্য খুবই চিন্তিত হয়েছিলেন। সেবক বরদা মহারাজ আমায় লিখলেন—অমন করে পথের কষ্টের কথা মাকে লিখতে আছে ? তিনি খুবই অধীর হয়েছেন—ইত্যাদি। জবাবে ভাল আছি জানিয়ে দিলাম। ঐভাবে চিঠি লিখে মাকে চিন্তিত করার জন্য আমার কিন্তু মনে দুঃখ হয়নি, বরং আনন্দ হয়েছিল এই মনে করে যে, মা আমার জন্য ভেবেছেন এবং তাঁর আশীর্বাদেই আমি ঐ ম্যালেরিয়ার সময়েও সুস্থ ছিলাম। ছেলের জন্য মা ভাববেন না তো কে ভাববে ?

১৯২০ খ্রীস্টাব্দ। মহাপুরুষ মহারাজের চিঠিতে জানলাম শ্রীশ্রীমা গুরুতর অসুস্থ। এই সংবাদ পেয়ে অবধি মাকে দেখবার জন্য মনটা ছটফট করতে লাগল। মঠে ফিরবার অনুমতি প্রার্থনা করে মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি লিখলাম। তিনি জবাবে অনুমতি দিয়ে ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে জানালেন যে, আরও কিছুদিন ওখানে থাকলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হতো। কিন্তু শ্রীশ্রীমাকে দেখবার খুব ইচ্ছা যখন হয়েছে তখন মঠে ফিরে আসতে পার।

কিছুদিন পরেই মঠে ফিরে এসে তার পরদিনই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে 'মায়ের বাড়ীতে' গেলাম। কিন্তু মায়ের শরীর খুব খারাপ বলে দর্শনাদি সব বন্ধ ছিল। তবু মঠ থেকে গিয়েছি বলে পূজনীয় শরৎ মহারাজের বিশেষ অনুমতিক্রমে শুধু দূর থেকে দর্শন ও প্রণাম করে মায়ের শারীরিক অবস্থার খবর সব জেনে অগত্যা মঠে ফিরে এলাম। মায়ের চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করা হলো না—মায়ের সঙ্গে দুটি কথাও বলতে পারলাম না—খুবই কষ্ট হলো মনে! তখন জয়রামবাটীতে মাকে যে দেখেছিলাম, তাঁর কাছে বসে কথাবার্তা বলেছিলাম, তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করেছিলাম—সেসব কথা খুব মনে পড়তে লাগল।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর খারাপ বলে মহাপুরুষ মহারাজ রোজ মঠ থেকে একজনকে মায়ের খবর জানবার জন্য উদ্বোধনে পাঠাতেন। মঠে টেলিফোন বা বৈদ্যুতিক আলো তখনো হয়নি। আমি 'মায়ের বাড়ী' থেকে ফিরে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি মায়ের খবর জিজ্ঞেস করলেন। মায়ের হাতে-পায়ে শোথ দেখা দিয়েছিল, দুটি পা-ই ফুলে গিয়েছিল এবং খুব অরুচি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলেছিলেন যে, কবিরাজ 'শ্বেতপুনর্নবা' শাক পথ্য দিয়েছেন আর অরুচির জন্য 'আমরুল শাক' চাটনির মতো করে খেতে বলেছেন। তা শুনেই মহাপুরুষ মহারাজ বললেন ঃ "মঠের বাগানে তো প্রচুর পুনর্নবা হয়েছে, আমরুল শাকও খুব আছে। তুমি রোজ সকালে মায়ের জন্য কিছু পুনর্নবা ও আমরুল শাক নিয়ে যেও এবং মায়ের খবরও নিয়ে এস।" তাঁর কথামতো প্রতিদিন ভোরবেলায় কিছু ভাল পুনর্নবা ও আমরুল শাক কলাপাতায় বেঁধে নিতাম। তারপর খেয়া-নৌকায় গঙ্গা পেরিয়ে কুঠিঘাট থেকে হেঁটে আটটার মধ্যেই উদ্বোধনে পৌঁছে ঐ শাক সেবক-মহারাজের হাতে দিতাম এবং দূর থেকে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে মায়ের খবর নিয়ে মঠে এসে মহাপুরুষ মহারাজকে দিতাম। মহাপুরুষ মহারাজ খুব ব্যগ্র হয়ে সব শুনতেন—মঠের আর সব সাধুরাও। এই সুযোগে প্রায় দেড়মাস রোজ মাকে দর্শন করার

সৌভাগ্য হয়েছিল। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঐ দেড়মাস মাকে দূর থেকে প্রণাম করার সময় রোজই দেখেছি যে, মা শীর্ণ শরীরে বারান্দার দরজার দিকে মুখ করে মেঝেতে শুয়ে আছেন এবং আমি যখন প্রণাম করতাম তিনি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে সস্নেহে আমাকে দেখতেন। আহা! সে চাহনিতে কত স্নেহ, মমতা ও করুণা! তিনি কথা বলেননি, কিন্তু দৃষ্টির ভেতর দিয়ে করুণা বর্ষণ করেছেন—স্নেহ-মমতার স্পর্শ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ঐ দৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে মিলন হতো—তিনি আমার অন্তর স্নেহস্নাত করতেন, এক অনির্বচনীয় দিব্যানন্দে হৃদয় ভরে যেত। প্রণাম করে হাঁটু গেড়ে করজোড়ে মৌনপ্রার্থনা জানিয়ে যখন চলে আসতাম, তখন শ্রীশ্রীমায়ের স্নিগ্ধ সজল চোখ দুটি থেকে যেন করুণা বর্ষিত হতো আর যতদূর থেকে দেখা যেত, দেখতাম মা অপলকনেত্রে আমাকেই দেখছেন।

ঐসময়ে একদিন 'মায়ের বাড়ী' থেকে ফিরে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি মায়ের কুশল-সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। আমি চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিষয় নিবেদন করে যখন বললাম যে, রাত্রে তাঁর এতটুকুও ঘুম হয়নি, সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা, ছটফট করেছেন—শুনতে শুনতে মহাপুরুষ মহারাজের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বললেন: "আহা! সকলের পাপ গ্রহণ করেই তো মায়ের এত অসুখ। তাইতো সর্বাঙ্গে তাঁর ঐ বিষের জ্বালা। তিনি শত শত সন্তানের পাপতাপ নিজের ভেতর আকর্ষণ করে নিয়ে সন্তানদের নিষ্পাপ করে দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা ও মায়ের কৃপা একই। ঠাকুর নরদেহ ত্যাগ করে এখন শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে বাস করছেন। যারা মায়ের কৃপা পেয়েছে তাদের এই শেষ জন্ম। মা, মা তুমি ভক্তদের জন্য কত কষ্টই না সহ্য করছ!

"একদিন ঠাকুর আমায় বলেছিলেন—'ঐ যে নহবতে আছে আর মন্দিরে ভবতারিণী—একই।' আমি তখন কি এত সব বুঝতাম! তিনি বলেছিলেন—শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। যে মাকে দর্শন

করেছে—সে মুক্ত হয়ে যাবে। মায়ের দর্শন কি কম ভাগ্যের কথা!" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমি তখন কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম : "মাকে রোজ তো দর্শন করছি, কিন্তু মায়ের মুখের একটি কথাও তো শুনতে পাই না। আমার কেবলই মনে হয়—আহা! মা যদি একটি কথাও বলতেন!"

মহাপুরুষ মহারাজ খুব আবেগভরা কণ্ঠে বললেন : "ঐ যে মা তোমার দিকে চেয়ে থাকেন, ঐ তো তাঁর আশীর্বাদ। তিনি কৃপাদৃষ্টিতে তোমায় দেখেছেন। তোমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। মায়ের কৃপা পেয়েছ—তোমার এ-জীবনের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। এখন তাঁর শরীর এত খারাপ, কি করে তোমার সঙ্গে কথা বলবেন? তিনি এত দুর্বল যে, কথা বলার শক্তিই তো নেই! তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর মুখের কথা শুনতে পাবে।" মহাপুরুষ মহারাজের সে শুভ-ইচ্ছা এক অলৌকিক উপায়ে আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছিল।

দেহত্যাগের রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা দিব্যদেহে জ্যোতির্ময়ীরূপে আমায় শেষ আশীর্বাদ করেছিলেন। ২০ জুলাই ১৯২০। রোজ যেমন ঘুমাই সেদিনও তেমনি ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত প্রায় দেড়টার সময় অদ্ভুতভাবে মায়ের দর্শন পাই। অসাধারণ সেই দর্শন। মাকে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে দেখতে পেলাম। তিনি সস্নেহে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমাকে মধুরস্বরে ডেকে বলছেন : "বাবা, আমি যাচ্ছি।" এই অদ্ভুত দর্শনের মর্ম কিছুই বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম, যখন মায়ের দেহরক্ষার মর্মন্তুদ সংবাদটি পেলাম। মা উদ্বোধনে মর্ততনু ত্যাগ করেছেন প্রায় সেই সময়—যখন আমি তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম! *

---

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শতরূপে সারদা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৯৮৫, পরিশিষ্ট।

করুণাময়ী

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ

শাস্ত্র বলছে ঃ "নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুম্ অর্হতি ।" 'নিরাকারা' আকার গ্রহণ করেন কেন ? "উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি ।" যাঁরা ভক্ত, মুমুক্ষু, তাঁদের মোক্ষদ্বার উন্মুক্ত করবার জন্য, জগৎকল্যাণের জন্য মাতৃরূপিণী পরাশক্তি এবারে পৃথিবীতে অবতীর্ণা। মহামায়া সারদা এবার বহুরূপে, শতরূপে কৃপা করেছেন কত অনুগতজনকে। শতরূপা সারদার শতরূপে প্রকাশ— "উপাসকানাং কার্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি ।"

আমার এই ক্ষুদ্র জীবন জ্যোতিঃস্বরূপিণী সারদার শতরূপের একটি রশ্মিতে কৃতার্থ। জীবন-সায়াহ্নে সেই ভাস্বর জ্যোতি উজ্জ্বলতম চিন্ময় সত্তারূপে আজও অম্লান। অব্যক্তা যিনি, অচিন্ত্যা যিনি, ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করার দুর্বল প্রয়াস আমার।

আমার তখন প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। কাটিহারে স্কুলে শিক্ষকতা করি, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ। একটি মেসে থেকে স্কুলে যাতায়াত করতাম। সেখানেই অঘোরবাবু বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। একদিন লক্ষ্য করলাম তাঁর নির্মীয়মাণ বাড়ি থেকে গেরুয়া কাপড় পরা একটি লোক আমাদের মেসে আসছেন। পর পর কয়েকদিন তাঁকে মেসে আসতে দেখে কৌতূহলী হয়ে জানলাম, তিনি বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী ; সম্প্রতি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কাটিহারে এসেছেন। অঘোরবাবুদের বাড়িতে পারিবারিক স্নানাগার ব্যবহারে অসুবিধে হওয়ায় আমাদের মেসে অঘোরবাবুর ব্যবস্থামতো স্নানাদি করতে নিত্য আসছেন। সাধু-সন্ন্যাসীর উপর আমার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারি তাঁর নাম স্বামী জ্ঞানানন্দ, জ্ঞান মহারাজ বলেই পরিচিত। তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর সেবা করেছেন অনেকদিন। তাঁর কাছে শুনলাম শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অনেক অন্তরঙ্গ কথা। মায়ের স্নেহকরুণা কতভাবে ভক্তজনের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। সেইসব কথা শুনতে শুনতে আমারও ইচ্ছে হলো একবার মাকে দেখতে। জ্ঞান মহারাজকে সেকথা বলতে তিনি উৎসাহিত হয়ে সামনের পূজার ছুটিতেই জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করবার কথা বললেন।

জ্ঞান মহারাজ নিজে সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন জয়রামবাটীতে, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের পূজার ছুটির সময়। মা তখন তাঁর নতুন বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই বাড়ির বাইরের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। মনের মধ্যে অনেক কল্পনার ছবি এঁকে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম। জ্ঞান মহারাজ বাড়ির ভিতরে গিয়ে খবর দিয়ে আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। রামময় মহারাজ তখন মায়ের সেবক হিসাবে সেখানেই ছিলেন। ছোটখাট মানুষটি, আমার খুবই ভাল লেগেছিল। তিনিই আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মা তখন তাঁর ঘরে চৌকিতে বসেছিলেন পা ঝুলিয়ে। আমি মাকে প্রণাম করলাম। মায়ের হাত-পায়ের গড়ন ও মুখের চেহারা দেখে আমার নিজের ঠাকুরমার কথা মনে হয়েছিল। তাঁর মধ্যে তখন কোন দেবীভাব আমি বুঝতে পারিনি। তাঁর হাত-পায়ের গড়ন বেশ কর্মঠ, শক্ত বলে মনে হলো। তিনি নিজে ধরা না দিলে, নিজের স্বরূপ নিজে না প্রকাশ করলে তাঁকে বোঝে কার সাধ্য ? 'মায়য়া বহুরূপিণী'। নিজের স্বরূপ মায়ায় আবৃত করে রেখেছেন। আর আমার দৃষ্টি ও বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করেছেন। তখনো সময় হয়নি বোধহয় আমার !

শুনলাম মায়ের শরীর অসুস্থ। জ্ঞান মহারাজের ইচ্ছা ছিল সেইবারই মায়ের কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিই। কিন্তু মা বললেন ঃ "বাবা, এখন শরীরটা ঠিক নেই, পরে হবে।" আমার মনও হয়তো দীক্ষার জন্য ঠিক তৈরি হয়নি তাই ছলনাময়ী মা অসুস্থতার ছল করে

আমাকে তখন গ্রহণ করলেন না। সেবার কয়েকদিন ছিলাম। মাকে ঘরোয়া পরিবেশে, সংসারের নানা কাজেকর্মে দূর থেকে অনেকবার দেখলাম। কিন্তু মনে সত্যি কোন উচ্চ ভাবের অনুভূতি টের পেলাম না। তবু মা যে স্নেহময়ী, করুণাময়ী, নিকটতম কোন আত্মীয়ার মতো —এই বোধটুকু হয়েছিল। বিদায় নেওয়ার সময় যখন প্রণাম করে চলে আসছি তখন মা নিজেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটি কথা বললেন। আমার আগে যাঁরা প্রণাম করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফুল, বেলপাতা ইত্যাদির সঙ্গে একটা পাতা-সমেত আমলকীর ডালও দিয়েছিলেন। মা তখন পূজার আসনেই বসেছিলেন। প্রণাম করার পরেই মা হঠাৎ সেই আমলকীর পাতাগুলি তুলে আমাকে দেখিয়ে বললেন : "জান বাবা, এই আমলকী পাতা বেলপাতার মতোই শিবের খুব প্রিয়।" কেন বললেন তা জানি না—কিন্তু এই বিধান আজও মনে আছে। ফিরে এলাম কর্মস্থলে। কিন্তু মন মাঝে মাঝে জয়রামবাটী ছুটে যেত।

জ্ঞান মহারাজ কিন্তু আশা ছেড়ে দেননি। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সেই বছরই বড়দিনের ছুটিতে আবার জয়রামবাটী গেলাম। এবারও নতুন বাড়ির বাইরের ঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। রামময় মহারাজই আবার আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মাকে প্রণাম করার পরেই এবার কিন্তু তিনি এমন একটা মনের ভাব প্রকাশ করলেন, যেন আগের বারে তাঁর অসুস্থতার জন্য দীক্ষা হলো না, এবার তা হয়ে গেলেই ভাল। অপ্রত্যাশিত মায়ের ইচ্ছা আমার মনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করল। আমি সানন্দে আমার বাসনা মাকে নিবেদন করতে, পরদিনই তিনি দীক্ষার দিন স্থির করলেন। পরের দিন সকালে পুণ্যপুকুরে স্নান করে অনাস্বাদিতপূর্ব বিচিত্র এক অনুভূতি হৃদয়ে নিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলাম। দীক্ষার জন্য আমার কোন প্রস্তুতি ছিল না। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যাইনি। অকিঞ্চন আমাকে মা তাঁর ঘরে, তাঁর পাশে বসিয়ে মহামন্ত্র দান করলেন। দীক্ষার পরে আমাকে দিয়ে তিনবার জপ করিয়েও নিলেন। ঠিক সেই

সময় আমার চোখের সামনে থেকে একটা অদ্ভুত পর্দা সরে গেল ! "মোক্ষদ্বার-কপাট-পাটনকরী" করুণাময়ী মা কি করলেন জানি না ! কিন্তু আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই আমার ইষ্টমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাঁর মধ্যে দেখলাম। তিনবার দেখলাম। আমাকে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মা বলে উঠলেন ঃ "কি দেখছ বাবা ? যা দেখছ, ঠিকই দেখছ।" কৃপাসুমুখী মা আমার চোখের আবরণ সরিয়ে দিয়ে নিজের স্বরূপটি মেলে ধরলেন। অনন্তরূপা সারদার বরাভয়া মূর্তি আমার সামনে প্রকাশিত হলো। সর্বাঙ্গ শিহরিত, বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ আমাকে মা বললেন ঃ "বাবা, দক্ষিণা দাও।" আমার সঙ্গে তো কিছুই ছিল না। তখন মা-ই দেখিয়ে দিলেন ঘরের কোণে কয়েকটি ফল রয়েছে। তার থেকেই একটি তুলে এনে তাঁকে দিতে বললেন। যন্ত্রচালিতবৎ সেই ফল তাঁকে নিবেদন করলাম। এ-জীবন কৃতার্থ হলো ! এই মনুষ্যজন্ম সার্থক হলো ! প্রণাম করে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম ঃ এ কি হলো ?

সেদিন দুপুরে সব ভক্তদের সঙ্গে মায়ের ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেতে বসেছি। আমি নবাগত, একটু লাজুক স্বভাবের, তাই পঙ্‌ক্তির একেবারে শেষেই বসেছি। পরিবেশন শুরু হতেই দেখলাম, মা এসে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। একটা হাত চৌকাঠের উপর। কত স্নেহভরে তিনি তাকিয়ে আছেন, সকলকে খাওয়াচ্ছেন। দীক্ষার সময়ের মতো এখনো মাকে সেই বরাভয়া মূর্তিতেই আবার দেখলাম। আমি মাথা নিচু করেই খাচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন এসে আমাকে একবাটি পায়েস দিয়ে বললেন ঃ "মা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" মুখ তুলে দেখি, মা মৃদুস্বরে বলছেন ঃ "খাও বাবা, সবটুকু খাও।" তখন আমার খাওয়ার মতো অবস্থা নয়। মায়ের ঐ অপার্থিব স্নেহ, অযাচিত করুণায় আমার চোখ ঠেলে জল আসছিল। আবেগ, উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ, আর সকলের মাঝে আমার এই বিশেষ ব্যবস্থায় আমি সঙ্কুচিত। ধীরে ধীরে প্রসাদ সবটুকু নিঃশেষ করলাম।

জীবনের সেই স্মরণীয় দিনের অবিস্মরণীয় ঘটনাটি আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আজও উজ্জ্বল।

সেবার জয়রামবাটীতে আরও কয়েকদিন ছিলাম। মায়ের গৃহস্থ-ভক্ত বিভূতিবাবু ও সেবক রামময় মহারাজের কাছে জপধ্যান সংক্রান্ত সবকিছুই জেনে নিয়েছিলাম। সেজন্য মায়ের কাছে আর ওসব বিষয়ে কিছু জানা হয়নি। শুধু যে-কদিন ছিলাম দুবেলাই মাকে কখনো তাঁর ঘরে, কখনো বারান্দায় প্রণাম করতে যেতাম। জয়রামবাটী থাকাকালীন মাকে খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবেই দেখি। দেখি তাঁর মানবিক ভাবটাই। করুণামিশ্রিত তাঁর জননীভাবই জয়রামবাটীতে প্রকট ছিল। তাঁর নিজের পরিবেশ-পরিজনই বোধহয় এর কারণ। চলে আসার দিন তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি মাথায় হাত দিয়ে মৃদুস্বরে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন ঃ "ভাল থাক বাবা।" সেই স্বর এখনো কানে বাজে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম থেকেই মায়ের শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ে। মার্চ মাসে মাকে উদ্বোধনে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। সেই সময় আমি কলকাতা থেকে জ্ঞান মহারাজের লেখা একটি চিঠি পাই। তাতে জানতে পারি মায়ের শরীর খুব অসুস্থ। দর্শন করতে হলে আর দেরি না করাই ভাল। এই চিঠি পাবার পরই জুলাই মাসের প্রথম দিকে আমি কলকাতায় শ্যামবাজারের একটি বাড়িতে এসে উঠি এবং যথাসময়ে উদ্বোধনে মাকে দর্শন করতে যাই। তখন মায়ের শরীর খুবই অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তাঁকে শুধু দর্শন ও প্রণাম মাত্রই হয়। উদ্বোধনে মা যেন অন্য ভাবে থাকতেন। তাঁকে দর্শন করতে সময় ধরে ভক্ত-শ্রেণীর সঙ্গে যেতে হতো। এখানে যেন মায়ের জয়রামবাটীর সেই সহজ, স্বচ্ছন্দ রূপটি দেবীত্বের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকত। এবারে তাঁর সঙ্গে কোন কথা বলেছি বলে মনে পড়ে না।

মাকে আমার শেষ দর্শন তাঁর স্থূল শরীর পরিত্যাগের পরে। দেহত্যাগের খবর পেয়েই পরদিন সকালে ছুটে যাই মায়ের চরণে শেষ প্রণাম জানাতে। সেদিন সারাদিন, একেবারে পবিত্র হোমাগ্নিতে বেলুড় মঠে দিব্যশরীরের আহুতি পর্যন্ত কাছাকাছিই ছিলাম।

আমি একটু শুষ্ক-মনের মানুষ। ব্রহ্মশক্তি জগন্মাতৃরূপে এই শরীরকে অবলম্বন করে লীলা করছেন, সাধু-ভক্তদের মুখে শুনেছিলাম, বিশ্বাসও করেছিলাম। কিন্তু নিজের অনুভূতি তখনো তেমন কিছু হয়নি। শুধু মায়ের স্নেহ আর কি যেন এক অপার্থিব ভাবে পরিপূর্ণ মায়ের মুখখানি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই মুখ সচরাচর দেখা যায় না—এইটুকু মনে হতো। মায়ের জীবনীতে আছে, কাশীতে এক মেয়ে-ভক্ত মায়ের সামনেই গোলাপ-মাকে 'মা' মনে করায় তাঁর কাছে থেকে ধমক খেয়ে, সম্মুখে উপবিষ্টা মাকে দেখিয়ে বলতে শুনেছিল ঃ "দেখছ না ? এমন মুখ কি মানুষের হয় !" আমারও যতবারই মায়ের মুখখানি দেখবার অবকাশ হয়েছিল, শুধু মনে হয়েছিল ঃ এ মুখ কি মানুষের হয় !

মানুষের শরীরে মানুষের চালচলন নিয়ে যিনি আবির্ভূতা, তাঁর ভিতর অ-মানুষী, অ-পার্থিব ভাব দু-একবার ছাড়া বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলেও, তাঁর মুখের সেই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য যে তাঁর আন্তরসত্তার বহিঃপ্রকাশ—এটুকু বুঝতাম।

আজ জীবনের অন্ত্যলগ্নে জীবন-তরণী ভেসে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-পারাবারের অভিমুখে। এ-নৌকার হাল ধরে বসে আছেন যিনি, তাঁর মাথার ঘোমটা মাঝে মাঝে সরে গেলে আজও দেখতে পাই সেই মুখখানি। আর সেই ভরসায় নিশ্চিন্তে পড়ে আছি তাঁরই মুখ চেয়ে। *

শ্রুতিলিখন ঃ স্বামী অচ্যুতানন্দ

* কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ শতরূপে সারদা, পরিশিষ্ট।

মাকে যেমন দেখেছি

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি যখন আমি স্কুলে ক্লাস সেভেন-এ পড়ি। সেটা ইংরেজী ১৯১৫ সাল। সত্যি কথা বলতে কি একটু হতাশই হয়েছিলাম। আমার কল্পনায় মা বিরাজ করছিলেন এইভাবে—তিনি বসে আছেন একটি সুন্দর সাজানো সিংহাসনে, দুপাশে সেবিকারা চামর দোলাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম, তিনি থাকেন ছোট মাটির দেওয়াল-দেওয়া খড়ের চালওয়ালা ঘরে। আরও দেখলাম, তিনি নিজে হাতে ঝাঁটা নিয়ে উঠান পরিষ্কার করছেন। তখন খুবই ক্ষুব্ধচিত্তে যাঁদের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম সেই পূজনীয় জ্ঞান-দা (স্বামী জ্ঞানানন্দ) ও পূজনীয় গোপেশ-দাকে (স্বামী সারদেশানন্দ) গিয়ে বললাম : "এই সামান্য কাজটুকু করে মাকে সাহায্য করবার কি কেউ নেই?" তাঁরা উত্তর দিলেন : "যাতায়াত করতে থাক—সবই জানতে পারবি।" আমাদের দেখে মা বললেন : "বাবা, একটু দাঁড়াও। আমি এই কাজটুকু সেরে নিয়ে হাত ধুয়ে বসি, তখন আমাকে প্রণাম করবে।" আমরা অপেক্ষা করলাম। মা ঝাঁটা রেখে হাত ধুয়ে বিছানায় বসলেন। আমরা একে একে প্রণাম করলাম। প্রণাম করার সময় লক্ষ্য করলাম একটি মেয়ে মায়ের বিছানায় শুয়ে আছে। আমার ভাল লাগল না। সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম : "এই মেয়েটা কে? মায়ের বিছানায় শুয়েছে কেন? নিচে বিছানা পেতে শুতে পারে না?" পূজনীয় জ্ঞান-দা তাড়াতাড়ি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন : "চুপ কর, পরে বুঝবি সব।"—ঐ মেয়েটি মায়ের আদরের ভাইঝি রাধু।

ওঁরা দুজন প্রণাম করার পর আমি প্রণাম করতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন : "এই ছেলেটি কে?" তাঁরা উত্তর দিলেন : "ছেলেটি

বদনগঞ্জ স্কুলে পড়ে।" মা শুনে বললেন ঃ "প্রবোধের ছাত্র ?" আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নাম প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমি মনে মনে ভাবলাম, মা আমার হেডমাস্টার মশায়কে কি করে চিনলেন ! নিজের মনেই উত্তর পেলাম, তিনি এই দেশের মধ্যে বিদ্বান-বুদ্ধিমান লোক, তাই মা তাঁকে চেনেন। পরে জানলাম আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

মাকে দর্শন করার পর যখন বাড়ি ফিরব তখন মা সস্নেহে বললেন ঃ "বাবা, আবার এসো।" সেইদিন থেকে প্রতি শনিবার জয়রামবাটী আসবার জন্য এবং মাকে দর্শন করবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠত। প্রতি শনিবার স্কুলে যাবার সময় একখানা কাপড়, গামছা আর সোমবারের পড়ার বই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম এবং ছুটি হয়ে গেলেই চলে যেতাম জয়রামবাটী। কয়েকবার যেতেই আমি মায়ের খুব পরিচিত হয়ে গেলাম।

মায়ের লজ্জাশীলতা ছিল অসাধারণ। স্বামীজী, মহারাজ, শরৎ মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, প্রভৃতি সকলকেই মা 'ছেলে' বলতেন, কিন্তু তাঁদের সামনে ঘোমটা দিতেন আর ঘোমটার ভেতর থেকে আস্তে আস্তে কথা বলতেন। অনেক সময় যোগীন-মা বা গোলাপ-মা আবার সেটা জোরে বলে দিতেন। শরৎ মহারাজ মাকে প্রণাম করে বারান্দায় এসে অনুযোগের সুরে বলতেন ঃ "আমি যেন শ্বশুর !" বয়সের তুলনায় বেঁটে ছিলাম বলে আমাকে আরও ছোট মনে হতো। এই কারণে মা আমার সামনে আর ঘোমটা দিতেন না। এইজন্যই মাকে ভাল করে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এছাড়া মায়ের পায়ে বাত ছিল ; এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মায়ের পায়ে বাতের তেল মালিশ করে দেবার। এই মালিশ করবার সময় দেখেছি মায়ের পায়ের তলা অদ্ভুত রকম কোমল এবং হালকা গোলাপী রঙের, অথচ মা কামারপুকুর বা জয়রামবাটী থেকে দক্ষিণেশ্বরে এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুর-জয়রামবাটী হেঁটেই যেতেন। আর জীবনে কখনো জুতো বা চটি পরতেন না। একদিন তেল মালিশ করার সময়

আমার মনে হলো মায়ের পায়ের বাত যদি আমার পায়ে আসে তাহলে বেশ হয়—মা ভাল থাকবেন। এই ভেবে মায়ের পায়ে হাত রেখে আমার ঐ হাতের কনুইটি আমার পায়ের হাঁটুতে ঠেকাতেই মা আমার দাড়িতে চুমো খেয়ে বললেন ঃ "ছিঃ, ছিঃ, এসব কি ভাবছ ? তোমরা বেঁচে থাক। ঠাকুরের কত কাজ করবে। আমি বুড়ি হয়েছি, আর কতকাল বাঁচব !"

আমি মায়ের সঙ্গে বসে তরকারি কাটতাম। তাঁর উনোনে আগুন ধরিয়ে দিতাম। আটা, ময়দা ঠেসে রুটি, লুচি বেলে দিতাম। মায়ের সঙ্গে বসে পান সাজতাম। ফুল, তুলসী, বেলপাতা, দূর্বা তুলে এনে, চন্দন পিষে তাঁর পুষ্পপাত্র সাজিয়ে দিতাম। ফল থাকলে কেটে দিতাম। তখন তো জয়রামবাটীতে ফলমূল কিনতে পাওয়া যেত না। ফলের মধ্যে কুমড়ো, মূলের মধ্যে আলুই ছিল, আর একটি ছোট দোকান ছিল। দোকান এতই ছোট যে, মা একবার আড়াই পোয়া পোস্ত কিনতে পাঠিয়েছিলেন। পোস্ত চাইতে দোকানদার বলেছিল ঃ "তোমাকেই আড়াই-পো দেব তো আমি খুচরো কি বেচব ? আমার দোকানে মাত্র আড়াই-পো আছে।" এখন বড় বড় অনেক দোকান হয়েছে। মা আমাকে একসঙ্গে দু-খিলি পান খেতে দিতেন আর মেয়েদের কাছে বলতেন ঃ "রামময়কে পান খাইয়ে দেখতে বেশ লাগে ; কালো ছেলেটি আর ঠোঁটদুটি বেশ লাল হয়—আমার মনে হয় যেন টিকেয় আগুন লেগেছে।"

বহু লোক মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে যান আর আমি দেখি। কিছুদিন পরে আমি ভাবলাম আমিও মায়ের কাছে দীক্ষা নেব। কিন্তু মনে সংশয়, কি জানি, আমি তো বেঁটে, ষোল সতেরো বছর বয়স, মা দীক্ষা দিতে রাজি হবেন কি না ! মায়েরই এক বৃদ্ধা শিষ্যা, মায়ের সেবার জন্য জয়রামবাটীতে থাকতেন, তাঁর ছেলে তখন উকিল, তাঁর সাথে পরামর্শ করলাম। তাঁকে বললাম ঃ "আমার তো দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা। আপনি তো এখানে সর্বদা মায়ের কাছে আছেন, আপনার কি মনে হয় মা দীক্ষা দেবেন ?" তিনি বললেন ঃ "ভাই, তোমাকে দীক্ষা

দেবেন বলেই তো মনে হয়। কারণ, তুমি যদি কোন কারণে একটা শনিবার বিকালে না আস তো মা বিশবার তোমার কথা বলেন। বলেন, 'রামময় (আমার বাড়ির নাম ছিল 'রামময়') কেন এল না ; তবে কি ছেলের জ্বর হলো ?' আবার কিছুক্ষণ বাদে বলছেন, 'বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলে, হয়তো পড়াশোনায় বেশি মন দিয়েছে, বোধহয় সামনে কোন পরীক্ষা আছে, তাই মাকে ভুলে আছে'—ইত্যাদি। এরকম বারে বারে তোমার কথা চিন্তা করেন। তোমাকে যখন এত ভালবাসেন, তখন তোমাকে দীক্ষা দেবেন। তবে যদি বলেন, 'আর একটু বড় হয়ে নেবে', সেকথা আলাদা।" আমি তো বড় হয়েছিলাম। বেঁটে বলে আমাকে ছোট দেখাত। যাই হোক, মাকে বলতেই তিনি খুব খুশি। বললেন ঃ "আচ্ছা তুমি দীক্ষা নেবে তো আসনটা পেতে নিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বস।" মায়ের আসন ছাড়া আরও দুখানা গালিচার আসন ছিল। যদি স্বামী-স্ত্রী দীক্ষা নিতেন, তাহলে দুখানি আসন পেতে দিতাম। ঐ দুখানি আসন থেকে একখানি আসন মায়ের সামনে পেতে ঠাকুরকে ও মাকে প্রণাম করে বসলাম। মা কোশা থেকে কুশিতে করে জল নিয়ে আমার গায়ে ছিটাতে ছিটাতে বললেন ঃ "পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাক। ইহজন্মের জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত সব পাপ নষ্ট হয়ে যাক।" এই বলে মা আমার দেহ শুদ্ধ করে নিলেন। পরে একটি দেবতার নাম উচ্চারণ করে বললেন ঃ "ইনিই তো তোমার ইষ্ট ?" আবার মানে বুঝতে যদি না পারি তাই বললেন ঃ "এঁকেই তো তুমি সবচেয়ে বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা কর, ভালবাস ? এঁর মন্ত্রই তো তোমাকে দেব।" তখন আমি বললাম ঃ "মা আপনি ঠিকই ধরেছেন যে, আমি ওঁকেই সবচেয়ে বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু এখন ঠাকুরের বই পড়ে সব দেবদেবী এক মনে হয়। আচ্ছা, আমি যদি কোন মন্ত্র চাই, তা আমাকে দেবেন ?" মা বললেন ঃ "বল।" আমি তখন বললাম। মা বললেন ঃ "এই মন্ত্র পেলে তুমি খুশি হবে ?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ।" তখন তিনি সেই বীজমন্ত্রটি শুনিয়ে দিলেন এবং কি করে ১০৮ বার জপ করতে হয় দেখিয়ে

দিলেন। দু-চারটি কথা ও উপদেশ দিয়ে বললেন ঃ "বাবা, গুরু আর ইষ্টকে এক জানবে, কোন ভেদ ভাবনা করবে না।" আমি তখন জানতাম না যে, দীক্ষান্তে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। তা ছাড়া আমার পকেটে সেদিন একটি পয়সাও ছিল না। বাড়ি থেকে খেয়ে ইস্কুল যাই, ইস্কুল থেকে জয়রামবাটী—সবই হেঁটে, সুতরাং পয়সার দরকার হতো না। মা কিন্তু দক্ষিণা সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। দীক্ষার পর আমি যখন মাকে দুপায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছি (কারণ মা আমাকে পূর্বে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে গেলে বলেছিলেন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেই হবে) তখন মা বললেন ঃ "আজকে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে হয়। কারণ এতদিন যিনি 'মা' ছিলেন, আজ তিনি 'গুরু' হলেন।" তিনি নিজেই শিখিয়ে দিলেন আর আমিও তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। মা দুই হাত আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ও বললেন ঃ "চল বাবা চল, দুটি খাবে চল। বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েছে।" আমি যেই বাইরে বেরিয়েছি, অমনি জ্ঞান-দা (স্বামী জ্ঞানানন্দ) আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কিছু দক্ষিণা দিলি ?" আমি বললাম ঃ "না, কি করে দেব ? আমার পকেটে একটি পয়সাও নেই।" জ্ঞান-দা তখন পকেট থেকে রুমাল বের করে টাকা, আধুলি, সিকি, দু-আনি ইত্যাদি যা ছিল, সব আমার হাতে দিলেন। সব নিয়ে হয়তো আড়াই টাকা তিন টাকা হবে। সেই নিয়ে যেই দরজার কাছে এসেছি অমনি মা বললেন ঃ "কি বাবা ?" আমি তখন সেই টাকাপয়সা মাকে দেখালাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কোথায় পেলে ?" আমি বললাম ঃ "জ্ঞান-দা দিলেন।" তখন তিনি বললেন ঃ "আচ্ছা, দাও।" —বলে সেগুলি নিলেন। আমি আবার তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন ঃ "চল, এখন দুটি খাবে চল।" এই বলে একটা ছোট থালায় করে মা মুড়ি নিলেন এবং আমাকেও দিলেন। মা ও আমি পাশাপাশি বসে খাচ্ছি। মা মাঝে ওঁর থালা থেকে মুড়ি তুলে আমার থালায় দিয়ে বললেন ঃ "খাও বাবা খাও, বুড়ো হয়েছি. দাঁত নড়ছে, চিবুতে

পারছি না।” অর্থাৎ আমি না চাইতেই মা আমাকে প্রসাদ দিচ্ছেন। এখন ভক্তরা দীক্ষা নিলে গুরুর প্রসাদ নিয়ে জল খায়। আর আমি না বললেও করুণাময়ী মা নিজেই আমায় প্রসাদ দিয়েছেন।

আমার ছোটবেলা থেকেই বাগান করার ঝোঁক ছিল। তবে এখন যেমন একই গোলাপগাছের বিভিন্ন ডালে লাল, সাদা, হলদে, গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙের ফুল ফুটোতে পারি, তখন এসব জানতাম না। কিন্তু তখন জয়রামবাটীতে এক একদিন মা একটি ফুলও পুজোর জন্য পেতেন না। শুধু তুলসীপাতা, দূর্বা, বেলপাতা ও চন্দন দিয়ে মা ঠাকুরের উদ্দেশে বলতেন ঃ “ঠাকুর আজ একটি ফুলও জোটেনি, এইসব নিয়েই সন্তুষ্ট হও।” আমি মায়ের বাড়ির পাশে ‘পুণ্যিপুকুরের’ পাড়ে কিছু যুঁই, পদ্মকরবী, গাঁদা, দোপাটি, জবা, টগর, প্রভৃতি ফুলের গাছ লাগিয়েছিলাম। ঐসব ফুল পেয়ে মা কত খুশি! একদিন দেখি, দুপুরে বিশ্রামের পর মা যুঁইগাছের গোড়া খুঁড়ছেন। “আমি এসব করব, আপনাকে করতে হবে না”—বলে খুরপিটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিলে তিনি বললেন ঃ “তুমিই তো সব কর। আমি যুঁই ফুল খুব ভালবাসি কি না, তাই এখন ওদের ফুলের সময় আসছে দেখে একটু জল দেবার জায়গা করছিলাম।” যখন পদ্মকরবীর গাছে প্রথম ফুল ফোটে, মা কাউকে পূজার জন্যও ফুল তুলতে দেননি। বলতেন ঃ “রামময় এসে দেখবে, তার গাছে কত ফুল ফুটেছে। সে নিজে হাতে ফুল তুলে দেবে, তবে ঠাকুরকে দেব।”—কী অপার স্নেহ! আমি শনিবার এসে মাকে প্রণাম করতেই মা আমার হাত ধরে ঐ গাছের কাছে নিয়ে গেলেন ও বললেন ঃ “দেখ, তোমার গাছে কত সুন্দর ফুল ফুটেছে। আবার কেমন মিষ্টি গন্ধ!” আমাকে ফুলের সাজি দিলেন। আমি ফুল তুলে দিতে ঐ ফুল দিয়ে মা ঠাকুরের পূজা করলেন।

একদিন একটা কাগজী লেবুর কলম নিজে তৈরি করে নিয়ে যাই। তাতে ৭/৮-টা ফল ছিল। মা দেখে খুব খুশি হলেন আর সকলকে বলতে লাগলেন ঃ “দেখেছ ছেলের কি বুদ্ধি! এমন কলম করে এনেছে যে এখনই তাতে ফল ধরতে আরম্ভ করেছে।” একদিন ফল

সমেত একটা বড় আমলকী ডাল ভেঙে মাকে দিয়েছিলাম। মা তাতে অসন্তুষ্ট হন ও ফলবান গাছের ফল সমেত ডাল ভাঙতে নিষেধ করেন, বিশেষত আমলকী গাছের। এই আমলকী গাছটি আমোদরের তীরে ছিল। এই আমলকী গাছের তলায় পূজনীয় শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা, গোলাপ-মা ধ্যান করতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ গীতাপাঠও করতেন। মা আরও বলেন ঃ "আমলকী গাছের তলায় তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস। এর তলায় বসে ধ্যানজপ করলে বেশি ফল হয়।" পরে ঐ ডাল থেকে পাতাগুলি পুজোর জন্য রাখতে বলে বললেন ঃ "বেলপাতার মতো ঐ পাতাও পুজোর জন্য ব্যবহার হয়।"

আর একদিন পুণ্যিপুকুরের উত্তর পাড়ের বাগানে জ্ঞান মহারাজ ও আমি কতকগুলি কলাগাছ লাগাচ্ছিলাম। সকাল থেকেই কাজ আরম্ভ করি। অনেক বেলা হওয়ায় মা জল খাবার জন্য পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনকে ডাকতে লাগলেন। আমরা 'যাচ্ছি' বললাম। কিছুক্ষণ পরে মা আবার ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগলেন। বললেন ঃ "খেয়ে গিয়ে কাজটুকু শেষ কর।" আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, কিন্তু জ্ঞান-দা আসতে দিলেন না। তৃতীয়বারে মা জ্ঞান-দাকে ছেড়ে কেবল আমাকে ডাকতেই আমি কোদাল ফেলে ছুটে গেলাম। জ্ঞান-দা "আর অল্পই বাকি আছে", একসঙ্গে যাবেন বললেও আমি তা শুনলাম না। মা খুব খুশি হলেন, বললেন ঃ "জ্ঞান বাঙাল। ওদের ভীষণ গোঁ। কারও কথা শুনবে না। তুমি হাতমুখ ধুয়ে খেতে বস।" আমি খেতে বসছি এমন সময় নলিনীদি ঐ বাগানের জায়গাটা নোংরা বলে আমাকে স্নান না করে খেতে বারণ করলেন ও বললেন ঃ "ছি! ছি! না নেয়ে খেতে রুচবে কি করে গো?" মা তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ "তুই চুপ কর। ওরা ব্যাটাছেলে। সদা শুদ্ধ। ওদের কিছুতেই দোষ হয় না। তোর মন অশুদ্ধ। তাই ছুঁই ছুঁই করে মরিস।" মায়ের কথায় আমি খেলাম। মা-ও খুব খুশি হলেন।

তখন জয়রামবাটীতে লেখাপড়া-জানা লোক খুব কমই ছিলেন। মেয়েদের মধ্যে ২।৪ জন বাংলায় নাম লিখতে পারত। মা বলতেন ঃ

"বাঁড়ুজ্জেদের একটি বৌমা এসেছে। সে কলকাতার মেয়ে। ঘড়িতে দম দিতে জানে।" ঘড়িতে দম দিতে জানা মায়ের কাছে একটা মস্ত বুদ্ধির কাজ। কারণ তিনি বি.এ.-এম. এ. পাশ মেয়ে দেখেননি এবং হাতে ঘড়িবাঁধা মেয়েও দেখেননি। হ্যারিকেন লণ্ঠন পরিষ্কার করতে পারতেন না। আমাকে বলতেন ঃ "বাবা, তুমি কর। ওর মধ্যে অনেক কলকব্জা—আমি পারব না।" এদিকে মা তো বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগটি শেষ করে দ্বিতীয় ভাগের প্রথম লাইনের 'ঐক্য, মাণিক্য ও কুবাক্য' পর্যন্ত শিখতেই ভাগ্নে হৃদয় হাত থেকে বই ছিনিয়ে নিয়ে বলেছিলেন ঃ "মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখা ভাল নয়। তাহলে চরিত্র ভাল থাকবে না, চুপি চুপি ব্যাটাছেলেদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করবে ও নাটক নভেল পড়বে।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আক্ষরিক বিদ্যা না থাকলেও মায়ের আধ্যাত্মিক বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান ছিল। আমি তখন ছেলেমানুষ। ভক্তেরা এবং সাধু-ব্রহ্মচারীরা মাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। আমার ভয় হতো—মায়ের তো 'কুবাক্য' পর্যন্ত শিক্ষা, তিনি এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কি ? এঁরা বেলুড় মঠে গিয়ে পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতিদের কেন জিজ্ঞাসা করেন না ? তাঁরা কত শাস্ত্র পাঠ করেছেন। কিন্তু মা কখনো বলতেন না—"এইসব প্রশ্নের উত্তর রাখালকে, তারককে বা শরৎকে জিজ্ঞাসা করবে।" তিনি সকলের প্রশ্ন শুনতেন এবং এমন উত্তর দিতেন যাতে প্রশ্নকর্তাদের সব সংশয়ের সমাধান হয়ে যেত। আমি ঐ বয়সে প্রশ্নগুলির অর্থও বুঝতাম না এবং মা যা উত্তর দিতেন তাও বুঝতাম না। কিন্তু দেখতাম, যাঁর প্রশ্ন তিনি খুশি হয়ে যেতেন।

'উদ্বোধন', 'তত্ত্বমঞ্জরী' প্রভৃতি পত্রিকা এলে শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করতেন ঃ "উদ্বোধন-এ শরতের লেখা কিছু আছে ?" কিছু থাকলে পড়তে বলতেন। একবার 'তত্ত্বমঞ্জরী'তে সংস্কৃতে একটি স্তোত্র প্রকাশিত হয়। আমি তা পড়ে শোনালে মা বলেন ঃ "বাংলা করে বল।" 'দেশিকেন্দ্রং' প্রভৃতি শব্দের মানে না জানায় এবং ওখানে অভিধান না থাকায় আমি বললাম ঃ "সব কথার মানে জানি না। স্কুলে

গিয়ে পণ্ডিতমশায়ের কাছে বুঝে এসে আপনাকে শোনাব।" তিনি ছাড়লেন না। বললেন: "তুমি যেটুকু পার, তাই বল।"

খুঁটিনাটি বিষয়েও শ্রীশ্রীমায়ের বেশ নজর ছিল। একদিন আমি খাবার জন্য শালপাতায় একটু জল ছিটিয়ে ঝেড়ে পাতছি, এমন সময় মা বললেন: "আহা! ছেলেরা খাবে, ভাল করে ধুয়ে নাও। নইলে ধুলো থাকবে। আমার যখন শক্তি ছিল তখন আমি এক একটি পাতা ধুয়ে কাপড় দিয়ে মুছতাম।" আর একদিন যখন খাবার আসন পাতছি, তখন তিনি তাঁর ঘরের বারান্দা থেকে দেখে বললেন: "সিধে হয়নি।" আমি একটু-আধটু পরিবর্তন করার পরেও বললেন: "এখনো হয়নি।" আমি কোথায় ভুল হচ্ছে ধরতে না পারায় তিনি নিজে এসে ঠিক করে পেতে দিলেন। তখন দেখলাম সব আসনগুলো সমান্তরাল ও সামনের দিকটা এক সরলরেখায় হলো।

একদিন এক স্বামীজী কাশী থেকে খুব বড় একটা বেল এনেছিলেন। মা ঐ বেলটা তাঁর খাটের তলায় রেখেছিলেন। তিনি নলিনীদির ঘরের বারান্দায় বসে তরকারি কুটছিলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে তরকারি কুটছিলাম, তা শেষ করে আমাকে বেলটি এনে দিতে বললেন। আমি অত বড় বেল কখনো দেখিনি। কাজেই কুমড়ো মনে করে বললাম: "আপনার খাটের তলায় তো বেল নেই, মা।" মা বললেন: "আমি নিজে রেখেছি, কোথা যাবে? ভাল করে দেখ।" আমি আবার বললাম: "না মা, বেল নেই।" তখন তিনি বললেন: "খাটের তলায় কি আছে?" আমি উত্তর দিলাম: "একটা কুমড়ো আছে।" তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন: "ঐ কুমড়োটাই নিয়ে এস।" আমি হাতে নিয়েই বুঝলাম—বেল! তখন মা আরও হাসতে লাগলেন।

একবার পাবনা থেকে এক দাদা-বৌদি এসেছিলেন মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে। মা অকাতরে সকলকে দীক্ষা দিতেন। তাঁদের দীক্ষা হলো। দাদার নাম কালীপদ রায়। তিনি স্কুলের শিক্ষক। বৌদির বয়স কম। আমার সামনে ঘোমটা দেওয়ায় মা বললেন: "বৌমা,

তুমি রামময়ের কাছেও লাজ কর ? ওতো আমার মেয়ে গো।" তখন আর তিনি ঘোমটা দিতেন না। একদিন দেখলাম বৌদি একসঙ্গে তিনখানা রুটি বেলছেন। আমার সঙ্গে তখন বেশ ভাব হয়েছে। আমি তাঁর পাশে বসে পড়লাম ও বললাম : "বৌদি, আমাকে শিখিয়ে দিন।" তিনি দেখিয়ে দিলেন প্রথমে চাকিতে একটু আটা দিয়ে তার উপরে একটি লেচি দিয়ে একটু চেপে তার উপরে আটা দিয়ে আর একটি লেচি দিয়ে একটু চেপে তার উপরে একটু আটা ও তৃতীয় লেচি দিয়ে একটু চেপে, তার উপর আটা দিয়ে এবং চাকির উপরে ভাল করে আটা ছড়িয়ে গোল করে বেলুন চালালে একসঙ্গে তিনখানা রুটি ঘুরতে থাকবে। হাত দিয়ে ঘোরাতে হবে না। যখন ধার ও মাঝ বেশ সমান ও পাতলা হবে, তখন দুখানা নিয়ে উলটে-পালটে ঝেড়ে নিলেই হবে। শিক্ষা তো হলো। অভ্যাস করতে গিয়ে দেখলাম তিনখানার বদলে একখানা হয়ে গেছে। বুঝলাম মাঝখানে আটা কম দেওয়া হয়েছে। বেশি আটা দিয়ে করতে তিনখানা হলো। কিন্তু ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো ট্যারাবাঁকা হলো। গোল হলো না। বারে বারে ভেঙে করতে করতে বেশ ভাল তিনখানা রুটি হলো। একদিন পুরুষ-ভক্ত বেশি ছিলেন। মেয়ে-ভক্ত কেউ ছিলেন না। মা অনেক আটা মাখতে দিলেন। আমি মেখে ঠেসে রাখলাম। মা নলিনীদিদিকে বললেন : "নলিনী তুই রুটি সেঁক। আমি ও রামময় তোকে বেলে যুগিয়ে দিই।" মা ছোট শ্বেতপাথরের চাকিতে আবলুস কাঠের ছোট বেলুন দিয়ে একখানি করে রুটি বেলছেন আর আমি বড় কাঠের চাকিতে মোটা বেলুন দিয়ে একসঙ্গে তিনখানা করে বেলছি। বেশ কাজ এগিয়েছে। এমন সময় হঠাৎ নলিনীদি বলে উঠলেন : "পিসীমা, তোমার চেয়ে রামময়ের রুটি ভাল ফুলছে।" যেই না বলা ! — মা অভিমান করে বেলুন-চাকি সরিয়ে দিয়ে বসে রইলেন, বললেন : "আমি রুটি বেলতে বেলতে বুড়ি হয়ে গেলাম। আর রামময় দুধের ছেলে, গলা টিপলে মুখ দিয়ে দুধ বেরোবে—সে আমার চেয়ে ভাল রুটি বেলছে ! আমি আর বেলব না। ও-ই বেলুক।" মা

তো বেলুন-চাকি সরিয়ে বসে রইলেন। আমিও বেলুন-চাকি সরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং মাকে বললাম ঃ "আপনি যদি না বেলেন, তবে আমিও বেলব না। আমিও চললাম।" মা দেখলেন একসঙ্গে দুজনে বেললে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হবে এবং ঠাকুরের ভোগ দিতে ও ছেলেদের প্রসাদ দিতে দেরি হবে না। তাই তিনি বেলতে বসলেন। নলিনীদিকে বকলাম ঃ "দুজনে একসঙ্গে দিচ্ছি, তুমি কি করে চিনলে কোন্‌টি পিসীমার আর কোন্‌টি রামময়ের ? আমি কখনো মা-র চেয়ে ভাল রুটি বেলতে পারি ? তুমি কেন অনর্থক তুলনা করছ ?"

এখন আমার বয়স ৮৮ বছর। যখন এইসব ভাবি—তখন মা কেন এরূপ অভিমান করলেন, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে শাস্ত্রে পাই, এঁদের বিচিত্র ব্যবহার হয়। কখনো ছেলেমানুষের মতো এবং কখনো প্রাজ্ঞের মতো। অকাতরে সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন; সকলের প্রশ্নের সমাধান করে দিচ্ছেন। আবার ছেলেমানুষীও করছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের খরচ কুলিয়ে যেত বটে, কিন্তু বেশি টাকা কোন সময়েই থাকত না। আমাকে বাক্স খুলে কত টাকা আছে বের করে আনতে বললেন। আমি বললাম ঃ "এগার টাকা আছে।" ঐ টাকা সব দিয়ে বললেন ঃ "এই একটাকার তেল, একটাকার আটা, দুটাকার ঘি—ইত্যাদি কিনে আনবে।" আমি বলতাম ঃ "না মা, আপনি যেমন বলছেন লিখে নিচ্ছি। শেষে পাঁচসের, আড়াই সের এইরকম হিসাবে কিনব। তাতে দরে সুবিধা হবে।" মা খুব খুশি হয়ে বলতেন ঃ "হ্যাঁ বাবা, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, তোমার যেমন খুশি হিসেব করে কিনে আনবে। আমি বাবা অত হিসাব করতে পারি না।" কখনো কখনো টাকা ফুরিয়ে গেলে বলতেন ঃ "আজ ইংরেজী মাসের কদিন ?" আমি ২৭ দিন বললে বলতেন ঃ "আর কদিন বাকি আছে ?" আমি চারদিন বাকি আছে বললে বলতেন ঃ "তবে আর কি ? কদিন পরেই ইন্দুর টাকা আসবে, মাস্টারের (শ্রীম-র) পাঁচ টাকা আসবে। তখন বেশি করে কিনলেই হবে।" রাঁচির ইন্দুবাবু ঠিক মাসের ১ তারিখে কি ২ তারিখে মাকে তখন ১৫ টাকা হিসাবে পাঠাতেন। মাস্টারমশায়ও

(শ্রীম) ৫ টাকা পাঠাতেন। সে-সময়ে ওদেশে চালের মণ দুটাকা ছিল।

ইন্দুবাবুর সঙ্গে একবার আমাদের হেডমাস্টারমশায় প্রবোধবাবুর জয়রামবাটীতে সাক্ষাৎ হয়। দুজনেই খুব গল্প জমাতেন। দু-তিনদিন পর প্রবোধবাবু কোয়ালপাড়ায় গিয়ে থাকতে চাইলেন। কেন না, বেশি লোক থাকলে মায়ের কষ্ট হবে। মা কিন্তু বললেন ঃ "কোয়ালপাড়ায় কেন ? এখানেই থাক না। দুটি খাওয়া বৈ তো নয়। আমার কিছু কষ্ট হবে না। তোমাদের দুটিতে বেশ ভাব হয়েছে। যে কদিন ইন্দু আছে, এখানেই থাক।" আমি রান্নার জন্য সরু সরু কাঠ চেলা করছিলাম। প্রবোধবাবু "আমাকে দে" বলে কিছু চিরতেই মা নিজে বৈঠকখানার কাছে এসে বললেন ঃ "না বাবা ! তোমার করতে হবে না। রামময়ের অভ্যেস আছে, ও করুক। তোমরা বয়স্ক লোক, হাতে ব্যথা হবে।" মাস্টারমশাই বললেন ঃ "আমরা gentlemen ! Disqualified ! (ভদ্রলোক ! বাতিল !) একটু খেটে মার সেবা করার অধিকার আমাদের নেই !"

একদিন মায়ের বাক্সের সব কাপড় রোদে দিচ্ছি—একখানি ছেঁড়া আসাম সিল্কের এণ্ডি বা মুগার কাপড় হবে—আমি ঠিক কিসের জানতাম না। কাপড়টি একটু ছেঁড়া দেখে বললাম ঃ "মা, এই কাপড়টা ফেলে দিই, এটা ছিঁড়ে গেছে।" মা বললেন ঃ "না বাবা ফেলো না, ওটি বড় আদর করে 'খুকী' আমাকে দিয়েছিল। অনেক দিন পরেছি।" 'খুকী' হচ্ছেন সিস্টার নিবেদিতা। সিস্টার নিবেদিতাকে মা খুবই ভালবাসতেন। যেদিন স্বামীজী নিবেদিতাকে মাকে দর্শন করতে পাঠান, তাঁর খুবই ভয় ছিল যে, মা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাকে না ম্লেচ্ছ বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন। তারপর মা জানেন না ইংরেজী আর নিবেদিতা জানেন না বাংলা। এজন্য দোভাষীর কাজ করবার জন্য স্বামীজী তাঁর শিষ্য স্বরূপানন্দজীকে পাঠিয়েছিলেন। উনি নিজে গিয়ে সিস্টার নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দিতে মা খুব খুশি। যখন মা নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তখন নিবেদিতা

ইংরেজীতে বললেন ঃ "আমার নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ ।" মা বললেন ঃ "বাছা, আমি অত বড় নাম মনে রাখতে পারব না, আমি তোমাকে 'খুকী' বলে ডাকব ।" স্বরূপানন্দজী তখন বুঝিয়ে নিবেদিতাকে তর্জমা করে বলে দিলেন ঃ "Mother will not be able to utter such a big name , she will call you 'Baby'." নিবেদিতা ভারী খুশি হয়ে বলতে লাগলেন ঃ "Yes, yes, I am mother's baby." স্বামীজীর কাছে গিয়ে ডগমগ হয়ে বললেন ঃ "মা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন, পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দিয়েছেন, প্রসাদ দিয়েছেন এবং 'খুকী' বলে ডাকবেন বলেছেন ।" মায়ের সঙ্গে নিজে কথা বলবেন বলে নিবেদিতা স্বরূপানন্দজীর কাছে বাংলা শিখলেন । মা এইরকম সকলকেই ভালবাসতেন, সকলকেই আদর করতেন ।

শ্রীশ্রীমা গান খুব ভালবাসতেন । একবার ইন্দ্রদয়ালবাবু (পরে স্বামী প্রেমেশানন্দ), মোক্ষদাবাবু প্রভৃতি কয়েকজন জয়রামবাটী এসেছিলেন । তাঁরা বহু গান গেয়ে মাকে শুনিয়েছিলেন । মা-ও খুব আনন্দ করে শুনতেন । শেষে মাকে ঘিরে কীর্তনও হয়েছিল । একবার পূজনীয় বিশুদা (স্বামী তপানন্দজী) জয়রামবাটীতে অনেক গান করেছিলেন । আমাদের হেডপণ্ডিত মশায় পাখোয়াজ বাজিয়েছিলেন । অনেক রাত পর্যন্ত গান হয়েছিল, মা খুব খুশি হয়েছিলেন । গ্রামের বহু লোক জমেছিল ।

একটি ভক্ত-স্ত্রীলোকের মায়ের সেবা করার কথায় শ্রীশ্রীমা বলেন ঃ "না বাবা ! এখানে ঠাকুরের সেবা আছে । চলবে না । আমি সতেরও মা, অসতেরও মা । সতীরও মা, অসতীরও মা । কিন্তু ঠাকুরের সেবা চলবে না । হাড়শুদ্ধ মেয়ে কটা ? আঙুলে গোনা যায় ।"

পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে জয়রামবাটীতে যেদিন প্রথম দর্শন করি, সেদিন দূর থেকে তাঁর বিশাল বপুটি দেখে কাছে যেতে ভয় হয় । সেজন্য তাঁকে রাস্তা থেকে দেখে বরাবর মায়ের কাছে চলে যাই ।

মাকে প্রণাম করতেই মা খুব খুশি হয়ে বললেন : "রামময়, শরৎ এসেছে, দেখেছ ?" আমি বললাম : "হ্যাঁ মা, দেখেছি দূর থেকে।" মা বললেন : "কাছে যাওনি, শরৎকে পেন্নাম করনি ?" আমি বললাম : "না মা, ভয় করছে।" মা বললেন : "বোকা ছেলে ! শরৎকে আবার ভয় ? দেখবে তোমাকে কত ভালবাসবে, যাও।" আমি মায়ের বাড়ির ভেতর দিক থেকে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমার নাম, বাড়ি কোথায়, কেন জয়রামবাটীতে এসেছি, কোন আত্মীয় বা বন্ধু আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ছোট বলে তিনি 'আমি যে মায়ের কাছেই আসি' তা ধারণা করেননি এইরূপ বুঝে আমি সোজা উত্তর দিলাম : "আমি প্রতি শনিবারেই মায়ের কাছে আসি ও সোমবারে স্কুলে ফিরে যাই।" তখন তিনি বুঝলেন। তাঁর কথাগুলো এত স্নেহমাখা যে, আমারও খুব আনন্দ হলো। কয়েক মিনিট পরেই মা আমাকে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন ও কিছু খাবার দিলেন। তখন পূজনীয় শরৎ মহারাজের বুঝতে বাকি থাকল না যে, মা আমাকে খুব স্নেহ করেন। আমি বাড়ির ভেতরের সকলেরই বিশেষ পরিচিত জেনে মহারাজ আমাকে বললেন : "দেখ, মা কখন কি করছেন, দেখবি। যখন তাঁর হাতে কোন কাজ থাকবে না, তখন আমাকে এসে বলবি। আমি তাঁকে প্রণাম করতে যাব কি না, তখন তোকে জিজ্ঞাসা করে আসতে বলব। দেখিস, যেমনটি বললাম তেমনটি করবি। নিজের বুদ্ধি খাটাবি না।" আমি বুঝে নিলাম, পাছে আমি মাকে তাঁর কাজের সময় প্রণামের কথা বলি এইজন্য সাবধান করলেন। আমি ঠিক আদেশমতো গিয়ে বলতাম : "মহারাজ, মা এখন তরকারি কেটে নিজের ঘরে বসে আছেন।" শুনেই মহারাজ বলতেন : "মায়ের কাছে গিয়ে জোড়হাত করে জিজ্ঞাসা করে আয়, আমি এখন প্রণাম করতে যাব কি না।" মাকে জিজ্ঞাসা করা মাত্র বলতেন : "হ্যাঁ বাবা, শরৎকে আসতে বল।" আমি মহারাজের পেছন পেছন গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সব দেখতাম। মায়ের ঘরের দরজা ছোট। মহারাজ বেশ মোটা। সোজা ঢুকতে পারতেন না, কাত হয়ে

ঢুকতেন। মা নিজের খাটে বসে পা দুখানি মাটিতে রাখতেন। মহারাজ নতজানু হয়ে বসে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করতেন। মা-ও তখন দুটি হাত তাঁর মাথায় রেখে আশীর্বাদ করতেন। পরে মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেন ঃ "মা, ভাল আছেন ?" মা উত্তর দিতেন ঃ "হ্যাঁ, বাবা, আমি ভাল আছি। তুমি ভাল আছ ?" তিনি উত্তর দিতেন ঃ "হ্যাঁ, মা, আমি ভাল আছি।" রোজ এই একই প্রশ্ন ও উত্তর শুনতাম। প্রণামের পর মহারাজ ধীরে ধীরে উঠে মায়ের দিকে পিছন না করে পিছিয়ে পিছিয়ে ঘরের বাইরে আসবার পর সোজা হয়ে বৈঠকখানা ঘরে যেতেন। মা ঘোমটা দিতেন বলে বলতেন ঃ "আমি যেন শ্বশুর! আমার সামনেও এতখানি ঘোমটা!"

আজকাল কত ভক্ত কত কিছু আজগুবি কথা বলেন। শুনে হাসি পায়। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "শ্রীশ্রীমা কি গলায় সোনার হার, ঘাড়ে সিন্দুর পরতেন ?" আমি তাঁদের বলি ঃ "এসব বাজে কথা। মা কেবল দুগাছি সোনার বালা পরতেন। গলায় সরু সোনার তার দিয়ে গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালা পরতেন।" কেশবানন্দ স্বামীর ধর্মপত্নী মায়ের গায়ে তেল মাখিয়ে দিতেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তিনি বলেন ঃ "এসব আজগুবি কথা।" পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী, তিনি তখন মঠের প্রেসিডেণ্ট—বলেছিলেন ঃ "...মায়ের শিষ্য শিষ্যা দুই চারজনের কথা একটু নুন দিয়ে গিলতে হবে। তারা কিছু কিছু আজগুবি কথা বলে।" আমি মায়ের মাথা থেকে পাকা চুল বেছে দিতাম। কখনো ঘাড়ে সিন্দুর দেখিনি।

পুঁথিকার শ্রদ্ধেয় অক্ষয় মাস্টার মহাশয় বলতেন ঃ "দেখ ভাই! ঠাকুর আমার গুরু এবং যা কিছু সব। কিন্তু তবু মার এত স্নেহ যে, ঠাকুরকে যদি দিনে দুশো বার স্মরণ হয়, তো মাকে হাজার বার মনে পড়ে। ঠাকুর যেন প্রচণ্ড মার্তণ্ড, আর মা যেন সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমা। কিন্তু ভাই, এমন স্নেহময়ী জননীও প্রারব্ধের উপর হাত দেন না। সেটি এই শরীরের উপর দিয়েই ভোগ হয়ে যাবে।" তারপর একটা ঘটনা বললেন ঃ "একদিন আমি ও উমেশ ডাক্তার মাকে দর্শন করতে যাই।

মা নানাকথার মধ্যে এমন সহজ সরলভাবে নিজের আঙুলের ডগাটি দেখিয়ে বললেন ঃ 'শেষ বয়সে অক্ষয়ের একটু কষ্ট আছে।' তখন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরে ঘরে বসে যতই ভাবি, ততই পরাণটা আঁচড় পাঁচড় করতে থাকে। দুই/তিন দিন পরে উমেশ ডাক্তার মাকে দর্শন করতে গেল। আমি তার মারফত বলে পাঠালাম, 'মাকে গিয়ে বলবি আমার শেষ বয়সে কষ্ট হবে শুনে বড়ই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মা যেন আশীর্বাদ করেন ঐটি যাতে কেটে যায়।' কিন্তু তা শুনেও মা বলেছিলেন, 'সামান্য একটু কষ্ট হবে।' কই, 'এটি হবে না' তো বললেন না। আর এটুকু কষ্ট কেমন তা তো বুঝতেই পারছ!" অক্ষয় মাস্টারমশায়ের শেষজীবনে খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সারা দিনরাতের মধ্যে কখনো ঠাকুর ও মায়ের কথা ছাড়া অন্য কথা বলতেন না। আমাকে অনেক কথা বলে বলতেন ঃ "এখন কেবল শুনে রাখ, মা যখন কৃপা করেছেন, তখন একদিন সব উপলব্ধি হবে। তখন মনে পড়বে—হ্যাঁ, বুড়ো এসব ঠিক ঠিক বলেছিল তো।"*

* স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ কর্তৃক সংগৃহীত টেপরেকর্ডেড স্মৃতিকথা (অনুলিখন ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ) এবং বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের (কলকাতা ৭০০ ০৬৪) ৫ম বার্ষিক 'উৎসব স্মরণিকায়' (১৩৮৭) প্রকাশিত স্বামী গৌরীশ্বরানন্দের 'স্মৃতিচারণ'। সম্পূর্ণ স্মৃতিকথাটি গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এটি 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। —সম্পাদক।

কলকাতায় 'মায়ের বাড়ী'তে মাকে প্রথম দেখি

সরযু রায়

মাস, তারিখ আজ আমার স্মরণ নেই, আনুমানিক বাংলা ১৩১৯ ও ইংরেজী ১৯১২ সাল হতে পারে। বয়স তখন আমার নয়-দশ বছর। তবে সেই পবিত্র দিনটার কথা আজও আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে, যেদিন শ্রীশ্রীমা তাঁর স্নেহস্পর্শ দিয়ে কৃপা করে আমাকে ধন্য ও কৃতার্থ করেছিলেন।

শৈশব থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি প্রত্যক্ষ অনুরাগ জন্মায় আমাদের গৃহশিক্ষকের মাধ্যমে। উদ্বোধন পত্রিকা ও তৎকালীন শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর প্রকাশিত বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি আমাদের গল্পচ্ছলে তাঁর কথা বলতেন। কেন জানি না, শুনতে ভাল লাগত। পড়াশুনার চাইতে ঐ বয়সেই একটা তীব্র আকর্ষণ বোধ করতাম সেই সমস্ত আলোচনায়। তারও পূর্বে আমার পিতামহ জগবন্ধু সেন শ্রীশ্রী-ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেনের অনুরাগী ছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্টীমার-ভ্রমণে ভক্তসঙ্গে আমার পিতামহেরও স্থান হয়েছিল। এরই প্রভাবে আমাদের পরিবারে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একটা যোগ ছিল। আমার ঠাকুরমা যোগমায়া দেবীর গঙ্গাস্নানের অভ্যাস ছিল। আমাদের পিত্রালয় চাঁপাতলা (শিয়ালদহ) থেকে প্রায়ই বাগবাজার ঘাটে তিনি স্নান করতে যেতেন। সুযোগ পেলেই ফেরার পথে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে আসতেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁর সঙ্গী হলেও, আমার শৈশবত্বের কথা চিন্তা করে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায়, আমাকে শ্রীমার কাছে তিনি নিয়ে যেতেন না। একবার আমি জেদ ধরায় তিনি রাজি হলেন। সেটাই

ছিল আমার জীবনের ঈপ্সিত দিন। আজ জীবনসায়াহ্নে এসে স্মরণ করলেও মনটা সজীব হয়ে ওঠে, অপূর্ব সুখানুভূতিতে ভরে যায়।

সেদিন গঙ্গাস্নানান্তে গিয়েছি, সঙ্গে আমার ঠাকুরমা। শ্রীশ্রীমা বসে আছেন পাশের ঘরটিতে। প্রণাম করেছি, কতক্ষণ ধরে জানি না। আমার অজান্তে আনন্দাশ্রু এসেছে, আমি রোধ করতে পারিনি। ঐ বয়সে অত বোধশক্তি ছিল না, তবে কেন জানি না, মনে হয়েছে—ইনি যে আমার অনেক চেনা, আমার সবথেকে আপনজন। আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, সম্বিৎ ফিরলে বুঝতে পেরেছি, মা বলছেন—"তুই কাঁদছিস কেন, এই তো আমি", আর মাথায় স্নেহস্পর্শ দিচ্ছেন। সমস্ত শরীর অপূর্ব আবেশে শীতল হয়ে যাচ্ছে, আমি যেন হারিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পর মা ঠাকুরের প্রসাদ দিলেন। পরিচয় জানার জন্য আমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"এটি কাদের বাড়ির মেয়ে?" শোনার পর, একদিন স্নান করিয়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। সেখানে গোলাপ-মা, যোগীন-মা উপস্থিত ছিলেন। স্নান করিয়ে নিয়ে আসার অর্থ তাঁরা জানতেন। সেই সময়ে কোন কারণে মা নাকি অনূঢ়া কন্যাদের কৃপা করতেন না। মাকে সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ায়, তিনি বললেন, "এর-জন্যে লাগবে না।" অযাচিত কৃপায় আমি ধন্য হলাম।

নির্দিষ্ট দিনে আমাদের মাস্টারমশায়ের সঙ্গে বাগবাজারে উদ্বোধনে উপস্থিত হয়েছি। কোন কারণে আমাদের পৌঁছাতে কিছুটা দেরি হয়েছিল। দেখি, পূজনীয় শরৎ মহারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে সামনের রাস্তায় পায়চারি করছেন। আমাদের আসতে দেখে বিরক্ত হয়ে সঠিক সময়ে না আসার জন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। জানালেন, শ্রীমা আমাদের জন্য অপেক্ষায় আছেন। মাস্টারমশাই সবিনয়ে বিলম্বের কারণ জানালে, আশ্বস্ত হয়ে আমাকে উপরে পৌঁছে দিতে বললেন।

উপরে গেলাম, মা পূজার আসনে, পাশেও একটি আসন পাতা। স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সস্নেহ আহ্বান, কোন অনুযোগ নেই। আমার শিশুমন তখনই ভরে গেল আনন্দে। মা উঠে দ্বার রুদ্ধ করলেন, সেখানে আর

কেউ নেই। আমি আর মা। আমাকে অন্য আসনটিতে বসতে বলে, নিজে পূজার আসনটিতে বসে কিছুক্ষণ পূজা করলেন। আমি পাশে বসে ভাবছি—মা তো আমাকে মন্ত্র-দীক্ষা দেবেন, কিন্তু কি সে মন্ত্র! আমি যে ঠাকুরকে বড় ভালবাসি, অন্য কোন নাম পেলে অনুরাগ আসবে কি ? অন্তর্যামিনী জগজ্জননী আমার আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারলেন। পূজা সাঙ্গ হলে আমাকে সচকিত করে বললেন— "ওরে, ঠাকুর ছাড়া আমাদের আর কে আছে! তুই যা চাইছিস, সেই নামই পাবি।" আমি অবাক হলাম! দীক্ষিত হলাম মহামন্ত্রে, মহামায়ার কাছ থেকে। সস্নেহে করজপ করা দেখিয়ে দিলেন। হাতে কিছু ফুল দিয়ে গুরুপূজা করতে বললেন। কিভাবে পূজা করতে হয় আমি তো কিছুই জানি না। ইতস্তত করছি দেখে মা তাঁর শ্রীচরণ দুটি বাড়িয়ে দিয়ে পুষ্পার্ঘ্য দিতে বললেন। প্রাণভরে অর্ঘ্য দিলাম। আমার হাতে একটি হরীতকী দিয়ে গুরুদক্ষিণা দিতে বললেন। দু-হাত পেতে মা সেটি গ্রহণ করলেন। আবার আমি কৃতার্থ হলাম। নিচে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে বাড়ি ফেরার আগে পুনরায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন।

প্রসাদ ধারণের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। মা-ও সেই সময়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন, সময় হলে সকলের সঙ্গে তাঁকে দর্শন করতে উপরে গেলাম। প্রাণভরে প্রণাম করলাম, মা মাস্টার মশাইকে বলে দিলেন, মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্যে। যাওয়ার আগে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে যেতে নির্দেশ দিলেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজকে প্রণাম করতে উনি মার একটি ছোট্ট ফটো দিয়ে বলেছিলেন—"এটি বুকের মধ্যে করে নিয়ে যাও, কাউকে দেখিও না।" বোধ হয় মায়েরই সেরূপ কোন নির্দেশ ছিল। পরিপূর্ণ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এর পরে বেশ কয়েকবারই বাগবাজারে মাকে দর্শনের ও প্রণামের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতেই একটা অনাবিল স্নেহ, এবং তা হৃদয় মথিত করত। আহ্বানে কী আপনকরা ভাব! আর তাঁর শ্রীচরণ দুখানি! কি কোমল আর একটা গোলাপী আভা। মুখে কিছু বলার

প্রয়োজন হতো না, তিনি অন্তর্যামিনী, সবই অনুভব করতেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে গল্পে-পড়া ডাকাত-বাবার কথা ভেবে মনে হয়েছে, এই কি সেই মা যাকে ডাকাতে ধরেছিল ? কালীরূপে মা তাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। মা বলে উঠেছেন, "হ্যাঁরে, আমিই সেই ডাকাতের মেয়ে, তোদের ঠাকুর আমার ডাকাত-বাবাকে কত শ্রদ্ধা করতেন !" মা নিজে বুঝিয়ে না দিলে তাঁকে বোঝার উপায় ছিল না। কি সহজ আর কত সাধারণ !

আমার ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর অহেতুকী কৃপা আমি অনুভব করেছি, এখনো করে চলেছি। আমার বিবাহ করার কোন বাসনা ছিল না। বাবা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কেন জানি না, মনে হতো অন্যান্য ভাই-বোনের থেকে তাঁর ওপরে অধিকার আমার যেন একটু বেশিই ছিল। আমার মতামতকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কখনো জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতেন না। সেই সময়ে সমাজে একটি কন্যা অনূঢ়া থেকে যাবে, এটা কষ্ট-কল্পনাই ছিল। পরিবারের বয়স্করা শঙ্কিত হয়ে তাঁকে অনুযোগ করলেও তিনি নির্বিকার থাকতেন আমার কথা ভেবে। পরে সকলের উৎকণ্ঠায় স্থির হয়, আমাকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে সমস্যার সমাধানের জন্য। বাবা আমাকে সেই সিদ্ধান্ত জানানোয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হতে হয়। তখন আমার বয়স বেশ বেড়েছে, প্রায় ১৬/১৭-এর মতো। সেকালের সমাজে প্রায় পতিত হওয়ারই কথা।

মা ধৈর্য ধরে আমার বাসনা শুনলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন ঃ "দেখ, তুমি সংসারী হবে, আর যার সঙ্গে সংসার করবে সেও তোমার ভাবে ভাবিত।" — মা কি তাঁর অর্বাচীন কন্যাটির জন্য পাত্রও নির্বাচন করে রেখেছিলেন ! পরবর্তী জীবনে যাঁর সঙ্গে আমার ভাগ্য যুক্ত হয়েছিল, তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি প্রয়াত খগেন্দ্রকৃষ্ণ রায়। মঠে প্রবীণদের কাছে খগেনবাবু নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ)। কাছেই সারগাছি আশ্রম,

অখণ্ডানন্দজী সেখান থেকে সেবাকার্য শুরু করেছেন। আশে-পাশের তরুণরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবানুরাগী হয়েছে। তরুণ খগেনবাবু তাঁদেরই একজন ছিলেন। অখণ্ডানন্দজীই তাঁকে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমার কাছে পাঠান। তিনিও শ্রীশ্রীমার কৃপালাভে ধন্য হন। এখন ভাবি এটা কি অলৌকিক নয়! শুধু তাঁর কৃপাতেই সম্ভব। *

---

* উদ্বোধন, ৯২ তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৯৭

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

মুকুন্দবিহারী সাহা

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা জেলার সিঙ্গাইর গ্রামে আমার জন্ম। অবিভক্ত বাংলার এই ক্ষুদ্র গ্রামটি ছিল ঢাকা শহর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল দূরে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় আসি এবং স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হই। ঝামাপুকুরে এক বাসায় থাকতাম। একদিন আমার এক বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান গৃহিভক্ত শ্রীম বা কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা বলেন। সেই বন্ধুর সঙ্গে একদিন শ্রীম-কে প্রণাম করতে যাই। রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ তথা রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের সঙ্গে সেই আমার পরিচয়ের শুরু। মাঝে মাঝেই শ্রীম-র কাছে যেতাম। ক্রমে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়। এভাবে কিছুদিন চলে। ইতিমধ্যে আমি বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। শ্রীম একদিন বললেন বেলুড় মঠে যেতে। বেলুড় মঠে গিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ, স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ প্রমুখ ঠাকুরের পার্ষদদের দর্শন লাভ হয়। ক্রমে তাঁদের স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্যও হয়।

একদিন শ্রীম-র কাছেই শুনি, বাগবাজারে শ্রীশ্রীমা-ঠাকরুন আছেন। যে-বন্ধু আমাকে শ্রীম-র সংবাদ দিয়েছিলেন, সেই বন্ধুকে নিয়েই একদিন গেলাম বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে। এটি ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ঘটনা। নিচে ছিলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। তাঁর অনুমতি নিয়ে দোতলায় গেলাম মাকে প্রণাম করতে। অপরূপ মাতৃমূর্তি! মা পুরুষদের সঙ্গে কথা বলতেন না, কিন্তু আমরা যখন প্রণাম করলাম, মা আমাদের সঙ্গে কথা বললেন। মা জিজ্ঞাসা

করলেন, আমরা কি করি, কলকাতায় কোথায় থাকি, দেশ কোথায় ইত্যাদি। মায়ের কথা ছিল অতি সুমিষ্ট। ঐ দুই-চারটি কথায় আমার প্রাণ-মন ভরে গেল। বললাম ঃ "মা, আমি দীক্ষা নেব।" স্মিত হেসে মা বললেন ঃ "বেশ তো বাবা, কাল সকালে এস।" বললাম ঃ "কি নিয়ে আসব ?" মা বললেন ঃ "কিছু না, শুধু দুটো ফুল।" পরদিন সকালে গেলাম মায়ের বাড়ি, সঙ্গে শুধু দুটি ফুল। দীক্ষা হয়ে গেল। মায়ের এক সেবক বললেন ঃ "একটু মিষ্টি আননি ?" কথাটা শুনে খুব লজ্জা পেলাম। পরদিন কলেজের ছুটি হলে মাকে প্রণাম করতে ছুটলাম। গতদিনের কথা মনে ছিল। দোকান থেকে একটুখানি মিষ্টি কিনে নিয়ে গেছি। যে-মহারাজ গতদিন মিষ্টির কথা বলেছিলেন, তিনি বললেন ঃ "এখন কোত্থেকে ?" বললাম ঃ "কলেজ থেকে সোজা।" মিষ্টির প্যাকেটটি মহারাজকে দেখিয়ে বললাম ঃ "মায়ের জন্য এনেছি।" মহারাজ বললেন ঃ "বোকা, কলেজের কাপড় না ছেড়েই মিষ্টি নিয়ে এসেছ ? ওকি মা খাবেন ?" মনে ভারি কষ্ট হলো। মাকে শুধু প্রণাম করেই চলে আসব ভেবে দোতলায় গেছি। মাকে প্রণাম করে উঠতেই মা বললেন ঃ "কই গো ছেলে, আমার জন্য যে মিষ্টি এনেছ, দেবে না ?" অন্তর্যামিনী মা—কিছুই তাঁকে বলতে হয় না! কিন্তু কলেজের কাপড়ে-আসা আমার আনা মিষ্টি তো মা খাবেন না। আমি তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। মা বললেন ঃ "কই গো ? দাও।" মা হাত পাতলেন। সঙ্কোচের সঙ্গে মিষ্টির ছোট প্যাকেটটি বের করলাম। চোখে একটু জলও এসেছে। বললাম ঃ "আমার কাপড় যে ছাড়া নয় মা। কলেজ থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি।" মা বললেন ঃ "তাতে কি হয়েছে !" মিষ্টির প্যাকেটটি মায়ের হাতে দিতে মা একটুখানি তা থেকে মুখে দিয়ে পুরো প্যাকেটটাই আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ "খাও।" যেন অমৃত খেলাম!

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ঃ "মা, কি করব আমি ?" মা বলেছিলেন ঃ "কি আবার করবে ! সৎপথে থাকবে। বিয়ে করো না।

মাস্টারি করবে, ছেলেদের মানুষ করবে।" মাকে বললাম ঃ "কিন্তু, বিয়ে না করে যদি কুপথে যাই ?" মা বললেন ঃ "এদিকে এস।" কাছে যেতে মাথায় হাত রেখে বললেন ঃ "কোন ভয় নেই, বাবা।"

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে এম. এ. পাশ করি। পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই রামপুরহাটে নতুন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কর্মজীবন শুরু করি। মা বলেছিলেন ঃ "মাস্টারি করবে।" কর্মজীবনের সূচনা হলো মাস্টারি দিয়েই। সেই মাস্টারি আর কোনদিন ঘুচল না! মায়ের নির্দেশ ঃ "ছেলেদের মানুষ করবে।" তা আজও পালন করার চেষ্টা করে চলেছি। কতখানি পেরেছি, তা মা-ই জানেন। [অকৃতদার মুকুন্দবিহারী সাহা পরবর্তী কালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে রামপুরহাট থেকে সাত মাইল পশ্চিমে সাঁওতাল-অধ্যুষিত তুম্বুনি গ্রামে একক প্রয়াসে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে 'শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষাপীঠ' নামে ছাত্রদের জন্য একটি বড় আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কালো পাহাড়ের কোলে অবস্থিত তুম্বুনির নতুন নাম হয় 'শ্যাম-পাহাড়ী'।]

তখন রামপুরহাটে দুই-এক বছর হলো এসেছি। ধুবলহাটির রাজ-পরিবারের এক কন্যার সঙ্গে আমার বিবাহের একটি প্রস্তাব আসে। মা আমাকে বলেছিলেন ঃ "বিয়ে করো না।" এই প্রস্তাবটিকে আমি সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারতাম, কিন্তু তা না করে সোজা বাগবাজারে মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মাকে সব কথা বললাম। মা বললেন ঃ "কেন বাবা, তুমি তো বেশ আছ। তোমাকে দিয়ে অনেক ছেলের কল্যাণ হচ্ছে, এর পরে আরও অনেকের হবে। অনেক বড় কাজ করবে তুমি।" "কিন্তু মা, আমার যে মাঝে মাঝে সংসার করতে খুব ইচ্ছে করে।" মা বললেন ঃ "তোমার তো অনেক বড় সংসার হবে।" আমি বললাম ঃ "কিন্তু মা, আমি কি এভাবে সারাজীবন থাকতে পারব ? যদি কখনো মনে দুর্বলতা আসে ?" মা দৃঢ়ভাবে বললেন ঃ "ওর জন্য তুমি ভেবো না। কলিতে মনের পাপ

পাপ নয়। যখনই দুর্বলতা আসবে ঠাকুরকে স্মরণ করবে, আমাকে ভাববে।"

আজ জীবনের প্রান্তসীমায় এসে দেখছি[১] মায়ের আশীর্বাদে জীবনটা তাঁদের আশ্রয় করে কাটাতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি, মায়ের আশীর্বাদে পৃথিবীতে কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। *

---

১ ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ১৪ মার্চ মুকুন্দবিহারী সাহা পরলোকগমন করেন।

* উদ্বোধন, ৯৪ তম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৮

কেমনে ভুলি করুণা তাঁর

কেশবচন্দ্র নাগ

আমার মেজ বৌদি তরুবালা স্বপ্নে মায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষা পান। জিতুদাদাকে (স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ; পূর্বাশ্রমে আমাদের গ্রাম হুগলী জেলার গুড়াপে আমাদের প্রতিবেশী— জিতেন্দ্রনাথ রায়) এই কথা বললে, তিনি বললেন ঃ "শ্রীমা উদ্বোধনে আছেন। মায়ের কাছে গিয়ে বৌদি যেন স্বপ্নের কথা জানান।" ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ। তখন আমার বয়স সতের-আঠার বছর। একদিন সকালের ট্রেনে বৌদিকে নিয়ে দেশের বাড়ি গুড়াপ থেকে কলকাতা এলাম। উদ্বোধনে যখন পৌঁছালাম তখন দুপুর হয়েছে। ঘণ্টা পড়েছে, সবাই প্রসাদ পেতে বসেছেন। আমি ও আমার মেজ বৌদি সারদানন্দজীর অফিস-ঘরে বসলাম। ইতিমধ্যে কেউ ওপরে খবর দিয়েছে দুজন ভক্ত এসেছে। ওপর থেকে খুব জোরে মহিলাকণ্ঠে হাঁক এল ঃ "কে গো ?" সারদানন্দজী বললেন ঃ "গুড়াপ থেকে একটি ছেলে ও একজন মহিলা এসেছেন। মাকে প্রণাম করতে চান।" পরে জানলাম যিনি হাঁক দিচ্ছিলেন তিনি গোলাপ-মা। পরে দেখেছি গোলাপ-মা খুব জোরে কথা বলতেন, কিন্তু যোগীন-মা ধীরে। শুনলাম, মা বলে দিয়েছেন ঃ "আগে ওরা প্রসাদ পেয়ে নিক। তারপর দেখা করবে।" প্রসাদ পেলাম, কিন্তু মায়ের দর্শন হলো না। মেজ বৌদি মাকে তাঁর স্বপ্নের কথা বললেন। মা তাঁর সব কথা শুনে তাঁকে সেদিন দীক্ষা দিলেন। জিতুদাদাকে সব জানালাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, 'কথামৃত' পড়তে আর ঠাকুরকে আদর্শ হিসেবে সামনে রাখতে।

তারপর বেশ কয়েকবছর কেটে গেছে। ততদিনে কিষাণগঞ্জে কিছুদিন মাস্টারি করে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে মাস্টারি করছি। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি। কি একটা যোগাযোগ

হওয়াতে কলকাতা এলাম। শুনলাম মা উদ্বোধনে আছেন। দেখা করতে ছুটলাম। তার আগে বলরাম মন্দিরে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা। বললাম ঃ "মায়ের কাছে দীক্ষা নেব।" তিনি বললেন ঃ "খুব ভাল কথা। মহা ভাগ্যবান তুমি।" উদ্বোধনে মায়ের দর্শন হতেই মাকে বললাম দীক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষার কথা। মা দয়া করে মহামন্ত্র দিলেন। দিলেন একটি রুদ্রাক্ষের জপমালা। মা সেটি জপ করে দিয়েছিলেন। এই মালাটি একবার ট্রেনে আসার সময় হারাই। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওটি আবার পেয়ে যাই। যাক সেসব কথা।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দ। প্রচণ্ড অসুখে পড়লাম। দেশের বাড়ি গুড়াপে এলাম। বাড়িতে সবাই খুব চিন্তায় পড়লেন। গুড়াপে তখন একজন ভাল ডাক্তার এসেছিলেন। তিনিই দেখছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। রোগ ক্রমে বেড়েই যেতে লাগল। পরিজনেরা ভয় পেলেন। বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে এল। তবে চিকিৎসার কোন ত্রুটি ছিল না। ক্রমে ভীষণ শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। ডাক্তার বললেন ঃ "অক্সিজেন সিলিন্ডার লাগবে।" বাড়ি থেকে কে যেন বর্ধমান গেল অক্সিজেন সিলিন্ডার আনতে। সেই রাতটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কষ্টটা যেন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বুঝিবা শেষ রাত। বাড়িতে কারো চোখে ঘুম নেই। হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়ল। মাকে অসুস্থ অবস্থায় সেবা করেছিলেন মা-কালী স্বয়ং। আমার এই দুঃসময়ে মা কি আমায় বাঁচাবেন না? বারবার শুধু তাঁর কথা ভাবছি। তাঁকে ডাকছি। হাত-পা নাড়ার ক্ষমতা নেই। শুধু কাঁদছি, আর কাঁদছি। এমন সময় ঘটনাটা ঘটল। হঠাৎ স্পষ্ট দেখলাম, মায়ের মতো কে যেন একজন আমার মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, মা-ই তো! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সবু লাল পাড় শাড়ি। দুচোখে করুণা যে ঝরে পড়ছে। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ওঃ, সে কী সুখস্পর্শ! মনে হচ্ছিল আমি সেরে যাচ্ছি। আমি হাত-পা নাড়তে পারছি। হয়তো কথাও বলতে পারব। মা আমাকে সাদা একটা গুলি, অনেকটা ন্যাপথ্যালিনের মতো, খাইয়ে দিলেন। গুলিটা যত গলা দিয়ে নামছে ততই আমার মনে হচ্ছে আমার সমস্ত রোগযন্ত্রণা নিয়ে সেই

গুলি যেন শরীরে মিশে যাচ্ছে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কোন খেয়াল নেই। ভোরবেলা ঘুম ভাঙল। মনে হলো আমার শরীরে কোন কষ্ট নেই, কোন যন্ত্রণা নেই, কোন রোগ নেই। আমি সুস্থ—সম্পূর্ণ সুস্থ। নিজেই এতদিন পর বিছানা ছেড়ে উঠলাম। সবাইকে অবাক করে হাঁটলাম। সকালে ডাক্তার এলেন। খুব জোরের সাথেই বললাম ঃ "ডাক্তারবাবু আমি সেরে গেছি। আমি ভাল হয়ে গেছি।" ডাক্তার অবাক। বললেন ঃ "ভগবানই তোমাকে বাঁচিয়েছেন।" অক্সিজেন সিলিন্ডার ফেরত গেল। আমি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠলাম। সুস্থ হয়ে উঠলাম নয়, আমি দ্বিতীয়বার জীবন পেলাম। আমার জীবনদাত্রী—মা। *

---

* উদ্বোধন, ৯১ তম বর্ষ, ১২ তম সংখ্যা, পৌষ, ১৩৯৬

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণিকা

শিবরানী সেন

আমার বয়স এখন (১৯৯২) সাতাশি। আজ থেকে প্রায় ৭৯-৮০ বছর আগে (১৯১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে) আমার যখন সাত-আট বছর বয়স তখন মাকে প্রথম দেখি। আমার মামার বাড়ী বাগবাজারে। আমার দিদিমা প্রায়ই বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে যেতেন মাকে দর্শন করতে। মামার বাড়ি এলে আমিও আমার দিদিমার সঙ্গে 'মায়ের বাড়ী' যেতাম। তারপর শ্রীশ্রীমা যতদিন জীবিত ছিলেন মাঝে মাঝেই বাগবাজারে তাঁকে দর্শন করে ধন্য হয়েছি। তখন বয়স অল্প—মায়ের মহিমা তো কিছুই বুঝতাম না, শুধু মাকে দেখলে, তাঁর কথা শুনলে প্রাণটা জুড়িয়ে যেত। আর মায়ের কাছে গেলেই সবসময় উপরি-পাওনা ছিল মায়ের হাত-ভর্তি প্রসাদ। যতদিন মা সুস্থ ছিলেন, মা নিজের হাতেই প্রসাদ দিতেন। সন্দেশ, ফল কত কী! আমার দুটো ছোট হাতে সব ধরত না। মায়ের মহিমা বুঝি আর না বুঝি প্রসাদ তো বুঝতাম! মায়ের কাছে যাবার সময় ঐ হাত-ভর্তি প্রসাদের লোভও ছিল।

শ্রীশ্রীমা দিদিমা ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলতেন। সেসব কথা শুনতাম, বুঝতাম না কিছুই। তবে আমাকে তিনি যা বলতেন তার কিছু কিছু এখনো আমার মনে আছে। এখনো তাঁর সেই উজ্জ্বল প্রসন্ন করুণাময়ী মূর্তি চোখের সামনে ভাসছে।

মায়ের কথা ছিল খুব মিষ্টি। সেই মধুমাখা কথা এখনো কানে বাজে। মা একদিন আমাকে বলেছিলেন : "মা, কখনো চুপচাপ বসে থেকো না—কিছু না কিছু কাজ করবে। একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকতে হয়, নইলে অলস মনে নানা বদ চিন্তা এসে ভিড় করবে।"

একজন বয়স্ক মহিলাকে মা একদিন বলছিলেন ঃ "যে-রাস্তায় তুমি চলছ, যদি দেখ সে-রাস্তায় কেউ পড়ে গিয়েছে তাকে তুমি তুলে দেবে। পথে পড়ে-থাকা কাউকে দেখে কখনো ফেলে যেতে নেই।" তখন ছোট ছিলাম, মায়ের কথার তাৎপর্য বুঝিনি। পথে কিছু পেলে কুড়িয়ে রাখতাম, কিন্তু বয়স যত বাড়ল তত বুঝতে পারলাম, জগজ্জননী কি বলতে চেয়েছেন। তাঁর জীবন-কথা পড়ে বুঝেছি যে, তিনি 'পথে পড়ে-থাকা জিনিস কুড়োতে বলেননি; তিনি বলেছেন আমাদের প্রতিবেশী হোক, চেনা-অচেনা হোক—কেউ যদি চলার পথে পড়ে যায় তাকে বা তাদেরকে যেন আমরা হাত ধরে ঠিক পথে নিয়ে যাই। কারণ, সকলের পথ তো একটাই—ভগবানের দিকে। আমিই শুধু সেই পথে একা হাঁটব, তা কেন হবে ? আমি অন্যদেরও, যারা পথভ্রষ্ট তাদেরও, আমার সাধ্যমত টেনে তোলার চেষ্টা করব। এই আদর্শ তো মা তাঁর নিজের জীবন দিয়েই দেখিয়ে গেলেন। পথে পড়ে-থাকা কত পাপী-তাপী, আর্ত নর-নারীকে দুহাতে পথ থেকে তুলে নিয়ে নিজের কোলে তিনি স্থান দিয়েছেন। ধন্য তারা—মায়ের সেই পথে-কুড়ানো ছেলেমেয়ের দল !

মা ছিলেন খুবই লজ্জাশীলা। ছেলেদের বয়স পনেরো-ষোল বছর হয়ে গেলেই মায়ের কাছে সে হয়ে যেত 'পুরুষমানুষ'। পুরো মুখ ঢেকে মা তার সামনে ঘোমটা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ "মেয়েদের লজ্জাই ভূষণ। আব্রু ছাড়া মেয়েদের মানায় না।" একদিন এক অল্পবয়সী সুন্দরী গৃহবধূকে তিনি বলছেন শুনলাম ঃ " সবসময় গায়ে ভাল করে কাপড় বা চাদর জড়িয়ে বাইরে বেরুবে। তাহলে মনে হবে, ঠিক তোমার সঙ্গে কেউ আছে।"

একবার দিদিমা ও মামার বাড়ির আরও কয়েকজন মিলে 'মায়ের বাড়ীতে গেছি। দুপুরে প্রসাদ পাব। মায়ের সঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। তখন দেখতাম, মেয়েদের নিয়ে মা একটি ঘরে প্রসাদ পেতে বসতেন। ছেলেরা আরেকটি ঘরে প্রসাদ পেত। পেট ভরে প্রসাদ পেয়েছি সবাই, হাত-মুখও ধোয়া হয়ে গেছে। দেখি, মা খুব

ব্যস্ত হয়ে একজনকে বলছেন, আমাদের বাড়ির জন্যে কিছু প্রসাদ পাত্রে করে দিতে। যাকে বললেন, সে একটু দেরি করায় মা নিজেই উঠছিলেন খোঁজ করার জন্য। যোগীন-মা বললেন : "মা, তুমি উঠছ কেন ? ও হয়তো বাটি-টাটি ধুয়ে নিয়ে আসছে, সেজন্য দেরি হচ্ছে।" তারপর একটু হেসে বললেন : "তোমার বাবার ঘর থেকে কি একরাশ বাসন দিয়েছে যে, তুমি সবাইকে বাটি করে প্রসাদ দেবে ?" মা মিষ্টি হেসে বললেন : "আহা, বাছারা একটু প্রসাদ পেত তাই !" যোগীন-মা হেসে বললেন : "তোমাকে কি আমরা জানি না ? দুনিয়ার সবাইকে পারলে তুমি বসে বসে খাওয়াও। আচ্ছা, তুমি বোসো, আমি দেখছি।" এই বলে যোগীন-মা উঠে গেলেন এবং প্রসাদ এনে আমাদের দিলেন বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য। মায়ের মুখে ফুটে উঠল গভীর তৃপ্তির হাসি। এখন যখন এই সব কথা ভাবি, তখন মনে হয়, মা জগদ্ধাত্রী জগতের পালন করেন, মা অন্নপূর্ণা জগৎকে ভরণ করেন তাই সকলের জন্য তাঁর চিন্তা।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন "রামকৃষ্ণগতপ্রাণা"। তাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা, প্রতিটি চিন্তায় ঠাকুর থাকতেন জড়িয়ে। মা আমার মা-দিদিমাকে বলতেন : "জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে ঠাকুরকে স্মরণ রেখো। তাহলে কোন কষ্টকে আর কষ্ট বলে মনে হবে না। জীবনে দুঃখ-কষ্ট কার বা নেই ? ওসব তো থাকবেই। তাঁর নাম নিলে, তাঁকে আশ্রয় করলে তিনি শক্তি দেবেন ; দুঃখ ও কষ্ট তখন আর তোমার ওপর ছাপ ফেলতে পারবে না।"

বাগবাজারের ('মায়ের বাড়ী'তে) ঐ ছোট্ট বাড়িটির মধ্যে মা যেন বিশ্ব-সংসার পেতে বসে থাকতেন। অত ভক্তের আসা-যাওয়ার মধ্যে প্রত্যেকটি কাজ সুষ্ঠুভাবে চলত। বিকাল হলে যোগীন-মা বা গোলাপ-মা মায়ের চুল আঁচড়ে দিতেন। মায়ের মাথায় ছিল একরাশ কালো চুল, আর সে চুল কি সুন্দর ! মা নিজে যেমন গভীর ঠিক যেন তেমনি গভীর ঘন মায়ের মাথার চুল। দেখে মনে হতো, আকাশ

জুড়ে যেন কালো মেঘ করেছে। তবু তো শেষ বয়সে মায়ের মাথার চুল কমে গেছিল।

মায়ের পা-দুটি ছিল খুব সুন্দর। পায়ের তলায় পদ্মফুলের রক্তাভা। পায়ের গড়নও ছিল খুব সুন্দর। মুখের গড়ন ছিল ভারী মিষ্টি ; চোখ, নাক ছিল অপূর্ব। করুণা আর মমতায় মাখা ছিল মায়ের মুখ, মায়ের চোখ দুটি।

একবার মায়ের ভাইঝি রাধুর চোখে কি যেন পড়েছে। সে দৌড়ে এসে শ্রীশ্রীমায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে বলল ঃ "আমার চোখে কি পড়েছে চোখ জ্বালা করছে। তোমার হাতটা একটু আমার চোখে বুলিয়ে দাও। তাহলেই আমার চোখ ঠিক হয়ে যাবে।" মা সহাস্যে রাধুর মাথাটা তাঁর কোলে আরও কাছে টেনে এনে সযত্নে চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! রাধু বলল ঃ "আমার চোখ ঠিক হয়ে গিয়েছে। আর কিছু নেই চোখে।"

অল্পবয়সী বিধবা মেয়েরা একাদশীতে নির্জলা উপবাস করে থাকবে বা এমনি উপবাস করবে, মা সহ্য করতে পারতেন না। তারা মাথার চুল ছোট করে কাটবে তাও মা চাইতেন না। বয়স্ক বিধবারাও একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করুক, তাও মা চাইতেন না।

মায়ের অনন্ত লীলার কতটুকুই বা বুঝি! যতটুকু দেখেছি, তাও ঠিকমতো লেখা আমার মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও আমার সেই ছেলেবেলায় যা নিজের চোখে দেখেছি, যে-কথাগুলি শুনেছি তার মধ্যে সামান্যমাত্রই মনে রাখতে পেরেছি। আমার সেই দেখা আর শোনার কিছু মুহূর্ত মায়ের কৃপায় সকলের কাছে পৌছে দেবার বাসনায় উপস্থিত করলাম। *

---

* উদ্বোধন, ৯৪ তম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৯৯

শ্রীমা সারদাদেবীর স্মৃতি

সুধীরচন্দ্র সামুই

আমি* অতি শৈশব থেকে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমার স্মৃতি থেকে কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। আমার বাবার নাম সতীশ সামুই। আমার ঠাকুরমা (পিতামহী) মায়ের কাছে 'সতুর মা' নামে পরিচিতা ছিলেন। মায়ের 'নতুন বাড়ি' তৈরি হবার পর থেকে আমার ঠাকুরমা মায়ের বাড়ির পরিচারিকার কাজ করতেন। প্রতিদিন সকালে তাঁর মাটির মেঝের ঘরগুলি প্রলেপ দেওয়া-ও তাঁর নৈশব্যবহৃত বস্ত্রাদি ধৌত করার কাজ আমার ঠাকুরমা করতেন। সেই সুবাদে প্রায় প্রতিদিন আমি ঠাকুরমার সঙ্গে তাঁর কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। শ্রীশ্রীমাও আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখতেন। মায়ের আদেশে পূর্বরাত্রির ঠাকুরের ভোগের কিছু প্রসাদ আমার জন্য তোলা থাকত। সেই লোভেই আমি ঠাকুরমার সঙ্গে মায়ের বাড়িতে প্রায়ই যেতে অভ্যস্ত হই।

আমার বাবা নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু একজন দক্ষ চাষী হিসাবে গ্রামে পরিচিত ছিলেন। মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীমা আমাদের বাড়িতে আসতেন। প্রায়ই তরি-তরকারির প্রয়োজন হতো। তিনি বলতেন ঃ "আমার কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসেছে। কি কি তরকারি (কাঁচা সবজি) কিনতে পাওয়া যাবে ?" প্রয়োজন মতো সবজির কথা বলে তিনি বলতেন ঃ "সতুর মা, তোমার নাতিকে দিয়ে ওগুলি আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও।" আমিও সানন্দে সেগুলি নিয়ে পৌছে দিয়েছি। বাবা নিরক্ষর হওয়াতে সব জিনিসের দাম ঠিক হিসাবমত নিতে পারতেন

---

* লেখকের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী। ডেওপাড়া চম্পামণি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দে ৮৭ বছর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেছেন। —সম্পাদক

না। লোকে তাঁকে প্রায়ই ঠকাত। সেজন্য শ্রীশ্রীমা আমার ঠাকুরমাকে বলতেন : "সতুর মা, তোমার নাতিকে লেখাপড়া শিখিও। ওর লেখাপড়া হবে।" এই বলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁর অসীম আশীর্বাদ না পেলে নিরক্ষর পিতার পুত্র হয়েও যে আমি জয়রামবাটী গ্রাম থেকে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তা কোনদিনই সম্ভব হতো না।

শ্রীশ্রীমার এক পায়ে বাত ছিল। সেজন্য তিনি হাঁটু মুড়ে বসতে পারতেন না। তিনি আমাদের বাড়িতে এলে তাঁকে মাটির দাওয়ায় কম্বল পেতে দেওয়া হতো। তিনি পা ঝুলিয়ে বসতেন। আমি দেখেছি, তিনি তাঁর নতুন বাড়ির ঘরে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন, আর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁর পায়ে পদ্মফুল দিয়ে পূজা করছেন। তখন অবাক হয়ে শিশুসুলভ মনোভাব নিয়ে শুধু ভাবতাম কে তিনি? কেন তাঁকে মহারাজ সাধু-সন্ন্যাসী হয়েও পূজা করছেন? কিছু বুঝবার মতো ক্ষমতা ও বুদ্ধি তখন আমার ছিল না।

তখন গ্রামে পাঠশালা ছিল না। সেজন্য শ্রীশ্রীমা গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করান। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষককে বেতন দেবার ব্যবস্থাও তিনি করেন। তখন বাঁকুড়া থেকে বিভূতি ঘোষ মহাশয় প্রায়ই জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে আসতেন। তিনি বিভূতিবাবুকে 'কালো মাণিক' বলে স্নেহ করে ডাকতেন। গ্রামের দরিদ্র চাষীদের প্রতি তাঁর অসীম দরদ ছিল। শ্রীমাকে বলতে শুনেছি : "বিভূতি, আমোদর নদীতে বাঁধ বেঁধে ঐ জল আহেরে (বর্তমানে মায়ের দিঘিতে) এনে দিলে গ্রামের গরিব চাষীরা উপকৃত হবে। প্রায়ই খরাতে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তুমি চেষ্টা করে জলের ব্যবস্থা করে দিলে অনেকে উপকৃত হবে।" সেই সময় কদলগঞ্জ স্কুলের প্রধানশিক্ষক প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই প্রতি শনিবার মায়ের কাছে আসতেন এবং রবিবার অপরাহ্ণে স্কুলে ফিরে যেতেন। সঙ্গে তাঁর অনেক ছাত্রকেও আসতে দেখেছি। তাদের মধ্যে

ছিলেন 'রামময়' নামে এক অল্পবয়সী ছাত্র। এই রামময় শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ স্নেহভাজন হন। পরে ইনিই স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজ হয়েছিলেন। তিনি যখন সংসার ত্যাগ করার কামনা নিয়ে মায়ের কাছে আসেন তখন তাঁর পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসে তাঁকে সংসারে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কান্নাকাটি করেন। শ্রীশ্রীমা তাঁদের বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। এই দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখার সুযোগ পাই।

ডাকাত আমজাদ মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসত। তাকে দেখে আমাদের খুবই ভয় হতো। কিন্তু শ্রীশ্রীমা তাকে আদর করে বাড়িতে ডেকে তার আঁচলে খাবার দিয়েছেন বহুবার, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

গ্রামে তখন পানীয় জলের কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। একই পুকুরে স্নান ও সেই পুকুরের জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হতো। সেজন্য তিনি পূজনীয় শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) বলে জয়রামবাটী গ্রামে একটি পাকা কূপ-খননের ব্যবস্থা করেছিলেন।

জগদ্ধাত্রীপূজার সময় প্রতি বছর শ্রীশ্রীমা গ্রামবাসীদের সকলকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করতেন এবং নিজে সব ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি গ্রামবাসীর প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসার সীমা ছিল না।

শ্রীশ্রীমা যখন তাঁর ভাইদের বাড়িতে থাকতেন তখন আমার খুবই অল্প বয়স। কাজেই ও বাড়িতে আমার যাতায়াত কমই ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যখনই গেছি তখনই প্রায় নজরে পড়েছে, ক্ষেপী-ঠাকুরানী (রাধুর মা) শ্রীশ্রীমার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। তাঁর মাথায় ছিট ছিল। সেজন্য সকলেই তাঁকে 'ক্ষেপী' বলত। তিনি শ্রীশ্রীমাকে নানা কটুকাটব্য বলে গালাগালি দিতেন। শ্রীশ্রীমা সবই হাসিমুখে সহ্য করতেন। কিন্তু একবার তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হয়। ক্ষেপী-ঠাকুরানী সেদিন একটা বড় কাঠ নিয়ে শ্রীশ্রীমাকে মারতে এসেছিলেন। অসতর্ক মুহূর্তে তিনি ক্ষেপী-ঠাকুরানীকে অভিশাপ দিয়ে ফেলেন। বলেন :

"তোমার ঐ হাত খসে পড়বে একদিন।" কিন্তু পরক্ষণেই গভীর অনুতাপের সঙ্গে বলেছিলেন ঃ "এ আমি কি করলাম!" এই ঘটনার কথা আমার চাক্ষুষ বা স্বকর্ণে শোনা ব্যাপার নয়। এটি আমি পূজনীয়া ইন্দুবালা দেবীর (শ্রীমায়ের সেজভাইয়ের স্ত্রী) মুখে শুনেছিলাম। পরবর্তী কালে আমি দেখেছি, ঐ ক্ষেপী-ঠাকুরানী দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেয়েছেন।

ইতোমধ্যে প্রায়ই বহু ভক্ত ও সাধুদের আগমন বৃদ্ধিতে শ্রীশ্রীমায়ের পক্ষে ভাইদের বাড়িতে বসবাস করা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সেজন্য তাঁর জন্য পৃথক বাড়ি তৈরির প্রয়োজন বোধ করলেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ। কাছেই রামশরণ কর্মকারের পতিত বাস্তুভিটা কেনার ব্যবস্থা এবং সেখানে একটি মাটির বাড়ি তৈরি আরম্ভ হলো। ঐ কাজের তদারক করার জন্য রাসবিহারী মহারাজ ও জ্ঞান মহারাজ (তখন উভয়েই ব্রহ্মচারী) নিযুক্ত হলেন। বাড়ি তৈরি শেষ হলে শ্রীশ্রীমা, রাধুদি এবং নলিনীদি মায়ের নতুন বাড়িতে বাস করতে এলেন। তখন থেকেই আমার ঠাকুরমা ঐ বাড়িতে পরিচারিকা হিসাবে কাজ করতেন এবং আমি প্রায় প্রতিদিন ঐ বাড়িতে যেতে অভ্যস্ত হই।

শ্রীশ্রীমা প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হতেন। তাঁর অসুখের সংবাদ পেলেই উদ্বোধন থেকে শরৎ মহারাজ ডাক্তার কাঞ্জিলালকে নিয়ে কলকাতা থেকে এখানে আসতেন। অসুখে ভুগে ভুগে শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়ায় তাঁর দুধ খাবার প্রয়োজনবোধে একটি দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করা হয়। ঐ গাভীটির রাখালি করার জন্য আমার ছোট মামা রামেন্দ্র ঘোষকে নিয়োগ করা হয়। সে ভাদ্র মাসের সময় একদিন মাঠ থেকে ঘাস কেটে আনতে গেলে তার বাঁহাতের তর্জনীতে বোড়া সাপে কাপড়ে দেয়। বাঁকুড়ার বিভূতিবাবু ও একজন ডাক্তার তার হাতে বাঁধন দিয়ে হাতের আঙুলে ছুরি দিয়ে চিরে রক্ত বার করে দিতে থাকেন। শ্রীশ্রীমা এই সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ "ও বিভূতি, ওসব কেন করছ? ওকে সিংহবাহিনীর মাড়োতে

দিয়ে এস এবং মায়ের স্নানজল খাইয়ে দাও এবং ক্ষতস্থানে মায়ের স্থানের মাটির প্রলেপ দিয়ে দাও। ভাল হয়ে যাবে।" তাই করা হলো। ২/৩ দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে মামা বাড়ি ফিরে এল।

রাধুদিদি ও নলিনীদিদির প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাজপুরের জমিদারবাড়ির ছেলে রাধুদিদির স্বামী মন্মথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ-ভালবাসা লাভ করেছিলেন। তৎকালে তিনি প্রায়ই জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের নতুন বাড়িতে আসতেন ও বেশ কিছুদিন ওখানে থাকতেন। তাঁর কিছু কিছু কুঅভ্যাস ছিল। তিনি গাঁজা খেতেন এবং সন্ধ্যার পর গ্রামোফোন সহযোগে একটা আড্ডার ব্যবস্থা করতেন। এক রাত্রে গ্রামোফোনে গান হচ্ছে। রাত অনেক হয়ে গেছে। শ্রীশ্রীমা নিজে লণ্ঠন হাতে এসে ডাকছেন : "ও মন্মথ, অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি তোমার খাবার নিয়ে বসে আছি।" এই কথা শুনে মন্মথবাবু দ্রুত প্রস্থান করলেন। এই দৃশ্য আমি নিজে দেখেছি।

নলিনীদিদির আচরণ ছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ বিধবার। তিনি শ্রীশ্রীমার উদার আচরণ সহ্য করতে পারতেন না এবং প্রায়ই শ্রীশ্রীমার ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতেন। শ্রীশ্রীমা তদুত্তরে বলতেন : "দেখ, আমি তো আমার ছেলেমেয়েদের প্রতি দুই-দুই আচরণ করতে পারি না। আমার ছেলেমেয়ে সব সমান।"

ঐ বাড়িতে থাকাকালীন শ্রীশ্রীমার আরেক ভাইঝি মাকুদিদির একটি শিশুপুত্র হঠাৎ ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় চিকিৎসার সুযোগ না দিয়ে হঠাৎ মারা যায়। সংবাদ শুনে আমরা ছুটে দেখতে যাই। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখি মাকুদিদির বাবা, নলিনীদিদি ও অন্যান্য আত্মীয়রা খুবই কান্নাকাটি করছেন। ছেলেটিকে শ্রীশ্রীমা খুবই স্নেহ করতেন। তাঁকেও একটু ব্যথিত ও শোকগ্রস্ত দেখলাম। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিতে ও আশ্বস্ত করতে লাগলেন। তাঁর সহনশীলতা দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম!

জয়রামবাটীর বিশ্বাস-পরিবারের বাল্যবিধবা ভানুপিসির সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের প্রীতি ও সখীত্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে দু-চার কথা না বললে আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি লক্ষ্য করতাম, ওঁরা দুজনে প্রায় সবসময় একসাথে থাকতে চাইতেন। উভয়ে একত্রে বাঁড়ুজ্যে পুকুরে প্রতিদিন স্নান করতে যেতেন। বিশেষ পালপার্বণে ওঁরা দুজনে প্রতিবেশিনীদের নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে আমোদর নদীতে স্নান করতে যেতেন। চাষিদের মাঠে কাজ করতে দেখে তিনি বলতেন ঃ "এরা কত কষ্ট করে, তবু দুটি পেট পুরে খেতে পায় না।" শ্রীমা নদীর যে-ঘাটে স্নান করতেন সেই ঘাট বর্তমানে বাঁধানো হয়েছে এবং 'মায়ের ঘাট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

অবসর সময়ে ঐ দুই সখী একসঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাঁরা যেসব কথা বলতেন তা ঠিক বুঝতাম না। তবে তাঁদের কথার দু-চারটি যা এখন মনে আছে তা থেকে পরবর্তী কালে বুঝেছি যে, ওঁরা পরমার্থ বিষয়ে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

প্রসঙ্গতঃ একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমি ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী। ঘটনাটি আজ থেকে ৭৫/৭৬ বছর আগের। সন-তারিখ আমার মনে নেই। তবে সেদিনটি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের অনুষ্ঠিত জগদ্ধাত্রীপূজার দিন। পূজানুষ্ঠান শ্রীশ্রীমার বড় ভাই প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ও বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এজমালি বৈঠকখানায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামবাসীদের সকলকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। এই পূজা উপলক্ষে প্রতিবছর শ্রীশ্রীমা গ্রামবাসীদের সকলকে একদিন আমন্ত্রণ করে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করতেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ানোর জন্য মায়ের মেজভাই কালীকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সংলগ্ন পতিত জমিতে সামিয়ানা খাটিয়ে ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মায়ের পুরনো বাড়িতে স্থানাভাবের জন্য বিহারীলাল ঘোষের বাড়িতে রন্ধনাদি কার্য করা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীমায়ের পিতৃপুরুষের কুলগুরু পাক-মাজিট্যা গ্রামনিবাসী পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতিতীর্থ তন্ত্রধারকের কাজ করছেন এবং পুখুরিয়া গ্রামনিবাসী মায়ের পিতৃপুরুষের কুলপুরোহিত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য স্মৃতিতীর্থ পূজা করছেন। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর বিহিত পূজা শেষ হয়েছে। হোম, আরতি তখনো শেষ হয়নি। মধ্যাহ্ন অতীত। মধ্যাহ্নভোজনের সময় প্রথমে ব্রাহ্মণভোজন, তারপর ব্রাহ্মণ-মহিলাদের ভোজন করানো হবে। তারপর ঐ স্থান পরিষ্কার করে ব্রাহ্মণ ভিন্ন উচ্চবর্ণের লোকদের এবং শেষে অন্যান্য বর্ণের লোকেদের খাওয়ানো হবে। কাজেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণরা পঙ্‌ক্তিতে বসে পড়েছেন। তাঁদের পাতায় ভাত পরিবেশন করা হয়েছে। তরকারি পরিবেশন করা হচ্ছে। ব্রাহ্মণগণ আচমনান্তে আহারে বসেছেন। এমন সময় দুজন ব্রহ্মচারী তরকারি পরিবেশন করার জন্য পঙ্‌ক্তিতে বালতি নিয়ে প্রবেশ করলেন। তাঁদের দেখে ব্রাহ্মণগণ হৈ হৈ করে উঠলেন। তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন। তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন : "ওরা কোন্ জাত ? ওদের কে পরিবেশন করতে বলল ? আমাদের জাত যাবে। আমরা খাব না।" এই বলে সকলে একযোগে অর্ধভুক্ত অবস্থায় পঙ্‌ক্তি থেকে উঠে পড়লেন। এই দৃশ্য দেখে শ্রীশ্রীমা অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে সকলের কাছে মিনতি ও অনুরোধ করতে লাগলেন যাতে ব্রাহ্মণগণ অভুক্ত অবস্থায় চলে না যান। শ্রীশ্রীমার সে কি আকুলি-বিকুলি ! কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কোন কথা শুনতে রাজি নন। মা তখন ভানুপিসির জ্ঞাতি ভাই যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের কাছে গেলেন। তাঁর বাড়ি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ির খুব কাছেই এবং তিনি শ্রীশ্রীমায়ের ভাইদের যজমানও বটেন। আবার দেখলাম, শ্রীশ্রীমা গ্রামের বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিদের অন্যতম রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের বাড়িতে যাচ্ছেন অনুরোধ করতে। এইভাবে তিনি সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যাতে এই গণ্ডগোল মিটে যায় এবং ব্রাহ্মণগণ পুনরায় আহার করেন এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের আহারে ব্যাঘাত না

ঘটে। অল্পক্ষণ মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বৈঠকখানায় গ্রামের প্রধানদের মজলিস বসে গেল। তখন গ্রামে পাঁচজন মুখ্য ব্যক্তি ও জমিদারদের এক প্রতিনিধি মিলে সমস্ত বিবাদের নিষ্পত্তি ও বিচার করতেন। ঐ দিনের মজলিসে জিবটা গ্রামের জমিদার-পরিবারও নিমন্ত্রিত ছিলেন। ঐ মজলিসে জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে শম্ভুনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ঐ মজলিসে ব্রাহ্মণদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাথ মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন। মজলিসে উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণই ছিলেন জয়রামবাটী গ্রামের বাসিন্দা। মজলিসে ব্রাহ্মণেতর অন্যান্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও ছিলেন জয়রামবাটীর অধিবাসী। মজলিসে বাইরের গ্রামের শুধু শম্ভুনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঐ অঞ্চলের পত্তনীদার অর্থাৎ জমিদারের প্রতিনিধি। পত্তনীদার হলেও জিবটা গ্রামের রায়-পরিবার জমিদার হিসাবেই ঐ অঞ্চলে সম্মানিত হতেন এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরূপে অধিকাংশ গ্রাম্য মজলিসে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন।

অনেক আলোচনার পর সমাজপতিরা ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কি চান। কি হলে তাঁরা সকলে পুনরায় আহারে সম্মতি জানাবেন। তাঁরা সকলে বললেন, শ্রীশ্রীমাকে জরিমানা দিতে হবে। শ্রীশ্রীমাকে সেকথা জানানো হলে তিনি জরিমানা দিতে রাজি হলেন। অবশেষে স্থির হলো, শ্রীশ্রীমাকে ২৫ টাকা জরিমানা দিতে হবে। কেউ কেউ বললেন, "জয়রামবাটী গ্রামের চাষারা শ্রীশ্রীমাকে জরিমানা করেছিল।" কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের জরিমানা করেনি।[১]

১ এই ঘটনাটি কিছুটা ভিন্নভাবে স্বামী ঈশানানন্দের 'মাতৃসান্নিধ্যে' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (দ্রঃ ৫ম সং, ১৩৯৬) পৃঃ ৩৩ ঃ পাদটীকা)। স্বামী ঈশানানন্দ ঘটনাটি স্বামী কেশবানন্দের কাছে শুনেছিলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা

বর্তমানে আমি জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছি। কবে ওপার থেকে ডাক আসবে তার অপেক্ষায় আছি। তবে এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে, আমি যখন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন ও পদস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য পেয়েছি তখন মৃত্যুর পর আমার মুক্তি অবধারিত। কেউ তা রোধ করতে পারবে না। *

দেবী' গ্রন্থেও (৪র্থ সং ১৩৭৫, পৃঃ ৩৬০) ঘটনাটি নিবেদিত হয়েছে। বিবরণের সূত্র অবশ্য স্বামী ঈশানানন্দের বর্ণনা। তবে স্বামী ঈশানানন্দের গ্রন্থ অনুসারে পঙ্‌ক্তি থেকে উঠেছিলেন জিবটার জমিদারগণ (জাতিতে সদ্‌গোপ) এবং স্বামী গম্ভীরানন্দের গ্রন্থ অনুসারে উঠেছিলেন ব্রাহ্মণ জমিদারগণ। শ্রীমায়ের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র গণপতি মুখোপাধ্যায়ের মতে লেখকের বিবরণ সঠিক নয়। —সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৯৪ তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৯৯

পুণ্যস্মৃতি

চন্দ্রমোহন দত্ত

এই স্মৃতিনিবন্ধটি লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

—সম্পাদক

আমরা পূর্ববঙ্গীয়। দেশ ছিল অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর মহকুমার অন্তর্গত গাওপাড়া গ্রামে। গ্রামের প্রায় সব পরিবারই ছিল শিক্ষিত বৈদ্য, কেবল আমরাই ছিলাম কায়স্থ দত্ত-পরিবারের। আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার এবং অন্যান্য সচ্ছল গৃহস্থ পরিবারের মতোই আম-কাঁঠালের বাগান ও পুকুর সমেত কয়েক বিঘা জমির ওপরেই ছিল আমাদের বসতবাটী। বঙ্গভঙ্গের অনেক আগেই তা পদ্মাগর্ভে চলে যায়।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দে আমি কলকাতায় আসি চাকরি করব বলে। স্বোপার্জিত অর্থে নিজের খরচ নিজেই চালাব—এই ছিল আমার ইচ্ছা। আমার বয়স তখন তিরিশ বছর। পারিবারিক কোন কথায় আত্মসম্মানে আঘাত পেয়েছিলাম। তাই স্ত্রী ও কন্যাদের দেশের বাড়িতে রেখে কলকাতায় ঠাকুরভাইয়ের (বড়দাদাকে 'ঠাকুরভাই' বলতাম) কাছে আসি। বড়দাদা কালীকুমার দত্ত আমার কলকাতায় আসার অনেক আগেই কলকাতার শোভাবাজারে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন। তিনি রেল কোম্পানীতে চাকরি করতেন।

ঠাকুরভাইয়ের কাছে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই একটা খাবারের দোকানে হিসাব লেখার কাজ পেলাম। বেতন বা খাওয়া-পরা কিছুই পাব না, যাকে বলা যায় নির্জলা apprentice। কয়েক মাস 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে' চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই শোভাবাজারে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে মুদিখানার দোকান খুললাম। বিক্রিবাটা তেমন

নেই। একদিন দেখলাম, দোকানের সামনে দরমার ওপরে ভূষিকালি দিয়ে লেখা একটা কাগজ কে বা কারা টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজে লেখা আছে ঃ "আগামীকাল রবিবার বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব হইবে। আপনারা দলে দলে যোগদান করুন।" রামকৃষ্ণদেবের নাম এর আগে আমি শুনিনি। ধারণা হলো, ইনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ, নইলে এরকমভাবে লিখে জানাবে কেন! কলকাতার উৎসব সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না, তাই উৎসব দেখার খুব ইচ্ছা হলো। জানার আগ্রহ নিয়ে পাশের দোকানে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "মশায়, পরমহংসদেব কে? তাঁর উৎসব বেলুড় মঠে কাল রবিবার হবে, সে-সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা থাকলে আমাকে দয়া করে বলবেন?" বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন ঃ "আপনার দেখছি খুব আগ্রহ! মহাপুরুষদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকা খুব ভাল। হ্যাঁ, আমি গত বছর বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। আপনাকে কি বলব মশায়, যে যত পারে খিচুড়ি, লুচি, বোঁদে, হালুয়া, প্রসাদ খেতে পারে।" জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "বেলুড় মঠ কোথায়? কেমন করে যেতে হয়?" ভদ্রলোক বললেন ঃ "আহিরীটোলা ঘাট থেকে সকাল সাতটায় বেলুড়ে যাবার স্টীমার পাবেন। আপনি তাতে চড়ে চলে যাবেন, কোন অসুবিধা হবে না।"

কলকাতায় আমি খুব বেশিদিন হলো আসিনি। রাস্তা-ঘাট তেমন ভাল চিনি না, তাই দুজন পরিচিত ছেলেকে বললাম ঃ "আগামীকাল বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উৎসব হবে। উৎসবে প্রসাদের ভাল ব্যবস্থা আছে, তোমরা আমার সঙ্গে যাবে?" ওরা রাজি হলো।

পরমহংসদেবের প্রসাদের চাইতে পরমহংসদেবকে দেখার আগ্রহ আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। আমি বাসায় না গিয়ে পাঁচ পয়সার মুড়ি-বাতাসা খেয়ে দোকানের রোয়াকে শুয়ে রইলাম। পরমহংসদেবের উৎসবে যাব—সেই আনন্দ ও উত্তেজনায় ঘুম আসছে

না। কিছুতেই রামকৃষ্ণদেব নামক পরমহংসকে মাথা থেকে সরাতে পারছি না—ঘূর্ণিজলের মতো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে তো খাচ্ছেই! তখন ঠিক করলাম যে, পরমহংসদেব যখন মাথা থেকে যাবেনই না তখন তাঁর কথা চিন্তা করে রাতটা কাটিয়ে দিই। রামকৃষ্ণদেবকে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখেছি, একটা বিরাট মাঠে চলে গেছি। দেখছি, অনেক লোক, কত রকমের আলোর ফুলঝুরি। ভীষণ ভিড় আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ একজন মোটা কালো লোক এসে আমাকে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিল, আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি, পুলিস আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে আর বলছে: "এই ওঠ, ওঠ।" আমি পাহারাদার পুলিসকে বললাম: "কি ব্যাপার, আমাকে ধাক্কা দিচ্ছ কেন?" পুলিস বলল: "তুমি বাইরে শুয়ে আছ কেন? থানায় যেতে হবে।" আমি বললাম: "এটা তো আমার দোকানের রোয়াক।" তাই শুনে আর আমাকে কিছু না বলে পুলিসটি চলে গেল। বাইরে শুয়ে থাকলে সেই সময় পুলিস জিজ্ঞাসাবাদ করত ও সদুত্তর পেলে ছেড়ে দিত।

ভোর হলো। গতরাত্রে যে ছেলে দুজন বেলুড়ে যাবে বলেছিল, তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম; কিন্তু তারা দুজনেই জানাল যে, তারা যেতে পারবে না। আমি একটু দমে গেলাম। দোকানে ফিরে গেলাম। দোকানে ফিরে এসে ভাবছি, যাব কি যাব না। এদিকে যাবার খুব ইচ্ছা। স্বপ্ন দেখার পর ইচ্ছাটা আরও বেড়ে গেছে। অথচ রাস্তা-ঘাট মোটেই চিনি না, অজানা জায়গা বলে একা যেতে সাহসও পাচ্ছি না। যাই হোক, ঠিক করলাম যাব। মনে মনে ভাবলাম, পরমহংসদেবের নাম নিয়ে বেরিয়ে তো পড়ি, তারপর দেখা যাক না কি হয়। হাটখোলার ঘাটে গঙ্গায় স্নান করে একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে রামকৃষ্ণ-নাম স্মরণ করে যাত্রা করলাম আহিরীটোলা ঘাটের দিকে। ঘাটে স্টীমার দাঁড়িয়ে আছে, খুব ভিড়! সকলেই বেলুড় মঠে যাবে দেখে সাহস হলো। দশ পয়সা দিয়ে রিটার্ন টিকিট কেটে স্টীমারে উঠলাম। উঠে ভাবছি, যেন উৎসব দেখতে পারি, প্রসাদ যেন পাই।

বাঁশি বাজল, স্টীমারও ছাড়ল। যাত্রীরা বেশির ভাগই স্কুল-কলেজের ছেলে। তারা রামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি দিতে লাগল। ওদের জয়ধ্বনিতে উদ্দীপিত হয়ে আমিও বলতে লাগলাম : "জয় রামকৃষ্ণদেব কি জয়! জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কি জয়!" জয়ধ্বনি দিতে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলাম। আনন্দের মধ্যে একটা দিব্যভাব অনুভব করতে লাগলাম। মনের চঞ্চলতা বা উদ্বিগ্নভাব কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মনটাও কেমন উদাস হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্টীমার বেলুড় মঠের ঘাটে ভিড়ল। ঘাটে একদল ভক্ত দাঁড়িয়ে স্টীমারের যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বলছে : "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি জয়! জয় স্বামী বিবেকানন্দজী কি জয়!" যাত্রীরাও ওদের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। সমবেত জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

ঘাটে গেরুয়া কাপড়-পরা এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। স্টীমার থেকে যাত্রীরা নেমে একে একে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করছেন। তিনি বলছেন : "জয় রামকৃষ্ণ!" আমিও প্রণাম করলাম, আমাকেও তিনি ঐ কথা বললেন। এরপর সন্ন্যাসী হাত তুলে নাচতে নাচতে বলতে লাগলেন : "জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কি জয়!" আমরাও ওঁর সঙ্গে রামকৃষ্ণ-নামে জয়ধ্বনি দিলাম। তক্ষুণি একদল লোক এসে খোল-করতাল বাজাতে বাজাতে সন্ন্যাসীকে ঘিরে জয়ধ্বনি দিতে লাগল আর নাচতে লাগল। আমি ঐ দিব্যকান্তি জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে আছি আর আমার মন ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠছে। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, উনি স্বামী প্রেমানন্দ। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসের সাক্ষাৎ শিষ্য, স্বামী বিবেকানন্দের গুরু-ভাই। স্বামী প্রেমানন্দের প্রেমের স্পর্শে আমার মনেও প্রেম জেগেছে। মনে মনে বললাম : "স্বামী প্রেমানন্দ! সার্থক তোমার 'প্রেমানন্দ' নাম। তুমি অকৃপণ হাতে সকলকে প্রেম বিতরণ করছ। সেই প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে আমার মনও দুলছে, তোমার প্রেমবারিতে অবগাহন করে আজ আমি শুচি—আমি ধন্য!"

মন্দিরে ভগবান রামকৃষ্ণদেবকে দেখতে যাচ্ছি। পথের একধারে একজন লোক ফুল-বাতাসা বিক্রি করতে বসেছে। আমি এক পয়সা দিয়ে ফুল-বাতাসা কিনে নিলাম। মন্দিরে (পুরনো মন্দিরে) সেই ফুল-বাতাসা ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রণাম করলাম। মন্দির থেকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম কোথায় কি হচ্ছে।

বেলা ১১টা বাজে। গতরাতে পাঁচ পয়সা দিয়ে মুড়ি-বাতাসা কিনে জল খেয়েছি, এখনো পর্যন্ত কিছুই খাইনি। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে থাকায় ক্ষিদে তেমন কিছুই বুঝতে পারিনি। এবার কিন্তু ক্ষিদেটা বেশ জানান দিচ্ছে। গতরাতে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেছিলেন, বেলুড় মঠে প্রসাদ পাওয়া যায়। আমি সেই প্রসাদের সন্ধান করতে করতে দেখতে পেলাম, এক জায়গায় একটি যুবক সরায় করে প্রসাদ দিচ্ছে। আমি গেলে আমাকেও একটি সরা দিল। সরাতে আছে কিছুটা খিচুড়ি, দুটি লুচি ও হালুয়া। এই সামান্য প্রসাদ খেয়ে আমার কিছুই হলো না। আমি বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) লোক। খাওয়ার পরিমাণটা এদেশের লোকেদের চাইতে একটু বেশিই, তার ওপর কাল রাত থেকে পেটে কিছুই পড়েনি, সেখানে একটা সরা তো সমুদ্রে বারিবিন্দুবৎ! তাই আরেকটা সরা চেয়ে নিলাম। না, এতেও কিছুই হলো না। তৃতীয়বার সরা নিতে গেলে একজন সন্ন্যাসী বললেন ঃ "আপনি কিরকম লোক, মশায়! দু-দুবার প্রসাদ নিয়ে আবার এসেছেন। প্রসাদ কেবল আপনার একার জন্য নয়—সকলের জন্য।" সন্ন্যাসীর কথায় লজ্জা পেলাম, অপমান বোধ করলাম; তবে ভীষণ রাগ হলো গতরাতের বৃদ্ধ লোকটির ওপর। উনিই তো বলেছিলেন, ইচ্ছামত প্রসাদ পাবেন। তাইতো আমি বারে বারে নিচ্ছিলাম। বৃদ্ধ লোকটি যদি ঐ কথা না বলতেন তবে তো আমি সকালে বাড়ি থেকে খেয়েই আসতাম, আর ঐ একটা প্রসাদী সরাই যথেষ্ট হতো। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে অমন কথা শুনতে হতো না, আর আমিও সন্ন্যাসীর বিরাগভাজন হতাম না। মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বললাম ঃ "ঠাকুর অনেক আশা নিয়ে তোমার কাছে

এসেছিলাম, কিন্তু অপূর্ণ আশা নিয়েই ফিরে যাচ্ছি।" এই কথাগুলি ঠাকুরকে জানিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে জল খেয়ে স্টীমারঘাটের দিকে হাঁটতে লাগলাম। যাবার পথে দেখতে পেলাম, একটা খেজুরগাছের নিচে কয়েকজন ভদ্রলোক এক ঝুড়ি খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি নিয়ে খাচ্ছে। সেখানে গেলে ওরা আমাকেও একটা শালপাতার ঠোঙা দিল—ঠোঙাতে ছিল খিচুড়ি, তরকারি, চাটনি। আমি তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললাম ঃ "ঠাকুর আমার আশা পূর্ণ হলো না বলে অভিযোগ করেছিলাম। অপূর্ণ আশা যে অর্ধাহারজনিত, তা তুমি বুঝতে পেরে পূর্ণ আহার দিয়ে আমার আশা পূর্ণ করেছ। এখন ভাবছি, তোমার কাছে অভিযোগ করাটা অন্যায় হয়েছিল। তুমি আমাদের কত দিচ্ছ—সেসব না ভেবে স্বার্থপরের মতো বলেছিলাম কি না অপূর্ণ আশা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি! আমি অধম, আমি অকৃতজ্ঞ. আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর।" এই কথা বলে ঠাকুরের উদ্দেশে হাতজোড় করে প্রণাম জানালাম। বিকাল পাঁচটায় স্টীমার ছাড়বে, এখনো ঘণ্টা দুয়েকের মতো সময় আছে। একটা গাছের ছায়ায় চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠিক সময়ে স্টীমারে ফিরে এলাম। কিন্তু মনটাকে রেখে এলাম বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-বৃক্ষের ছায়ায়।

আমার দোকান চলল না। পাততাড়ি গোটাতে হলো। ৫/৬ দিন পর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে বসে ভাবছি, এখন জীবনটাকে কেমনভাবে চালাব? সেই সময় ঠাকুরভাই আমাকে বললেন ঃ "চন্দ্র, তোমার দ্বারা ব্যবসা-ট্যবসা হবে না। চাকরির চেষ্টা কর। আমার পক্ষে তোমাকে রাখাও আর সম্ভব নয়।" ঠাকুরভায়ের মুখে এধরনের কথা শুনতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমরা তো সংসার থেকে ভিন্ন হয়ে যাইনি, তবে এমন কথা ঠাকুরভাই বললেন কেন? তবে কি ঠাকুরভাই আলাদা হয়ে গেছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। খাওয়া-পরার খোঁটা দেওয়ায় অপমানে সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে গেল। বড় ভাইয়ের মুখের ওপর কথা বলা যায় না। আমি চিরকালই একরোখা, গোঁয়ার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম,

আজকের মধ্যেই আমার চাকরি চাই, যদি না পাই তবে কলকাতা ছেড়ে চলে যাব পশ্চিমে, দাদার অন্নজল আর গ্রহণ করব না। জ্যৈষ্ঠমাসের প্যাচপ্যাচে গরমে আর অপমানে মাথাও গরম। পরনে যে-কাপড়খানি ছিল তাই পরে একটা চাদর নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম চাকরির খোঁজে। সম্বল মাত্র পাঁচ পয়সা। পাঁচ পয়সার এক পয়সা দিয়ে গঙ্গার ঘাটের উড়িয়া পাণ্ডাঠাকুরের কাছ থেকে তেল নিয়ে গায়ে-মাথায় মেখে স্নান করলাম। বাকি এক আনা মা-গঙ্গাকে দিয়ে বললাম ঃ "আজকের মধ্যে যদি চাকরি হয় ভাল, নইলে রেলের রাস্তা ধরে যেদিকে দুচোখ যায় পশ্চিমের পথ ধরে চলতে থাকব।" এই কথাগুলো বলে ঘাটের সিঁড়ির ওপরে বসে ভাবছি। সকাল থেকে কিছুই পেটে পড়েনি, খুব খিদে পেয়েছে। কিনে খাবার মতো পয়সাও নেই। যা ছিল তা তেল আর গঙ্গার জলে গেছে। একটা মুদির দোকান থেকে চাল ভিক্ষা করে জল দিয়ে খেলাম। খিদে কিছুটা শান্ত হলো। চাকরির জন্য কয়েকটা দোকানে ও অফিসে ঘুরলাম। কোথাও চাকরি পেলাম না। শেষে চাকরির আশা ছেড়ে দিয়ে নিমতলা ঘাটে এসে বসলাম। ভাবছি, কি করব। মনে পড়ল, বেলুড় মঠে যখন গিয়েছিলাম তখন শুনেছিলাম, রামকৃষ্ণ মিশন বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করে। আমিও তো বিপদের মধ্যেই আছি। আমার চাকরি নেই, হাতে একটা পয়সাও নেই, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও নেই। যা শুনেছি তা যদি মিথ্যা না হয় তবে রামকৃষ্ণ মিশন আমার একটা ব্যবস্থা অবশ্য করে দেবে। বেলুড় মঠে গেছি। বেলুড় মঠে যে রামকৃষ্ণ মিশনের হেড অফিস তাও শুনেছি। কিন্তু বেলুড় মঠ ছাড়া অন্য কোথাও রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা আছে কি না তা তো জানি না। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়-কুটো ধরে বাঁচতে চায়, আমিও সেইরকম শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরেই বাঁচতে চাইলাম; রামকৃষ্ণ-নাম নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের খোঁজে হাঁটতে লাগলাম। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করছি, রামকৃষ্ণ মিশন কোথায়? সঠিকভাবে কেউ বলতে পারছে না। জিজ্ঞাসা করতে করতে চলেছি। তখন একজন ভদ্রলোক বললেন ঃ

"বাগবাজারে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা আছে। হেড অফিস বেলুড় মঠ।" আশার আলো দেখতে পেলাম। বাগবাজারে এসে একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন ঃ "রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে কয়েকজন সাধু থাকেন। তাঁদের কাছে আপনি খোঁজ পাবেন।" রামকান্ত বসু স্ট্রীটে আমার এক আত্মীয় থাকে। সে যাতে আমাকে চিনতে না পারে সেজন্য মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলেছি। তখন বেলা আন্দাজ ১১/১২টা হবে। আত্মীয়ের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলাম, রাজেন (আমার ছোটবোন স্নেহলতার স্বামী রাজেন্দ্রলাল দাস, ওদের ছেলের নাম বঙ্কিম[১]) প্রায় ৩/৪ সেরের মতো মাংস নিয়ে যাচ্ছে। রাজেনের অবস্থা খুব ভাল, বড়বাজারে মশলার দোকান আছে। বলরাম বসুর বাড়ির কাছে গিয়ে দেখি, একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান টুলে বসে আছে। দারোয়ানকে বললাম ঃ "আমি সাধুর সঙ্গে দেখা করব।" দারোয়ান বলল ঃ "কৌন সাধুকা পাশ যায়েগা?" কোন সাধুকেই চিনি না, কারোর নামও জানি না। তাই কোন সাধুর নাম বলতে পারলাম

---

১ বঙ্কিমচন্দ্র দাস—বর্তমানে (১৯৯৪) বয়স ৯০ বছর—১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কনভেনশনের সময় বেলুড় মঠে কর্মিরূপে যোগদান করেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে 'শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী' তথা 'উদ্বোধন'-এ কর্মিরূপে আসেন। তখন থেকেই এখানে আছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান কর্মী। অবসর গ্রহণের পরেও এই বয়সে স্বেচ্ছায় প্রতিদিন কিছু কাজ করেন। স্বামী শিবানন্দের কাছে তাঁর মন্ত্রদীক্ষা। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এবং শ্রীম'—শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাতজন পার্ষদের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তাঁর মামাতো ভাই, চন্দ্রমোহন দত্তের ছোটভাই লালমোহন দত্তের ছেলে যোগেশচন্দ্র দত্ত-ও (বর্তমানে বয়স ৮০ বছর) ছোটবেলা থেকে বলরাম মন্দির ও 'মায়ের বাড়ী'র সঙ্গে যুক্ত। আগে কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করতেন। অবসর গ্রহণের পর ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ থেকে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে 'মায়ের বাড়ী'তে আছেন। এখনো যথেষ্ট কর্মঠ, সদাসন্তুষ্ট, অবিবাহিত যোগেশবাবু মহাপুরুষ মহারাজের শিষ্য। প্রথম জীবনে তিনি স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং শ্রীম'-র সান্নিধ্য লাভ করেছেন। —সম্পাদক।

না। বললাম ঃ "যে কোন একজন সাধুর দেখা পেলেই হবে।" দারোয়ান আমার উসকো খুসকো চেহারা দেখে উটকো লোক ভেবে বলল ঃ "নেহি হোগা ! ভাগো, হিঁয়াসে ভাগো !" বড় বড় থামওয়ালা বাড়ি দেখে এমনিতেই ভয় করে। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতন লাঠি হাতে হিন্দুস্থানী দারোয়ানের কর্কশ ধমকে আর বেশি এগুনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে মনে হলো।

আমার অবস্থা দেখে একজন ভদ্রলোক, মনে হলো পাড়ার লোক, বললেন ঃ "আপনি ১নং মুখার্জী লেনে[২] যান, সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা উদ্বোধন কার্যালয় আছে। ভদ্রলোকের কথামতো কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িটা দোতলা, দরজার পাশে লেখা আছে 'উদ্বোধন কার্যালয়'। দরজার দু-দিকে লাল-সিমেন্টের রোয়াক। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কার্যালয় জেনেও ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না। কারণ ইতিপূর্বে বলরাম বসুর বাড়ির দারোয়ানের কাছে যে-অভ্যর্থনা পেয়েছি তা এর মধ্যেই ভুলে যাইনি। বুকের মধ্যে সেই যে ধুকপুক শুরু হয়েছিল তা এখনো থামেনি। রোয়াকে বসে আছি যদি কাউকে দেখতে পাই। একটি লোককে আসতে দেখে (পরে জানতে পেরেছিলাম, ওর নাম 'মোহন') জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "এই বাড়িটা কি রামকৃষ্ণ মিশনের অফিস ?" মোহন বলল ঃ "হ্যাঁ, এটা রামকৃষ্ণ মিশন, এখানে মা থাকেন আর সন্ন্যাসীরা থাকেন। আপনার কি দরকার ?" লোকটি বেশ বিনয়ী। ঐ হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মতো নয় দেখে সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "যিনি এখানে সবচেয়ে বড় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারব ?" মোহন আমাকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর এসে আমাকে বলল ঃ "চলুন, মা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছে।" 'মা' নিয়ে যেতে বলেছে শুনে অবাক হলাম। ভাবছি, এখানে সন্ন্যাসীরা থাকেন শুনেছি। এখন শুনছি মহিলাও থাকেন ! ঠিক বুঝতে পারছি না

২ বর্তমানে মুখার্জী লেন পরিবর্তিত হয়ে 'উদ্বোধন লেন' হয়েছে।

রহস্যটা কি। বুকের ধুকপুক আবার বাড়ছে। যাই হোক, মোহনের সঙ্গে 'মা'য়ের কাছে গেলাম। প্রথম দর্শনেই মাকে আমার খুব আপন বলে মনে হলো। চোখ দুটি কী শান্ত, আর করুণা যেন ঝরে পড়ছে। আমি মাকে প্রণাম করলাম। মা আমার মাথা স্পর্শ করলেন। আমার নাম, কোথায় বাড়ি, বাড়িতে কে কে আছে—সব জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কথা বলার মধ্যে এমন আপনভাব ছিল যে, আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে সব বলিয়ে নিলেন। সকাল থেকে যা যা করেছি সব বলে গেলাম। ঠাকুরভাইয়ের কথা বলব না ভেবেছিলাম, কারণ ঘরের কথা তো বাইরে বলা যায় না। কিন্তু মাকে আমার পর মনে হচ্ছিল না, বরং আপন মায়ের চাইতেও আপন মনে হচ্ছিল ঐ কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। তাই ঠাকুরভাইয়ের কথা বলতে দ্বিধা করলাম না। সব শুনে মা আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন : "তুমি সবরকমের কাজ করতে পারবে? মান-সম্ভ্রমে বাধবে না তো?" আমি বললাম : "আমি তো মায়ের কাজ করব। সেখানে মান-সম্ভ্রমের প্রশ্ন কোথায়?" মা তখন বললেন : "এখানে আমার কয়েকজন সন্ন্যাসি-ছেলে ও আমরা কয়েকজন মেয়ে থাকি। একজন বাজার করার লোকের দরকার, তবে লোক রাখবে আমার ছেলে শরৎ। তুমি মোহনের সঙ্গে শরতের কাছে যাও।" মায়ের কথামতো মোহন আমাকে বলিষ্ঠ-দেহী শ্যামবর্ণ গম্ভীর এক সন্ন্যাসীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল : "মহারাজ, মা এই ভদ্রলোককে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মা বলেছেন, যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে একে বাজার করার কাজে রাখতে পারেন।" মহারাজ হেসে বললেন : "আমি আর কি রাখব, নিয়োগপত্র তো নিয়েই এসেছ।" মহারাজ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : "কিগো ছেলে, তুমি কি চাও?" অতবড় শরীর এবং ঐ রকম গম্ভীর মানুষের কাছ থেকে যে ধরনের গম্ভীর আওয়াজ আশা করেছিলাম তা তো নয়, এ যে প্রায় মেয়েদের মতো গলা! মহারাজের কথার উত্তর দিতে পারছি না। উত্তর দেব কি, আমি তো ভাবতেই পারছি না আমার চাকরি হয়েছে। সন্ন্যাসীদের কাছে

থাকব—এ-বাসনা যে এত তাড়াতাড়ি বাস্তবে সত্য হবে তা ভাবতেই পারছিলাম না। তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি হলো চুপ করে আছ কেন ?" উত্তর দেব কি , তখনো আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসিনি। মহারাজ কথার পুনরুক্তি না করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর কিশোরী নামে একজন লোককে ডেকে বললেন ঃ "তোমাদের একজন লোকের দরকার বলেছিলে, এই ছেলেটিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে কাজে দেবে।" সেইদিন থেকে মায়ের চরণে আশ্রয় পেলাম। এই জীবনে আর ঐ চরণ-ছাড়া হইনি।

চাকরি পেলাম। মাইনে হলো দশ টাকা। মোহনকে নিয়ে রোজ বাজারে যেতাম। কিছুদিন বাজার করার পর মহারাজ আমাকে উদ্বোধনের বই প্যাক করা ও বিক্রি করার কাজে লাগালেন।

বাংলাদেশের কয়েক জায়গায় তখন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম হয়েছে। সেইসব মিশনে বা আশ্রমে ঠাকুর-স্বামীজীর উৎসব হলে আমি উদ্বোধনের বই নিয়ে বিক্রি করতে যেতাম। মুটে পাঁচু বই নিয়ে যেত। পাঁচু যখন আসতে পারত না তখন আমি বইয়ের প্যাকেট কাঁধে করে নিয়ে যেতাম, অন্য মুটে বা রিক্সা ব্যবহার করতাম না। অবশ্য দূরে যেতে হলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হতো। অযথা মঠের পয়সা খরচ করতাম না। যতটুকু বাঁচবে তা তো মিশনের কাজেই লাগবে। ইতিমধ্যে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে মহামন্ত্র পেয়েছি। এখন উদ্বোধন আর কেবল কর্মক্ষেত্র নয়, গুরুবাড়িও। গুরুবাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করাকেও আমি পুণ্য-কর্ম বলে মনে করি, তাই বইয়ের প্যাকেট কাঁধে করে নিয়ে যাবার সময় মনে হতো, আমি মায়ের চরণ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি। মা আমাকে পরে জপ করার জন্য একটি রুদ্রাক্ষের মালা নিজের হাতে শোধন করে দেন। সেই মালায় আমি নিত্য জপ করি।

আমি মায়ের অনেক ছোট-খাটো কাজও করতাম। মায়ের কাছে আমি যখন-তখন যেতে পারতাম। তাঁর কাছে আমার কোন সঙ্কোচ

হতো না, মা-ও আমার কাছে অসঙ্কোচে কথা বলতেন। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন মা। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে আমাকে ডেকে যখন যা বলতেন, তা-ই পালন করে আমি খুব আনন্দ পেতাম। নিজেকে কৃতার্থ মনে করতাম। একদিন মা আমাকে বললেন : "চন্দু, (মা আমাকে আদর করে 'চন্দু' বলে ডাকতেন) তোমাকে দিয়ে আমার কিছু কাজ করিয়ে নিচ্ছি কেন, জান ? আমি যখন থাকব না তখন এই সব কাজগুলির কথা মনে করে তুমি শান্তি পাবে।" একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন : "আমার সন্তানদের আর জন্ম হবে না। তোমারও আর জন্ম হবে না, এজন্মই তোমার শেষ জন্ম।" শুনে আমি কিছুই বলতে পারিনি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষাও ছিল না আমার মুখে। শুধু চোখের কোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। নিচে নেমে আসার সময় দেখলাম, সিঁড়ির মুখে শরৎ মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। আমার চোখে তাঁর চোখ—সে-চোখে রয়েছে কৌতুকের হাসি। মহারাজ বললেন : "কিহে, ষোল আনা কাজ গুছিয়ে নিলে ! যাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কৃপা পাবার জন্য দিনরাত কত তপস্যা করছে, আর তুমি কি না তাঁর কি একটু-আধটু কাজ করে আসল কাজটিই হাসিল করে নিলে ! যাও, আর ভাবনা কি, এখন ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়াও।" আমি আর কি বলব ! আনন্দে আহ্লাদে আমি তখনো নির্বাক। শুধু চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

জ্যৈষ্ঠ মাস, আম-কাঁঠাল-পাকানো গরম পড়েছে। একদিন আমি খালি গায়ে বই প্যাক করছি। আমার কাঁধে ঘা হয়েছে। খবর এলো—মা ডাকছেন। খালি গায়েই মায়ের কাছে গেছি ! কিছু বলার জন্য মা আমার মুখের দিকে তাকাতেই কাঁধের ঘা দেখতে পেয়ে বললেন : "চন্দু, তোমার কাঁধে ঘা হলো কি করে ?" বললাম : "বইয়ের প্যাকেট কাঁধে করে মাঝে মাঝে নিয়ে যাই, তার ঘষাতেই বোধহয় ঘা হয়েছে, দু-দিন পরেই শুকিয়ে যাবে।" মা বললেন : "পাঁচু কোথায় ?" বললাম : "পাঁচু কয়েকদিন আসছে না।" শুনে তিনি বললেন : "অন্য ব্যবস্থা করনি কেন ?" আশ্রমের পয়সা বাঁচানোর কথা

বলায় তিনি বললেন ঃ "পাঁচু যেদিন আসবে না সেদিন অন্য ব্যবস্থা করবে।" এই কথা বলে একটা ছোট বাটিতে কিছুটা সরষের তেল মন্ত্র পড়ে দিয়ে বললেন ঃ "এই তেলটা ঘায়ের জায়গায় কয়েকদিন মেখো, সেরে যাবে।" কয়েকদিন মাখার পর কাঁধের ঘা একেবারে শুকিয়ে গেল। আর কোনদিন হয়নি।

আমি রামকান্ত বসু স্ট্রীট সেকেণ্ড লেনে[১] মায়ের আদেশমত বাড়ি ভাড়া করে দেশ থেকে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে (ইন্দু ও অমূল্যকে) নিয়ে এলাম। কিন্তু বাড়িওলা লোক হিসাবে বিশেষ সুবিধার ছিল না। প্রায়ই ছেলে-মেয়ের খেলার সরঞ্জাম কখনো নিজে, কখনো বা চাকর দিয়ে ভেঙে ছত্রখান করে দিত। ভাই-বোনের খেলা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ওরা মনমরা হয়ে ঘুরত। শেষে এমন হলো, বাড়িওলাকে দেখলেই ওরা ভয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ত। একদিন শ্রীমাকে বাড়িওলার ব্যবহারের কথা বলায় মা খুব দুঃখ পেয়ে বললেন ঃ "আহা! শিশুদের খেলা বন্ধ করে দিতে ওর মনে একটুও কষ্ট হয় না?" তারপরই শরৎ মহারাজকে ডেকে বললেন ঃ "শরৎ, বাড়িওলা চন্দুর খোকা-খুকির খেলা বন্ধ করে দিয়েছে, তুমি চন্দুর জন্য একটা জায়গা দেখে বাড়ি করে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে দাও। শিশুরা খেলতে পারবে না সে কি হয়!" শ্রীমায়ের ইচ্ছায় আর শরৎ মহারাজের চেষ্টায় বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে[২] সাড়ে সাত কাঠা জমি যোগাড় হলো। শরৎ মহারাজই সবকিছু করে দিলেন। সাড়ে তিন কাঠার ওপর হলো বাড়ি আর বাকি জায়গায় শাক-সবজির বাগান। বাড়ি তৈরির যাবতীয় খরচ ও ব্যবস্থার দায়িত্ব নিলেন শরৎ মহারাজ। নতুন বাড়িতে ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে এলাম। পাকা দেওয়াল, টিনের ছাদ। একটি খুঁটি পুঁতে শরৎ মহারাজ ভিত্তি-স্থাপন করলেন। মা তখন দেশে ছিলেন। মাকে আগেই

---

১ রাস্তাটির বর্তমান নাম নিবেদিতা লেন। —সম্পাদক

২ বর্তমান রাস্তাটির নাম মা সারদামণি সরণি। —সম্পাদক

ভিত্তি-স্থাপনের কথা চিঠিতে লিখেছিলাম। মা উত্তরে (১৫ ফাল্গুন, ১৩২৫) আমাদের লিখেছিলেন ঃ "তোমার পত্র পাইয়া লিখিত সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তোমার বাড়ির খুঁটি পুঁতিবার দিন শরৎ (স্বামী সারদানন্দজী) যে ঠিক করিয়া দিয়াছে তাহাই উত্তম।"[৩] সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিয়ে এলাম গৃহপ্রবেশের দিন। সেদিন শরৎ মহারাজ আসেননি, স্বামী বিরজানন্দ ও অন্যান্যরা এসেছিলেন। তাঁরা ষোড়শোপচারে শ্রীমা ও ঠাকুরের পট পূজা করলেন। চণ্ডীপাঠ এবং রামনামকীর্তনও করলেন। শ্রীমা স্বয়ং নিজের ও ঠাকুরের পট পূজা করে দিয়েছিলেন 'মায়ের বাড়ী'তেই। সেই পট নিয়ে এসে বসানো হলো। আজও বাড়িতে সেই পটের নিত্যপূজা হয়। ঠাকুরঘরে শ্রীমায়ের চুল, নখ, কাপড় রাখা আছে।[৪] বাড়িতে শ্রীমায়ের চরণচিহ্ন বাঁধানো আছে। মায়ের পায়ে দেওয়া পুষ্পাঞ্জলির ফুল, মন্ত্রপড়া হরীতকী ও মায়ের জপ করে দেওয়া রুদ্রাক্ষের মালা আছে। শ্রীশ্রীমা একবার একমুঠো চাল আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "এগুলো চালের গোড়ায় (জালায়) রেখে দিও পুঁটলি বেঁধে। চালের অভাব কোনদিন হবে না তোমাদের।"

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলি, যা আমার স্ত্রীকে ছাড়া কাউকে বলিনি। শ্রীমা কে তা তিনি আমাকে দয়া করে দেখিয়েছিলেন, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি স্বর্গের দেবী, মর্তে মানবী হয়ে জন্ম নিয়েছেন আমাদের উদ্ধার করতে। কাউকে বলিনি, কারণ মায়ের নিষেধ ছিল তাঁর জীবনকালে ঘটনাটি প্রকাশ করার। ঘটনাটি হলো এই ঃ শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে যেতেন তখন কখনো কখনো আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একবার জয়রামবাটী থেকে শ্রীমা কলকাতা

৩ শ্রীশ্রীমায়ের এই পত্রটি 'উদ্বোধন'-এর পৌষ ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক

৪ চন্দ্রমোহন দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, এইগুলি পরবর্তী কালে চুরি হয়ে যায়। —সম্পাদক

ফিরছেন। গরুর গাড়ি করে কোয়ালপাড়া হয়ে বিষ্ণুপুরে যাচ্ছি আমরা। আমার হঠাৎ খুব ইচ্ছা হলো শ্রীমায়ের আসল রূপ দেখার। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মা বিশ্রাম করছেন গাছের ছায়ায়। নিরিবিলি দেখে মাকে একান্তে বললাম ঃ "মা, আপনি আমাকে সন্তানের মতো স্নেহ করেন। আপনার দয়াতেই আমি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বেঁচে আছি; সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে আপনি রক্ষা করছেন, তবুও আমার একটা অতৃপ্ত বাসনা আছে। সেই বাসনা আপনি পূর্ণ করে দিলে আমার মনস্কামনা ষোলকলায় পূর্ণ হয়।" শ্রীমা বাসনাটি জানতে চাইলেন। বললাম ঃ "আপনার আসল রূপ দেখাই আমার শেষ বাসনা।" মা কিছুতেই রাজি হলেন না। অনেক কাকুতি-মিনতি করায় মা গররাজি হয়ে অন্যান্যদের বললেন ঃ "তোমরা একটু সরে যাও। ওর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।" আমাকে বললেন ঃ "দেখ , শুধু তুমিই দেখবে। ওরা কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু আমার আসল রূপ দেখে ভয় পেয়ো না, আর যা দেখবে কাউকে বলবেও না যতদিন আমি বেঁচে থাকব।" এই কথা বলে মা আমার সামনেই নিজমূর্তি ধরলেন। জগদ্ধাত্রী মূর্তি! মায়ের ঐ দিব্য জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখে আমি তো ভয়ে একেবারে কাঠ। মায়ের শরীর থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে। চারদিক জ্যোতির আলোয় আলো হয়ে গেছে। তীব্র আলোর জ্যোতিতে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারই মধ্যে দেখতে পেলাম, মায়ের দুই পাশে জয়া-বিজয়া। আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল, কাঁপুনি আর থামে না। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লাম। শ্রীমা জগদ্ধাত্রীর রূপ সংবরণ করে মানবী হয়ে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন আস্তে আস্তে আমার কাঁপুনি থামল। স্বাভাবিক হয়ে আসতে মা বললেন ঃ "যা দেখলে তা কিন্তু কাউকে বলো না যতদিন আমি বেঁচে আছি।" মাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনার জয়া-বিজয়া কারা? মা বললেন ঃ "গোলাপ আর যোগেন।"

একটি ঘটনা শুনেছিলাম রাসবিহারী মহারাজের (স্বামী অরূপানন্দের) মুখে মায়ের শরীর যাবার বেশ কিছুদিন পর। রাসবিহারী মহারাজ ছিলেন মায়ের সেবক। মা খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। জয়রামবাটিতে একদিন রাসবিহারী মহারাজ মাকে ক্ষোভের সঙ্গে বলছেন ঃ "মা আমার কি জীবন এভাবেই যাবে ?—এই বাড়ি তৈরি, বাজার করা, হিসাব লেখা এসব করে কি হবে আমার ?" মা শান্তকণ্ঠে বললেন ঃ "তা বাবা, আর কি করবে বল। এবার যে এসব করেই তাঁকে লাভ করার পথ করে দিয়ে গেছেন স্বামীজী। নিষ্কামভাবে, তাঁর উপাসনা ভেবে এসব কাজ করলেই মুক্তি হয়ে যাবে। আর কি করতেই বা চাও তুমি ? তপস্যা করতে চাও— হিমালয়ে যেতে চাও ? সেখানে গিয়ে দেখবে, সাধুরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে একটা রুটির জন্য, একটা কম্বলের জন্য ! পাহাড়, জঙ্গলে গিয়ে চোখ বুজলেই কি তিনি এসে যাবেন তোমার সামনে ! তার চেয়ে নরেন এই যে ব্যবস্থা করেছে, এর কি তুলনা আছে ? শুধু তাঁর কাজ ভেবে, তাঁর সেবা ভেবে কাজ করা। আর তুমি যে-কাজ করছ— এসব যে গো আমার কাজ। শুনছ রাসবিহারী, দেখ আমার দিকে চেয়ে।" রাসবিহারী মহারাজ মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সেই বৃদ্ধা সাদামাঠা মহিলাটি, যিনি এতক্ষণ কথা বলছিলেন, তাঁর জায়গায় জ্যোতির্ময়ী এক দেবীমূর্তি বসে আছেন। চারদিক জ্যোতির বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। রাসবিহারী মহারাজ সেই মূর্তির দিকে আর তাকাতে পারলেন না। ভয়ে বিস্ময়ে দুচোখ ঢাকলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শুনলেন সেই চেনা স্বরে মা বলছেন ঃ "ওকি রাসবিহারী, কি হলো তোমার, চোখ বন্ধ করলে কেন ? দেখ, চেয়ে দেখ।" রাসবিহারী মহারাজ চেয়ে দেখেন, সেই আগেকার মা তাঁর অতিপরিচিত চেহারায় তাঁর সামনে বসে আছেন। মুখে সেই পরিচিত মিষ্টি হাসি !

আমাকে লেখা মায়ের চিঠিগুলি[৫] আমি খুব যত্ন করে রেখেছি সাধারণ চিঠি, কিন্তু তার মধ্যে মায়ের অসীম ভালবাসা ছত্রে ছত্রে

৫ চন্দ্রমোহন দত্তকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি চিঠি আশ্বিন, ১৩৮৪ এবং পৌষ, ১৩৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। —সম্পাদক

রয়েছে। একটি চিঠিতে মা আমাকে লিখেছিলেন : "শ্রীশ্রীঠাকুর যাহা করেন তোমাদের মঙ্গলের জন্য, তবে সত্যপথে থাকিবা।" জীবনে অনেক বিপদ-আপদ এসেছে, অনেক সঙ্কট এসেছে ; সবসময় মায়ের কথাগুলি স্মরণ রাখার চেষ্টা করেছি, যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টাও করেছি। আমার বাবার শেষ অসুখের সময় শ্রীমা দেশে ছিলেন। বাবার অসুখের সংবাদ মাকে জানিয়েছিলাম। মায়েরই নির্দেশে আমি বাবাকে দেশ থেকে কলকাতায় আমার বাসায় এনেছিলাম চিকিৎসার জন্য। বাবার ক্যান্সার হয়েছিল। কলকাতার বড় ডাক্তারদের দেখানো হয়েছিল শরৎ মহারাজের ব্যবস্থাপনায়। বাবার মৃত্যু-সংবাদ মাকে জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলাম। মা সেই চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন (২৫ বৈশাখ ১৩২৬) : "তোমার পত্রে তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সুখী হইলাম। কারণ, বৃদ্ধবয়সে তোমার পিতা তোমাদের সকলকে রাখিয়া গঙ্গালাভ করিয়াছেন, সেইজন্য।" বাবার মৃত্যুতে আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম, কিন্তু মায়ের চিঠিটা পাবার পর আমার সব দুঃখ-শোক একমুহূর্তে কোথায় চলে গেল।

একবার বন্যায় পদ্মা আমাদের ঘরবাড়ি সব ভাসিয়ে দেয়। কলকাতায় আমার কাছে সে-খবর এসে পৌঁছাল। বাবা-মা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ আমাদের গোটা পরিবার নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে। কি করব, কাকে বলব কিছু ঠিক করতে পারছি না। মায়ের বাড়িতে রোজ কত খরচাপাতি হয় সে তো আমি জানি। অন্নপূর্ণা- মায়ের দাক্ষিণ্যে সেখানে অভাব কিছু নেই জানি ; কিন্তু দেখেছি, ভক্তদের দেওয়া দান ও প্রণামীতেই মায়ের সংসার চলে। তাই মা অথবা শরৎ মহারাজ কাউকেই আমার দুর্দৈবের কথা সঙ্কোচে বলতে পারিনি। চিন্তায় চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম নেই, খাওয়া-দাওয়ায় মন নেই। কিন্তু অন্তর্যামিনী মা সব টের পেয়েছেন। একদিন আমাকে ডেকে খুব স্নেহ ও মমতামাখা কণ্ঠে মা বললেন : "ভাগ্যের ওপরে তো কারো হাত নেই চন্দু। তুমি অত ভেঙে পড়ো না। তুমি একবার দেশে গিয়ে ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এস। অত চিন্তা করে কি হবে ?

খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছ কেন?" মায়ের কথায় আমার চোখ ফেটে জল এল। আমি বললাম ঃ "কিন্তু মা, আমি ওখানে গিয়ে কি করব? বাড়ি-ঘর যে সব ভেসে গেছে। ব্যবস্থা একটা করতে তো অনেক টাকার দরকার। তাছাড়া যাওয়া-আসার পয়সাও তো আমার কাছে এখন নেই।" করুণাময়ী মা শান্তভাবে বললেন ঃ "আমি সব জানি। তুমি এই টাকা কয়টা নিয়ে বাড়ি যাও। এটি আমার কাছে ছিল। এতে তোমার পথের খরচ এবং বাড়ি তৈরির খরচ সব হয়ে যাবে। তবে আমি যে তোমায় টাকা দিয়েছি তা কাউকে বলবে না। শুধু বলবে, 'বানে বাড়ি ভেসে গেছে খবর পেয়ে বাড়ি যাচ্ছি।' " কথাগুলি বলে মা তাঁর কাপড়ের আঁচলে বাঁধা একতাড়া টাকা আমার হাতে তুলে দিলেন। মায়ের ভালবাসার পরিচয় এরকমভাবে আমার জীবনে কতবার যে পেয়েছি তার হিসাব নেই। শুধু আমি কেন, আরও কতজনকে মা গোপনে এভাবে স্নেহ ও কৃপা বিতরণ করেছেন তার কিছু কিছু সংবাদ আমরা পরে জেনেছি।

একদিন দেবব্রত মহারাজের (স্বামী প্রজ্ঞানন্দের) সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি। সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) হঠাৎ আমাকে বললেন ঃ "চন্দ্র, তুমি তো মায়ের কাছে সবসময় যেতে পার, মাও তোমাকে খুব স্নেহ করেন। একটা কথা বলব—তুমি মাকে বলতে পারবে?" আমি বললাম ঃ "নিশ্চয়ই, বলুন কি বলতে হবে?" সুধীর মহারাজ বললেন ঃ "বেশি কিছু নয়—শুধু ছোট্ট একটি কথা। মাকে গিয়ে বলতে পারবে—'মা আমি মুক্তি চাই'?" আমি বললাম ঃ "এক্ষুনি বলে আসছি।" আমি দৌড়ে ওপরে মায়ের ঘরে গেলাম। গিয়ে দেখি মা পুজো করছেন। কতবার তাঁর ঘরে এসেছি, কিন্তু আজ পূজারতা মাকে দেখে আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল। আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। ভাবছি, ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, কিন্তু সেই শক্তিও আর শরীরে নেই। পা ঠক ঠক করে কাঁপছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, আমি ঘামছি হঠাৎ মা আমার দিকে মুখ ফেরালেন। ইশারায় বললেন ঃ "কিছু বলবে?" আমার গলা দিয়ে কোন কথা বেরুচ্ছে না। মা আবার

ইশারায় বললেন ঃ "কিছু বলতে এসেছিলে?" মুখ দিয়ে শুধু আমার অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে গেল—'প্রসাদ'। মা আঙুল দিয়ে খাটের নিচে রেকাবীতে রাখা প্রসাদ দেখিয়ে দিলেন। দেখিয়ে দিয়েই আবার পুজো করতে শুরু করলেন। কাঁপতে কাঁপতে ঘর্মাক্ত কলেবরে প্রসাদ নিয়ে যখন দৌড়ে নিচে নেমে এলাম, দেখলাম সুধীর মহারাজ আর দেবব্রত মহারাজ খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। বললেন ঃ "কি চন্দ্র, চেয়েছ তো? মা কি বললেন?" কাঁপতে কাঁপতে যা হয়েছে তা তাঁদের জানালাম। গঙ্গাস্নান করতে যাওয়া আর হলো না। স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে সেদিন অনেক সময় লাগে।

আমার জীবনের সব থেকে বড় আক্ষেপ—আমি মায়ের একটি আদেশ পালন করতে পারিনি। আমার প্রথম সন্তান[৬], আমার বড় মেয়ে ইন্দুর (মা তাকে আদর করে 'বড়খুকি' বলে ডাকতেন। আমার ভাই লালমোহনের মেয়ে রানীকে মা ডাকতেন 'ছোটখুকি' বলে।) বিয়ে দিতে মা নিষেধ করেছিলেন। ইন্দু তখন নিবেদিতা স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছে—বয়স ১৫ বছর। আমাদের পাল্টি কুলীন ঘরে ভাল ছেলে পাওয়া যেতে আমার বাবা, ঠাকুরভাই, বড় দিদি, ছোট ভাই অন্যান্যরা ইন্দুকে পাত্রস্থ করতে বলেন। আমি সবকিছু শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করে করতাম। সুতরাং ইন্দুর বিয়ের কথা উঠলে মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। মা সোজা বললেন ঃ "চন্দু, বড় খুকির বিয়ে না দিয়ে লেখাপড়া শেখাও। ও যেমন নিবেদিতা স্কুলে পড়ছে তেমনি পড়ুক।" আমি বাড়িতে এসে মায়ের নির্দেশ সবাইকে জানালাম। বাবা এবং অন্যান্য সকলে বললেন ঃ "তা কি করে হয়? মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে—এখন বিয়ে না দিলে লোকে আমাদের দুষবে। এতবড় আইবুড়ো মেয়েকে স্কুলে পড়ালেই বা লোকে কি বলবে? সমাজ কি বলবে?" আবার মায়ের কাছে গিয়ে এসব কথা জানালাম। মা

---

৬ আসলে দ্বিতীয় সন্তান, প্রথম সন্তান জন্মের কয়েকমাস পরেই মারা যায়। সূত্র ঃ কার্তিকচন্দ্র দত্ত। —সম্পাদক।

বললেন ঃ "ওর বিয়ে দিলে ভাল হবে না, ও তো বেশ পড়ছে—পড়ুক না।" বাড়িতে এসে সব জানালাম, কিন্তু তারপরেও মায়ের কথার ওপর ওঁরা গুরুত্ব দিলেন না; বললেন, "বিধির বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না, যদি ওর ভাগ্যে কষ্ট থাকে সে আমরা কি করতে পারি? কিন্তু এত ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া হলে পরে পস্তাতে হবে। 'জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।' তুমি আমি কে? প্রজাপতির নির্বন্ধ। মেয়ের কপালে সুখ থাকলে সুখ হবে, দুঃখ থাকলে দুঃখ। কপালে যা আছে তাইতো হবে। নিয়তি কে খণ্ডাবে? মেয়ের ১৫ বছর বয়স হলো, এতদিন বিয়ে না দিয়ে রেখেছ, তাতেই তোমার যথেষ্ট অন্যায় হয়েছে। বিয়ে না দিলে, আইবুড়ো সুন্দরী মেয়ে ঘরে রাখলে একটা কিছু অঘটন ঘটলে তখন কি করবে?" ওদের কথা শুনে আমার সব গুলিয়ে গেল। একদিকে গুরুর নিষেধ, যে-গুরু আমার ইষ্ট—আমার জীবন-মরণের মুক্তির নিঃশ্বাস, অন্যদিকে বাবা, কাকা, দিদি, দাদা এবং সমাজের লাল চোখ। শেষে ওঁদের চাপের কাছে হার মেনে নিয়তির হাতেই মেয়ের ভাগ্যকে সঁপে দিলাম। এখানেই মস্তবড় ভুল করলাম আমি এবং সেই ভুলের মাশুল আমাকে আজও দিতে হচ্ছে। বিয়ের বছর কয়েক পরেই আমার মেয়ে বিধবা হয়। দাঁড়িপাল্লার একদিকে গুরুকে বসিয়ে অন্যদিকে সারা বিশ্বসংসার বসালেও তা গুরুর সমান হবে না! আমার গুরু স্বয়ং জগজ্জননী, তিনিই আমার ইষ্ট। তাঁর আদেশ অন্যথা করে আজও তার ফলভোগ করছি। মেয়ে তার চার বছরের কন্যা এবং নয় মাসের পুত্রকে নিয়ে আমার কাছে এসে উঠেছিল।

অবশেষে এল ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের সেই ২১ জুলাই। শ্রীমা চিরদিনের জন্য সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেলেন রামকৃষ্ণলোকে। ভক্তরা জানেন, শ্রীমায়ের মৃত্যু নেই, অদৃশ্যলোক থেকে তাঁর সন্তানদের তিনি চিরকাল মঙ্গলকামনা করবেন, কিন্তু স্নেহময়ী মাকে যে তাঁরা চর্মচক্ষে আর দেখতে পাবেন না। বাঁধভাঙা বন্যার মতো

ভক্তদের গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে। মহাসমাধির আগের দিন অতন্দ্র প্রহরীর মতো সারারাত জেগেছিলেন শরৎ মহারাজ। তাঁর সঙ্গে আমরাও ছিলাম, যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয়। সব প্রয়োজনের অবসান হলো। শ্রীমায়ের মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রার সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম বেলুড় মঠে। চিতায় যখন অগ্নির লেলিহান শিখা ঊর্ধ্বমুখী, তখন গঙ্গার পূর্বপ্রান্তে মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু আশ্চর্য! এই প্রান্তে কোন বৃষ্টি নেই। নিভন্ত চিতায় শরৎ মহারাজ প্রথমে এক কলসী জল দিলেন, অমনি থমকে থাকা বৃষ্টির ধারা হুহু করে এসে চিতাকে ভাসিয়ে দিল। শরৎ মহারাজের জল দেওয়াই প্রথম এবং শেষ—দ্বিতীয় কেউই চিতায় জল দিতে পারেননি। স্বর্গের দেবতারা বুঝি ঢাললেন ধারা।

আমি মায়ের পরেই সবচেয়ে বেশি ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম শরৎ মহারাজকে। মা আমাকে বলেছিলেন ঃ "শরৎ সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নয়, শরৎ সর্বভূতে শুধু ব্রহ্ম দেখে না, সে সব মেয়ের মধ্যে আমাকে দেখে, সব পুরুষের মধ্যে ঠাকুরকে দেখে! শরতের মতো হৃদয় দেখা যায় না, নরেনের পরেই ওর হৃদয়।" বাস্তবিক, তাঁর যেমন বিশাল চেহারা ছিল, তেমনি ছিল বিরাট হৃদয়। কত দুঃস্থ ও গরিব মানুষ, কত দুঃখী মেয়ে, কত অসহায় বিধবাকে যে তিনি গোপনে কতভাবে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। একজন তরুণ সন্ন্যাসী একদিন দেখলেন, শরৎ মহারাজ দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম করে বাইরে বেরুচ্ছেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মহারাজ, আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন ?" মহারাজ বললেন ঃ "হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।" এই বলে তিনি রাস্তায় নামলেন। যুবক সন্ন্যাসীর মনে কৌতূহল হলো—মহারাজ কোথায় যান দেখতে হবে। তিনি দূর থেকে মহারাজকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন। মহারাজ হাঁটিতে হাঁটিতে একটি বস্তির মধ্যে ঢুকলেন। সন্ন্যাসীও পিছনে পিছনে আসছিলেন। শরৎ মহারাজ একটি বাড়িতে ঢুকলেন। সন্ন্যাসী তাঁকে অনুসরণ করে সেই বাড়িটির কাছে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন, একটি

ছোট্টঘরের মধ্যে কঙ্কালসার একটি লোক শুয়ে শুয়ে কাশছে। মহারাজ তার পাশে বসে বুকে হাত দিয়ে বলছেন ঃ "কেমন আছ তুমি ?" লোকটি কাশতে কাশতে বলল ঃ "ভাল আর কই আছি !" মহারাজ সস্নেহে বললেন ঃ "কিন্তু তোমাকে তো আগের থেকে ভাল দেখছি, ওষুধ ঠিকমত খাচ্ছ তো ? ফলগুলো বোধ হয় সব শেষ হয়ে গেছে ?" লোকটি বলল ঃ "ওষুধ খাচ্ছি, ফলও খাচ্ছি কিন্তু আপনি যতই চেষ্টা করুন, যতই ওষুধ আর ফল আমাকে খাওয়ান, আমি জানি, যে-রোগ আমার হয়েছে তাতে আমি আর বাঁচব না।" মহারাজ স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন ঃ "কে বলেছে তুমি বাঁচবে না ! তুমি একেবারে ভাল হয়ে যাবে। এই ওষুধ আর ফলগুলো রেখে যাচ্ছি, তুমি ঠিকমত খাবে।" মহারাজের কথা শুনে লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বলল ঃ "মহারাজ, আপনি মানুষ নন, আপনি দেবতা। এই রোগের ভয়ে আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে। আর আপনি এসে আমার পাশে নির্ভয়ে বসেন। আমার ওষুধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করছেন।" যুবক সন্ন্যাসীটি বাইরে থেকে জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখে আর থাকতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে মহারাজের পায়ে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ "আমি মহা অপরাধী মহারাজ, আমি আপনাকে ঘৃণ্য সন্দেহ করেছিলাম। আমাকে ক্ষমা করুন।" মহারাজ তো সন্ন্যাসীকে দেখে অবাক। শান্তভাবে শুধু বললেন ঃ "সন্দেহ মনে পুষে না রেখে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করে নিয়ে তো ভালই করেছ। এই রকমই তো চাই।"

মহারাজের সেবক স্বামী অশেষানন্দের (কিরণ মহারাজের) কাছেই অনুরূপ একটি ঘটনা শুনেছিলাম। সেটি টেরিটি বাজার এলাকায় এজরা স্ট্রীটের একটি হোটেলে এক অবাঙালী যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির ঘটনা। লোকটির নাম খোকানী। আত্মীয়-পরিত্যক্ত নির্বান্ধব ঐ লোকটিকেও মহারাজ মাঝে মাঝে গোপনে হোটেলে গিয়ে দেখে আসতেন, তার সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে আসতেন। তার বিছানায় বসে তার ছাড়িয়ে দেওয়া ফল নির্বিকারভাবে তিনি খেতেন। হয়তো

কাশতে কাশতেই খোকানী ছুরি দিয়ে ফল ছাড়াচ্ছে এবং কাশতে কাশতেই সেই ফল মহারাজের হাতে তুলে দিচ্ছে।

আমার ওপরে শরৎ মহারাজের দয়ার কথা আর কি বলব ! আজ যে কলকাতায় আমার একটা আশ্রয় হয়েছে, আমি যে খেয়ে-পরে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করছি তার পিছনে অবশ্যই রয়েছে মায়ের কৃপা। কিন্তু মায়ের কৃপা আমার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে শরৎ মহারাজের মাধ্যমে। আমার বাবার শেষ অসুখের সময় কলকাতার বড় বড় ডাক্তারদের দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলাম। তাও সম্ভব হয়েছিল শরৎ মহারাজের ব্যবস্থাপনায়, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। ১৩২৬ সালের ১২ বৈশাখ বাবা বিকেল ৫-৩০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর কয়েকদিন আগে ৩ বৈশাখ বিকালে শরৎ মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন ঃ "একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে এস।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "কোথায় যাবেন, মহারাজ ?" মহারাজ শান্তভাবে বললেন ঃ "তোমার বাবাকে দেখতে।" বাবা তখন শয্যাশায়ী, যে কোনদিন শরীর চলে যাবে এরকম অবস্থা। শরৎ মহারাজ রোজই আমাকে ডেকে বাবার খবর নিতেন। কিন্তু সেদিন শরৎ মহারাজের কথা শুনে আমি বেশ অসহায় বোধ করলাম। কারণ, প্রথমতঃ গাড়িভাড়া দেবার সামর্থ্যও আমার ছিল না, দ্বিতীয়তঃ শোভাবাজারের সামনে শিবমন্দিরের কাছে নন্দরাম সেন লেনের ধারে যে ছোট গলিতে বাবা আছেন সেই গলিতে শরৎ মহারাজের পক্ষে সোজাসুজি হাঁটাও সম্ভব নয়। যে-দুটি কারণে গাড়ি ডাকতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছিলাম সে-দুটি কারণ বাধ্য হয়ে মহারাজকে জানালাম। শরৎ মহারাজ গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ "গাড়িতো নিয়ে এস, তারপর দেখা যাবে।" গাড়ি নিয়ে এলাম। শরৎ মহারাজ এবং আমাকে নিয়ে গাড়ি সেই সরু গলির ধারে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে মহারাজকে নিয়ে গলিতে ঢুকতে গিয়ে দেখলাম, আমি যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই—শরৎ মহারাজ সোজা হয়ে ঐ গলিতে ঢুকতে পারছেন না। আমার তখন খুবই বিব্রত অবস্থা। কিন্তু অবাক হয়ে

দেখলাম, মহারাজ আমার পিছনে কাৎ হয়ে গলি দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছেন। বাড়িতে গিয়ে মহারাজ বাবার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়ালেন। আমাকে বললেন : "আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার বাবার মাথায় দাও।" এই কথা শুনে আমার মন-প্রাণ আনন্দে ভরে উঠল ঠিকই, কিন্তু এতে আমি বিস্মিতও কম হইনি। কারণ, শরৎ মহারাজ কারোর প্রণাম নিতে চাইতেন না। সেই তিনি এই রকম অযাচিত করুণার ভাবে অভিভূত হতে পারেন—এ আমার চিন্তারও বাইরে ছিল। যাই হোক, আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মহারাজের পায়ের ধূলো নিয়ে আমি বাবার মাথায় দিলাম। বাবা শুয়ে শুয়ে হাতজোড় করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। মহারাজ বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন : "আপনার কাশীতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে ?" বাবা মাথা নাড়লেন। কোন্ অর্থে তিনি 'না' বললেন আমি জানি না, তবে আমার মনে হলো, শেষ সময়ে শরৎ মহারাজের মতো শিবতুল্য মহাপুরুষের দর্শন ও আশীর্বাদলাভ করেই বাবার কাশীতে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা তুচ্ছ মনে হয়েছিল।

গাড়ি দাঁড় করানোই ছিল। মহারাজকে নিয়ে উদ্বোধনে ফিরে এলাম। কয়েকদিন পর দুপুরে প্রসাদ পেয়ে অফিসে কাজ করছি। বাইরে থেকে কিছু বইয়ের অর্ডার ছিল। সেগুলি রেলওয়ে পার্শেল করতে শিয়ালদা যাবার জন্য বেরোব। এমন সময় শরৎ মহারাজ এসে বললেন : "কোথায় যাচ্ছ, চন্দ্র ?" আমি বললাম : "বই পার্শেল করতে শিয়ালদা যাচ্ছি।" মহারাজ বললেন : "আগে বাড়ি গিয়ে তোমার বাবা কেমন আছেন দেখে এস, তারপর শিয়ালদা যাবে।" মহারাজের আদেশমত বাড়ি গিয়ে দেখলাম, বাবার নাভিঃশ্বাস শুরু হয়েছে। তাড়াতাড়ি উদ্বোধন-এ ফিরে এলাম মহারাজকে খবর দিতে। মহারাজ তখন বিশ্রাম করছিলেন। আমি ওঁর ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ পাশ ফিরতে গিয়ে আমাকে দেখে মহারাজ বললেন : "কি খবর ? বাবাকে কেমন দেখে এলে ?" আমি কোনরকমে বললাম : "বাবার শেষসময় উপস্থিত।" মহারাজ সঙ্গে

সঙ্গে উঠে ড্রয়ার খুলে কিছু টাকা আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ "বাবার সৎকার করোগে।" সেদিন বিকাল ৫-৩০ মিনিটে বাবা চলে গেলেন। ঐ দিনটি ছিল ১২ বৈশাখ ১৩২৬ সাল। মহারাজ তাঁর ডায়েরীতে ঐদিন লিখেছিলেন ঃ "Chandra's father died at 5-30 P.M."

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে আসার কিছুদিন পর তাঁকে যখন আমি কিছুটা ধারণা করতে পেরেছি তখন একদিন তাঁর কাছে গিয়ে করজোড়ে আবদার করি ঃ "মা, আমি আপনার সেবা করতে চাই।" মা বললেন ঃ "এখানে যেসব কাজ করছ সেসব তো আমারই সেবা, চন্দু।" আমি বললাম ঃ "না মা, ওসব কাজ করেও আমি আপনার সামান্য কোন সেবাও করতে চাই।" মা শান্তভাবে বললেন ঃ "না বাবা, তুমি উদ্বোধনের যে-কাজ করছ সেই কাজই কর। ওটি যেমন আমার সেবা তেমনি ঠাকুরেরও সেবা। সরলাই[৭] তো আমার সেবা করছে। তুমি বরং উদ্বোধনের কাজ করে যখন সময়-সুযোগ পাবে তখন শরতের সেবা করবে। যদি তুমি তাঁর আন্তরিকভাবে সেবা কর এবং শরৎ যদি তোমার ওপরে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে জেনো, তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হবেই হবে। যে কেউ শরৎকে ভালবেসে সেবা করবে, মুক্তি তার কেনা। শরৎ ঠাকুরের গণেশ, শরৎ আমার মাথার মণি। সারা দুনিয়ায় শরতের মতো মহাপুরুষ খুব কম আছে জানবে।"

মায়ের শরীররক্ষার পরে শরৎ মহারাজের মধ্যে আমি মাকেই পেয়েছিলাম। শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেকেই, এমনকি মেয়ে ভক্তরাও শরৎ মহারাজের মধ্যে মাকেই পেয়েছিলেন। শরৎ মহারাজ রামকৃষ্ণময় তো ছিলেনই, পরন্তু তিনি বোধহয় তার চেয়েও বেশি ছিলেন মা-ময়—সারদাময়। স্বামীজী তাঁর যে-নাম রেখেছিলেন 'সারদানন্দ', তা ছিল সম্পূর্ণ সার্থক নাম। আমার জীবনের

---

৭ সরলাদেবী। পরবর্তী কালে শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা—প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা। —সম্পাদক

মহাসৌভাগ্য, আমি এই মহাপুরুষের পদপ্রান্তে আসতে পেরেছিলাম। জীবনের বেশ কয়েকটি বছর তাঁর সান্নিধ্যে, তাঁর সেবায় আমি কাটাতে পেরেছি আমার গুরু, আমার জীবনের আরাধ্যা দেবী, সাক্ষাৎ জগদম্বা শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায়। শরৎ মহারাজ সম্পর্কে তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। *

* উদ্বোধন, ৯৫তম বর্ষ, ৩য়-৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৯৯ - আষাঢ়, ১৪০০

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

চপলাসুন্দরী দত্ত

এই স্মৃতিনিবন্ধটি লেখিকার কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত। —সম্পাদক

আমার স্বামীর নাম চন্দ্রমোহন দত্ত। এক চরম মানসিক ও পারিবারিক অশান্তির মুহূর্তে আমার স্বামীর জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভ ঘটে। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় 'উদ্বোধন'-এ তিনি চাকরি পান। বেতন-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরম সৌভাগ্য ঘটে জগজ্জননীর কৃপা-প্রাপ্তিরও। শুধু আমার স্বামীর যে চাকরি হয়েছিল মায়ের কৃপায় তাই নয়, আজ আমরা যে-বাড়িতে বাস করছি সেই বাড়ি, জমি, বাড়ির আসবাবপত্র সবই তাঁরই কৃপায়। 'মায়ের বাড়ী'তে চাকরি হবার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমা আমার স্বামীকে কৃপা করে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন। আমার স্বামীর প্রার্থনায় মা তাঁকে তাঁর জগদ্ধাত্রী-রূপ দেখিয়েছিলেন। মায়ের শরীররক্ষার পরে স্বামী আমাকে সে-কথা বলেছিলেন। মায়ের নিষেধ ছিল মায়ের জীবনকালে ঐকথা কাউকে বলার। একদিন রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি যে, শ্রীশ্রীমা আমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন। স্বপ্নে-পাওয়া মন্ত্রটি ঘুম ভাঙার পরেও আমি ভুলিনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার স্বামীকে স্বপ্নের কথা বলি। আমরা তখন বাগবাজারে নিবেদিতা লেনে একটা ভাড়াবাড়িতে থাকি। 'মায়ের বাড়ী' থেকে আমাদের বাড়ি খুব কাছে। আমার স্বামী সকালে 'মায়ের বাড়ী'তে গিয়ে মাকে আমার স্বপ্নের কথা বলেন। সব শুনে মা তাঁকে বললেন ঃ "বৌমাকে পাঁচটা হরীতকী নিয়ে গঙ্গাস্নান করে একটা নতুন শাড়ি পরে আমার কাছে আসতে বলো।" আমার নতুন শাড়ি ছিল না। মা একখানা নতুন শাড়ি ওঁর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিন মা কৃপা করে আমাকে দীক্ষা দিলেন।

বললেন ঃ "স্বপ্নে-পাওয়া মন্ত্র আগে জপ করবে, নতুন মন্ত্রটি পরে।"

আমরা যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতাম সেই বাড়ির কর্তা-গিন্নি মানুষ হিসাবে বিশেষ সুবিধার ছিলেন না। আমার বড় মেয়ে ইন্দু (মা তাকে আদর করে 'বড় খুকি' বলে ডাকতেন।) আর বড় ছেলে অমূল্যর বয়স তখন যথাক্রমে ছবছর আর দুবছর। ওরা যখন খেলনা নিয়ে খেলা করত তখন বাড়িওয়ালা অথবা তাঁর স্ত্রী এসে ওদের খেলনাগুলি ছুঁড়ে বাড়ির বাইরে ফেলে দিতেন। বলতেন, বাড়ি নোংরা হচ্ছে। ফলে ভাই-বোনের খেলা বন্ধ হয়ে গেল। কর্তা-গিন্নিকে দেখলেই ছেলেমেয়ে এত ভয় পেত যে, দৌড়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকোতো। কিন্তু কর্তা-গিন্নির ঐ অত্যাচার যে আমাদের কাছে শাপে বর হবে তখন কে জানত! ছেলেমেয়ের বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার বড় কষ্ট হতো। একদিন রাত্রে 'মায়ের বাড়ী' থেকে স্বামী বাড়িতে ফিরে এলে আমি তাঁকে বললাম ঃ "বড় খুকি (ইন্দু) আর অমূল্যর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। একটা বিহিত কর। নিজে যদি কিছু করতে না পার তবে মাকে গিয়ে সব বল। তিনি নিশ্চয়ই একটা পথ বলে দেবেন।" আমার স্বামী পরদিন সকালে গিয়ে মাকে সব কথা বললেন। করুণাময়ী মা সব শুনে তক্ষুণি শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) ডেকে বললেন ঃ "শরৎ, চন্দুর মাথা গোঁজার একটা ঠাই করে দাও। বাড়িওয়ালা শিশুদের খেলতে দেবে না—এ কেমনধারা নিষ্ঠুরতা!" স্বামীকে ডেকে বললেন ঃ "চন্দু, বৌমা আর ছেলেমেয়েকে এখন দেশের বাড়িতে (ঢাকা জেলার গাওপাড়া গ্রামে ছিল আমার শ্বশুরালয়) রেখে এস। বাড়ি হলে একেবারে নতুন বাড়িতে ওদের নিয়ে আসবে।" মায়ের নির্দেশমতো আমার স্বামী আমাদের দেশে রেখে এলেন। শরৎ মহারাজের চেষ্টায় বাগবাজারের বোসপাড়ায় আমাদের বাড়ি হলো। শরৎ মহারাজ নিজে 'ভিত-পুজো' করে দিয়েছিলেন। মহারাজের নির্দেশে গণেন মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি তৈরি করান। তারপর উনি দেশ থেকে আমাদের কলকাতায় নিয়ে এলেন। গৃহপ্রবেশের দিন শরৎ মহারাজ আসেননি, তবে 'মায়ের বাড়ী'র অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীরা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। ঠাকুর ও

মায়ের পট পুজো হলো। একজন সাধু পুজো করলেন। ঠাকুর ও মায়ের পট মা নিজে পুজো করে 'মায়ের বাড়ী' থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পটেই পুজো হলো। আজও সেই পট আমাদের ঠাকুরঘরে নিত্য পূজিত হয়। সেদিন সাধু-ব্রহ্মচারীরা আমাদের নতুন বাড়িতে রামনামসঙ্কীর্তন করেছিলেন। তাঁরা সেদিন আমাদের বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণও করেছিলেন। চাল-ডাল সবকিছুর ব্যবস্থা অবশ্য শরৎ মহারাজ করে দিয়েছিলেন—নেপথ্যে করে দিয়েছিলেন মা স্বয়ং। সেদিন যে কি আনন্দ হয়েছিল তা বলে বোঝানো যাবে না! এখন বয়স হয়ে গিয়েছে। অনেক স্মৃতি, অনেক ঘটনা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছে। যে দু-চারটি মনে আছে সেগুলি বলার চেষ্টা করছি।

আমার স্বামী প্রায়ই 'উদ্বোধন'-এর বইপত্র নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জন্মতিথির উৎসবের সময় বিক্রি করার জন্য বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জায়গায় যেতেন। তখন আমার ছেলেমেয়েরা ছোট, বাজার করে দেবার মতো বাড়িতে কেউ ছিল না। মা এসমস্ত জানতেন, তাই কোন ব্রহ্মচারী মহারাজ বা অন্য কাউকে দিয়ে কাঁচা তরিতরকারি পাঠিয়ে দিতেন। আমার স্বামীকে মা বলতেন ঃ "চন্দু, তুমি যখন বাইরে যাবে বৌমাকে বলো, যা প্রয়োজন হবে বড় খুকিকে পাঠিয়ে বা নিজে এসে যেন আমাকে জানায়।" একদিন 'মায়ের বাড়ী'তে গিয়েছি, যে-শাড়িটা পরে গিয়েছিলাম সেটি নতুনই ছিল। বাড়িতে পেরেক লেগে ছিঁড়ে গিয়েছিল। ছেঁড়া জায়গাটা রিপু করে নিয়েছিলাম। আমি খেয়াল করিনি, ঘোমটার জায়গাটায় রিপু পড়েছিল। মায়ের চোখে ঠিক পড়েছে। মাকে প্রণাম করতে তিনি বললেন, "বৌমা, কাপড় কখনো সেলাই করে পরবে না, মনে রেখো।" সেই থেকে আমি আর কোনদিন সেলাই-করা কাপড় পরিনি। আরেকদিন মা আমাকে বলেছিলেন ঃ "বৌমা, একটা কথা মনে রাখবে—জাতাশৌচ, মৃতাশৌচ এবং কালাশৌচে ঠাকুরের কোন কাজ করবে না, ঠাকুরঘরেও যাবে না।" সেই থেকে অশৌচ হলে

অন্য কাউকে দিয়ে ঠাকুরের পুজো করাই। যতদিন মা স্থূলদেহে ছিলেন, আমাকে কখনো শাড়ি কিনতে হয়নি। মা-ই সব দিয়েছেন। মা চলে যাবার পর শরৎ মহারাজ মায়ের মতোই কোন অভাব আমাদের কখনো বুঝতে দেননি।

রান্নায় হাত পাকিয়েছি ছোটবেলা থেকেই। নারকেল খুব ছোট ছোট করে চিঁড়ের আকারে কেটে চিনি দিয়ে অল্প আঁচে ভাজতাম। খুব সাদা আর মুচমুচে হতো। স্বামীর হাত দিয়ে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতাম। মা কৃপা করে আমার তৈরি ঐ সামান্য জিনিস ঠাকুরের ভোগে দেওয়াতেন। সাধু-ভক্তরা প্রসাদ পেয়ে খুশি হতেন। আমার রান্না মা এবং শরৎ মহারাজ খুব পছন্দ করতেন। আমার তৈরি আমসত্ত্ব, ডালের বড়ি ও কাসুন্দি মা, শরৎ মহারাজ এবং 'মায়ের বাড়ী'র মহারাজরা খুব পছন্দ করতেন। শীতকালে রসপুলি ও পাটিসাপটা তৈরি করে পাঠাতাম। মা দয়া করে তা ঠাকুরকে ভোগ দেওয়াতেন। মাঝে মাঝে 'মায়ের বাড়ী'তে নিরামিষ ও আমিষ দু-একটি পদ রান্না করে পাঠাতাম। মা আমার রান্না খেয়ে বলতেন ঃ "বৌমা বেশ রাঁধে!" একদিন উনুনে কড়ায় ডাল চাপানো আছে। ডাল কিছুটা শুকিয়ে যাওয়ায় ঘটিতে করে জল নিয়ে কড়াতে ঢালার সময় হাত ফসকে ঘটিটা কড়ার মধ্যে পড়ে গেল। কড়ার গরম ডাল চলকে আমার গায়ে, হাতে লাগল। ভীষণ জ্বালা করছে—সহ্যের বাইরে। যন্ত্রণায় চিৎকার করছি। আমার স্বামী ঘরে ছিলেন। ঐ চিৎকারে বেরিয়ে এসে আমার অবস্থা দেখে বড় খুকিকে আমার কাছে রেখে ছুটে মায়ের কাছে গেলেন। মাকে সব বলাতে মা একবাটি সরষের তেল নিয়ে ঠাকুরের নাম জপ করে দিলেন। বললেন ঃ "এটা এখুনি নিয়ে গিয়ে পোড়া জায়গাগুলোতে লাগিয়ে দাও।" উনি এসে তাই করলেন। কি বলব, অদ্ভুত কাণ্ড! কয়েক মিনিটের মধ্যেই অত জ্বালা-যন্ত্রণা কোথায় চলে গেল!

আমার বড় ছেলে অমূল্য ছিল ভয়ানক দুষ্টু। ওর দুষ্টুমিতে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়ির সামনে একটা পুকুর ছিল। সে যখন-তখন সেই পুকুরে নেমে ঝাঁপাঝাঁপি করত। আমি গঙ্গাস্নান

করতে গেলে সে সঙ্গে যাবার জন্য বায়না ধরত। নিয়ে গেলে জলে নেমে জল থেকে উঠতে চাইত না। একদিন মায়ের কাছে গেছি, সঙ্গে অমূল্যও আছে। মাকে ওর দুষ্টুমির বৃত্তান্ত বললাম ঃ "মা, এটাকে একটু শান্ত করে দিন।" মা হেসে বললেন ঃ "বৌমার কথা শোন! ছোট ছেলে দুষ্টুমি করবে না তো কি গোবরগণেশ হয়ে মায়ের আঁচলে সেঁধিয়ে থাকবে? বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ও নিয়ে ভেব না।" আমি বললাম ঃ "ওকে বড় করে তোলাই তো এখন দায় হয়ে উঠেছে। যখন-তখন রাস্তায় চলে যায়, পুকুরে নেমে দাপাদাপি করে। ভয় হয় গাড়ি চাপা না পড়ে—জলে না ডুবে যায়! আপনি দয়া করে কিছু একটা করে দিন, যাতে ওর দুষ্টুমি কমে।" মা হেসে অমূল্যকে কাছে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে আদর করে বললেন ঃ "বৌমা, তোমার অমূল্য আর আগের মতো দুষ্টুমি করবে না।" আশ্চর্য ব্যাপার, অমূল্য তারপর থেকে শান্ত হয়ে গেল! যখন-তখন রাস্তায় বেরনো, পুকুরে দাপাদাপি এরপর থেকে আর দেখা যায়নি।

একবার মা একমুঠো চাল ওঁর [আমার স্বামীর] হাতে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "বাড়িতে চালের জালায় এই চাল কয়টি রেখে দিও। মোটা ভাতের অভাব তোমাদের কখনো হবে না।" মা ওঁকে তাঁর নিজের কেশ, নখ এবং ব্যবহৃত কাপড় দিয়েছিলেন। ওগুলি আমাদের বাড়িতে নিত্য পুজো হয়।[১] মা একদিন ওঁকে বলেছিলেন ঃ "তোমার ভয় কি? তোমার সংসার ঠাকুরের সংসার। শোক, দুঃখ, আধি-ব্যাধি কোন্ সংসারেই বা নেই? ওসব তো থাকবেই। ঠাকুরের কৃপায় ওসব তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।" জীবনে আমরা কয়েকটি খুবই বড় শোক[২] পেয়েছি। কিন্তু দেখেছি, ঠাকুর ও মায়ের আশীর্বাদে আমি

১ লেখিকার কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন ঃ "মায়ের মৃত্যুর [২৫ মে, ১৯৭৫] একমাস আগে ঠাকুরঘর থেকে এগুলি চুরি হয়ে যায়। মৃত্যুকালে মায়ের বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।"—সম্পাদক।

২ কার্তিকচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, তাঁর দিদি ইন্দুবালার বয়স যখন ২৪ বছর, তখন তাঁর জামাইবাবু নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান, আর কখনো বাড়িতে ফিরে আসেননি। তাঁর বড়দা (অমূল্য) মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মা এই দুটি শোক পেয়েছেন। তাঁর বাবার জীবনকালে বড় শোক তাঁর দিদির জীবনের ঐ বিপর্যয়। —সম্পাদক।

ভেঙে পড়লেও উনি কখনো ভেঙে পড়েননি। তখন বুঝেছি, মায়ের আশীর্বাদেই তা সম্ভব হয়েছিল।

আমার দেওর লালমোহন দত্ত-ও আমার স্বামীর সঙ্গে 'মায়ের বাড়ী'তে যেতেন। তিনি উদ্বোধন কার্যালয়ের স্বেচ্ছাসেবী কর্মী ছিলেন। উদ্বোধন-এর বই নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিক্রিও করতেন তিনি। প্রথমে তিনি, পরে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। মায়ের অনেক স্নেহ তিনিও পেয়েছেন। মাকে তিনি বলেছিলেন: "মা, আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে নিজের রোজগারে খেয়ে শরীর যায়।" মা সেই আশীর্বাদ তাঁকে করেছিলেন। তিনি উদ্বোধন-এর কাজ করতে করতেই ৫১ বছর বয়সে মারা যান।

শেষের দিকে মা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। শেষবার যখন মা জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় 'মায়ের বাড়ী'তে এলেন তখন মায়ের শরীর এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, মাকে দেখে আর চেনা যাচ্ছিল না।[৩] শরৎ মহারাজ মায়ের চিকিৎসার কোন ত্রুটি রাখেননি হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, অ্যালোপ্যাথি—সব চিকিৎসাই হলো কলকাতার সবচেয়ে বড় ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই মাকে সুস্থ করে তোলা যায়নি অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ইন্দুর বাবা শেষের দিকে কয়দিন আর বাড়িতে আসতেন না, 'মায়ের বাড়ী'তেই থাকতেন একদিন শেষরাত্রে (২১ জুলাই, ১৯২০) হন্তদন্ত হয়ে এসে আমাদের ডাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন: "মা নেই! তোমরা শেষবারের মতো তাঁর চরণধূলি মাথায় নিয়ে এস।" আমি চিৎকার করে কেঁদে

---

৩ মা শেষবার জয়রামবাটী থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি। মায়ের অস্থিচর্মসার শরীর দেখে গোলাপ-মা ও যোগীন-মা চমকে ওঠেন। ব্যথিত কণ্ঠে তাঁরা মায়ের সঙ্গীদের বললেন: "তোমরা কি মাকেই নিয়ে এলে গো?... কেবল চামড়া ও হাড় কখানি এনে হাজির করলে গো!" (শ্রীমা সারদাদেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৬৪৪)—সম্পাদক

উঠলাম। ওঁরও দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছিল। পাগলের মতো আমি আর ইন্দু উদ্বোধন-এ গেলাম। মায়ের ঘরে মায়ের দেহখানি খাটের ওপরে শোয়ানো আছে। ফুলে, মালায় মায়ের শরীর ঢাকা। সাধু-ব্রহ্মচারীরা, ভক্তরা দলে দলে এসে মাকে শেষ প্রণাম জানাচ্ছেন। সকলেরই চোখে জল। চারদিকের পরিবেশে একটা মহাবিষাদের থমথমে ভাব। আমি আর ইন্দু মায়ের চরণে মাথা রেখে আমাদের শেষ প্রণাম জানালাম। সাধুদের মধ্যে কে যেন বললেন ঃ "চন্দ্রবাবুর স্ত্রীকে মায়ের একটি চরণচিহ্ন দাও।" মায়ের পায়ে আলতা দিয়ে নতুন কাপড়ে ছাপ নেওয়া হয়েছিল। মায়ের সেই মহামূল্যবান চরণচিহ্ন কে একজন আমার হাতে এনে দিলেন! সেটি নিলাম, কিন্তু নেওয়ামাত্র বুকের ভিতরটা উথাল-পাতাল করে উঠল। এতক্ষণে মনে হলো মা সত্যিসত্যিই চলে গেলেন! বুকটা যেন ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর বাড়ির দিকে রওনা হলাম। 'মায়ের বাড়ী'তে তখন আর দাঁড়ানোর জায়গা নেই। ভক্তেরা সব খবর পেয়ে গেছেন। 'মায়ের বাড়ী' লোকে লোকারণ্য। সকলের চোখ জলে ভাসছে। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে ইন্দুর হাত ধরে 'মায়ের বাড়ী' থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে হলো, বাড়িতে সবাই আছেন, 'মায়ের বাড়ী'তেও মা ছাড়া সবাই আছেন, কিন্তু আমার কাছে গোটা জগৎটাই শূন্য হয়ে গেল। *

* উদ্বোধন, ৯৬তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৪০০

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকণা

ইন্দুবালা ঘোষ

আমার বাবার নাম চন্দ্রমোহন দত্ত। আমাদের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশে)। বিক্রমপুরের অন্তর্গত গাওপাড়া গ্রামে আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। ঠাকুরদার নাম কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত। তাঁর পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। আমার বাবা চন্দ্রমোহন দত্ত ছিলেন ঠাকুরদার তৃতীয় সন্তান। সকলের বড় ছিলেন কালীকুমার দত্ত। তিনি রেলে চাকরি করতেন, থাকতেন কলকাতার শোভাবাজারে। বাবা দেশ থেকে কলকাতায় আমার জ্যাঠামশাই কালীকুমারের বাড়িতে আসেন চাকরির সন্ধান করতে। কোনরকম সুবিধা করতে না পারায় একদিন জ্যাঠামশায় বাবাকে বললেন: "টাকা-কড়ি দিতে না পারলে তোমাকে খাওয়াতে পারব না।" বাবা জ্যাঠামশায়কে 'ঠাকুরভাই' বলে ডাকতেন। ঠাকুরভায়ের মুখে এরকম নিষ্ঠুর কথা শুনে নিজের ওপর ধিক্কার এল এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, আজকের মধ্যে যদি চাকরি না পাই তবে রেললাইন ধরে যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব। সেদিন রাস্তায় নেমে এক ভদ্রলোকের কাছে জানতে পারেন রামকৃষ্ণ মিশনে গেলে চাকরি হতে পারে। বাবা মাত্র কদিন আগে রামকৃষ্ণ মিশনের কথা জেনেছিলেন। যাইহোক খোঁজ করতে করতে তিনি উদ্বোধনে আসেন।

উদ্বোধনের ('শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী'র) বাইরের বারান্দায় বাবা বসে আছেন। ওখানকার একজন কর্মী সদর-দরজার কাছে এলে বাবা তাকে বললেন: "এটা কি রামকৃষ্ণ মিশন?" লোকটির নাম মোহন। সে বলল: "হ্যাঁ"। বাবা বললেন: "এখানে যিনি সবচেয়ে বড় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। দেখা হতে পারে?"

মোহন বলল: "আমি ওপরে গিয়ে 'মা'কে জিজ্ঞাসা করে আসি।" মোহন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে বলল: "মা, একজন

ভদ্রলোকের ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।" শ্রীশ্রীমা বললেন ঃ "আমার কাছে নিয়ে এস।" বাবা কাছে যেতে শ্রীশ্রীমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তোমার নাম কি ? দেশ কোথায় ? তুমি কি কাজ কর ?" ইত্যাদি। বাবা নাম ও দেশ বললেন, আর বললেন যে, কাজের চেষ্টা করছেন। শ্রীশ্রীমা বললেন ঃ "তুমি কি এখানে কাজ করবে ?" বাবা বললেন ঃ "আপনি আমায় যে-কাজ দেবেন, আমি সেই কাজ করব।" তখন মা বললেন ঃ "কাল থেকে তুমি এখানে কাজ করবে। তোমাকে বাজারের টাকা দেবে, তুমি মোহনকে সঙ্গে করে নিয়ে বাজারে যাবে। বাজার করে যা পয়সা থাকবে, তুমি নিও, ফেরত দিতে হবে না।" শ্রীশ্রীমা বলায় শরৎ মহারাজও কোন আপত্তি করেননি। বাবাকে শরৎ মহারাজের পছন্দ হয়েছিল। কদিন পর শ্রীশ্রীমা বাবাকে বললেন ঃ "তুমি কাল থেকে এখানেই থাকবে। খাওয়া-পরা-থাকার ব্যবস্থা সবই এখানে। তোমার মাইনে দশ টাকা।" শ্রীশ্রীমা বাবাকে আদর করে 'চন্দু' বলে ডাকতেন। এরপর একদিন বাবাকে বললেন ঃ "যেখানে যেখানে ঠাকুরের উৎসব হবে সেখানেই তুমি উদ্বোধনের বই বিক্রি করতে যাবে।" মুটে ঠিক হলো। তার নাম পাঁচু। বাবা মুটের মাথায় বই তুলে দিতেন। বাবা কোথাও গেলে শ্রীশ্রীমা তাঁর জন্য সরবৎ করে রাখতেন। রোদ থেকে 'চন্দু' যখন ফিরবে তখন খাবে।

একদিন বাবা উৎসবের জন্য বই নিয়ে বাঁকুড়া যাবেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে বললেন ঃ "তুমি তো বাঁকুড়া যাচ্ছ, তোমার মেয়েকে বলে যেও, যখন যা দরকার হবে আমার কাছে যেন আসে।" এর আগে আমরা মা-ভাই-বোনেরা দেশে থাকতাম। বাবাকে একদিন শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ "চন্দু, এবার বৌমাকে আর তোমার ছেলেমেয়েকে কলকাতায় নিয়ে এস।" তখন বাবা আমাদের দেশ থেকে নিয়ে এলেন। আমাদের বিধবা পিসিমাও আমাদের সঙ্গে এলেন। আমরা তখন বাগবাজারে নিবেদিতা লেনে একখানা ঘর ভাড়া করে থাকতাম। ক্রমে বাবার মাইনে হলো ২৪ টাকা। শ্রীশ্রীমা সবসময় আমাদের সাহায্য করতেন। আমার মাকে শাড়ি কিনতে হতো না।

আমার মাকে শ্রীশ্রীমা-ই শাড়ি দিতেন। শুধু আমার মাকেই নয়, আমার বাবার এবং আমাদের সকলের কাপড়চোপড় তিনিই দিতেন।

আমি তখন নিবেদিতা স্কুলে পড়ি। শ্রীশ্রীমা-ই ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা স্কুল তখন ছিল বোসপাড়ার কাঁঠালতলায় এক ভাড়াবাড়িতে। সুধীরাদি (সুধীরা বসু) তখন স্কুলের প্রধান। তিনি একদিন শ্রীশ্রীমাকে স্কুলে নিয়ে আসবেন। তাঁকে ছাত্রীদের স্তবপাঠ, গান ইত্যাদি শোনানো হবে। আমরা লাইন করে দাঁড়িয়ে আছি। শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে স্কুলের ফিটন গাড়িতে করে সুধীরাদি মাকে নিয়ে এলেন। মাকে একটি চেয়ারে বসানো হলো। আমরা সবাই মাকে প্রণাম করার পর স্তবপাঠ, গান ইত্যাদি শোনাচ্ছি। আমি মাঝে মাঝে মায়ের দিকে তাকাচ্ছি। মা আমাকে ইশারা করে তাকাতে বারণ করলেন। সেদিন মাকে পেয়ে সুধীরাদি এবং স্কুলের দিদিমণিদের খুব আনন্দ করতে দেখেছিলাম।

একদিন আমি ও আমার খুড়তুতো বোন রানী [আমার কাকা লালমোহন দত্তের মেয়ে রানীবালা (নাগ)। শ্রীশ্রীমা তাকে আদর করে ডাকতেন 'ছোট খুকি', আমায় ডাকতেন 'বড় খুকি'।] দুজনে উদ্বোধনে গেছি। গোলাপ-মা, যোগীন-মা দুজনেই শ্রীশ্রীমার কাছে সবসময় থাকতেন। গোলাপ-মা খুব রাগী ছিলেন। যোগীন-মা ছিলেন খুব ঠাণ্ডা। গোলাপ-মা আমাদের দেখে বললেন : "এত বেলায় কেন এসেছিস ?" আমরা ঐ কথা শুনে ভয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, বারান্দায় এসে শ্রীশ্রীমা আমাদের ডাকছেন আর বলছেন : "ও খুকিরা, রাগ করিস না, চলে আয়।" মাথা বাড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে মা খুব ডাকছেন। দু-তিন বার আমিও হাত নাড়িয়ে বললাম : "আমরা যাব না, গোলাপ-মা আমাদের বকেছেন।" তারপর বাবা বাড়ি ফিরে এলে তাঁর কাছে শুনলাম যে, শ্রীশ্রীমা বলেছেন : "গোলাপের তো ঐরকম কথা, আমি খুকিদের কত ডাকলাম, কিছুতেই এল না।" বাবা বাড়িতে এসে আমাকে বললেন : "মা কত ডাকলেন, কেন গেলি না ?" আমরা কি তখন অত বুঝেছি, মা কি জিনিস ? আমি তো তখন সবে দশ

বছরের মেয়ে ! আমার পরের ভাইয়ের (অমূল্যচরণ দত্তের) জন্য শ্রীশ্রীমা তিনভরি সোনার গোট হার গড়িয়ে দিয়ে বাবাকে বলে-ছিলেন ঃ "এই হার তোমার ছেলেকে দিলাম, গলায় পরিয়ে দিও।"

আমি মাঝে মাঝেই উদ্বোধনে যেতাম। শ্রীশ্রীমা আমাকে শালপাতা করে মোহনভোগ দিতেন। একদিন স্কুলের মেয়েরা চড়ুইভাতি করবে। চার আনা পয়সা দিতে হবে আমায়। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, উদ্বোধনে গিয়ে মায়ের কাছে চাইব। শ্রীশ্রীমাকে আমি 'ঠাকুমা' ডাকতাম। ওখানে গিয়ে 'ঠাকুমা' বলে ডাকতেই শ্রীশ্রীমা জানতে চাইলেন কেন ডাকছি। চড়ুইভাতি করবার জন্য চার আনা পয়সা দরকার শুনে বাক্স থেকে একটা সিকি এনে আমার হাতে দিলেন। তখন সস্তার দিন ছিল। এক পয়সায় একটা ডিম পাওয়া যেত। আমার মা 'উদ্বোধন'-এ গেলে কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে আমি এবং আমার ভাই অমূল্য থাকতাম। মা যদি কখনো একা যেতেন তাহলে শ্রীশ্রীমা মাকে আমার এবং অমূল্যর কথা জিজ্ঞাসা করতেন।

প্রায়ই স্কুল থেকে ফিরে বলরামবাবুর বাড়িতে গিয়ে ঐ বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে খেলতাম। একদিন উদ্বোধনে গিয়ে দেখি রাধু-দি, মাকু-দি রেশমী চুড়ি পরছে চুড়িওয়ালীর কাছ থেকে। মা আমার দুহাতেও ছয় ছয় করে বারো গাছা চুড়ি পরিয়ে দিতে বললেন। মা আমাকে মাথার পাকা চুল তুলে দিতে বলতেন। আমিও বসে বসে মায়ের পাকা চুল তুলতাম। মায়ের চুল খুব ঘন আর কাঁচা-পাকা, কোঁকড়ানো—কোমর পর্যন্ত ছিল। চুল তোলার পর আমাকে বড় একটা অমৃতি কিংবা সন্দেশ দিতেন। একদিন ঢাকা থেকে কোন ভক্ত মাকে অমৃতি পাঠিয়েছেন। এক-একটি অমৃতির ওজন প্রায় এক পোয়া হবে। আমার হাতে একটি অমৃতি দিয়ে বললেন ঃ "তোমার মাকে গিয়ে দাও।" আমরা তখন গিরিশবাবুর বাড়ির সামনের বাড়িতে ভাড়া থাকতাম। আমি অমৃতি হাতে চলেছি। এমন সময় গিরিশবাবুর বাড়ির কুকুর এসে লাফিয়ে আমার হাত থেকে অমৃতিখানা নিয়ে খেয়ে ফেলল। আমার মাকে দৌড়ে গিয়ে একথা জানালাম। মা (চপলাসুন্দরী দত্ত) তাড়াতাড়ি এসে রাস্তায় যে দু-একটা টুকরো

ও ছেলেমেয়েদের এখন দেশে পাঠিয়ে দাও।" আমরাও তখন দেশে চলে গেলাম। শ্রীশ্রীমা পরে শরৎ মহারাজকে বলেন : "ওদের মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই করে দাও, শরৎ।" শরৎ মহারাজ বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে সাড়ে সাত কাঠা জমি আন্দুল-মৌড়ীর জমিদারদের কাছ থেকে যোগাড় করে দিলেন বাবাকে। সাড়ে তিন কাঠার ওপর বাড়ি হলো। ছাউনির টিনও মায়ের আদেশে শরৎ মহারাজ যোগাড় করে দিলেন। চার কাঠা জমিতে বাগান করা হলো। অনেক রকম গাছ লাগানো হলো বাগানে। তার মধ্যে সরষে গাছও ছিল। শরৎ মহারাজ একদিন বাড়ি দেখতে এসে বললেন : "সরষে গাছ লাগিয়েছ কেন ? বাড়ির জমিতে সরষে গাছ লাগাতে নেই।" বাবা তখনই সেগুলি সব তুলে ফেলে দিলেন।

আমার ঠাকুরদাদার গলায় ঘা হয়েছিল। বাবা শ্রীশ্রীমাকে সে কথা জানালেন। মা সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে বললেন : "তোমার বাবাকে কলকাতায় নিয়ে এস। এখানে কাঞ্জিলাল (জ্ঞানেন্দ্রনাথ), দুর্গাপদ (ঘোষ), শ্যামাপদ (মুখোপাধ্যায়)-এর মতো বড় বড় ডাক্তার আছে। এখানে তাঁর চিকিৎসা করাও।" ঠাকুরদাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হলো। দুর্গাপদ ডাক্তার দেখে বললেন : "ক্যান্সার হয়েছে।" শ্রীশ্রীমা কত ফল পাঠাতেন তাঁর জন্য ! কিন্তু তিনি কিছুদিন পরই মারা গেলেন। ঠাকুরদাদা যখন মারা গেলেন শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। শ্রীশ্রীমাকে চিঠি লিখে খবর দিলেন বাবা। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরদাদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বাবাকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। বেশ কয়েকখানা চিঠিই শ্রীশ্রীমা বিভিন্ন সময়ে বাবাকে দিয়েছিলেন। আমার ছোট ভাই কার্তিক শ্রীশ্রীমায়ের চিঠিগুলি আমাদের বাগবাজারের বাড়িতে বাঁধিয়ে রেখেছে।

শরৎ মহারাজ একদিন আমার মাকে বললেন : "আমরা তো কালিয়া কোরমা কখনো কখনো খাই, এবার তোমার দেশের রান্না খাব।" মা ইলিশ মাছের ভাপা ও ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে মুসুর ডাল রান্না করে উদ্বোধনে পাঠালেন। তারপর মাঝে মাঝেই মা এরকম রান্না করে মায়ের বাড়ীতে পাঠাতেন। একদিন হঠাৎ গরম ডালের হাঁড়িতে

ঘটি পড়ে মার সারা শরীর পুড়ে গেল। মা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। বাবা তাড়াতাড়ি উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে এ কথা জানালেন। শ্রীশ্রীমা সঙ্গে সঙ্গে এক বাটি সরষের তেল নিয়ে জপ করে দিয়ে পোড়া জায়গায় লাগাতে বললেন। ঐ তেল লাগাবার পরই মায়ের যন্ত্রণা কমে গেল।

আমার বাবাকে শ্রীশ্রীমা তাঁর মাথার চুল, নখ এবং কাপড় দিয়েছিলেন। আমার মা ঐগুলিকে নিত্য পুজো করতেন। আমিও মায়ের কাছ থেকে ঐসব বস্তুর কিছু নিজের কাছে নিয়ে এসে এখনো পুজো করি।

এক ভক্ত রাধু-দিকে প্রায় ১৫/১৬ রকমের আচার খেতে দিয়েছিলেন। মা সেই আচারের অর্ধেক আমার বাবাকে দিয়ে বললেন, "বৌমাকে দিও, খাবে। এত আচার কি হবে?"

হঠাৎ বাবা একদিন বললেন, মায়ের শরীর খুব খারাপ। তিনি সেদিন উদ্বোধনেই সারা রাত থাকলেন, সকালে এসে খবর দিলেন ঃ "মা দেহ রেখেছেন।" আমরা তাড়াতাড়ি উদ্বোধনে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরে শুয়ে আছেন। দলে দলে ভক্তরা সব আসছেন, সাধুরা আসছেন। প্রণাম জানাচ্ছেন। আমরাও তাঁকে প্রণাম করে চলে এলাম। তখন আমার বয়স ১৪ বছর ২ মাস, নিবেদিতা স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। শ্রীশ্রীমা দেহ রাখলেন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। আমার বিয়ে হলো ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের বৈশাখ মাসে।

আমি তখন ছোট। শ্রীশ্রীমা একদিন বাবাকে বলেছিলেন ঃ "চন্দু, বড় খুকির (আমার) বিয়ে দিও না, নিবেদিতা স্কুলে লেখাপড়া শেখাও।" বাবা বলেছিলেন ঃ "আমার দাদা, দিদি সব আছেন, দেখি তাঁরা কি বলেন।" যাহোক বাবা আমার বিয়ে দিলেন। তখন আমার বয়স প্রায় পনের বছর। নিবেদিতা স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে স্বামীকে হারাই। পরে বাবা দুঃখ করতেন—"মার কথা শুনলাম না! এখন তো দেখছি, ওকে বিয়ে না দিলেই ঠিক হতো।"[১]

---

১ এই প্রসঙ্গে ইন্দুবালা দেবীর কনিষ্ঠ সহোদর কার্তিকচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন ঃ

বাবা মারা যান ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর দুর্গাপঞ্চমীর দিন। সেদিন দুপুর আড়াইটে নাগাদ বাবা বাড়ির সবাইকে বললেন : "তোমরা এখন এখান থেকে সরে যাও। মা এসেছেন আমাকে নিতে—লালপাড় শাড়ি পরে।" কিছুক্ষণ পরেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন বেলা তিনটে।

শ্রীশ্রীমা আমার বাবাকে রুদ্রাক্ষের জপমালা শোধন করে জপ করার জন্য দিয়েছিলেন। বাবা ঐ মালা জপ করতেন। বাবা মারা যাবার পর আমার মা একদিন সত্যেন মহারাজকে (স্বামী আত্মবোধানন্দকে) জিজ্ঞাসা করলেন, জপের মালা নিয়ে তিনি কি করবেন ? মহারাজ গঙ্গায় দিতে বললেন। মা অবশ্য গঙ্গায় দেননি। শ্রীশ্রীমায়ের নিজের হাতে শোধন করা মালা কি করে গঙ্গায় দেন ! মা পরে ঐকথা আমাকে বললে আমি বলেছিলাম : "ভাগ্যিস ঐ মালা তুমি ফেলে দাওনি, লাখ টাকা দিলেও এ জিনিস পাওয়া যায় না—মায়ের নিজের হাতের জপকরা মালা !" এখন ঐ মালা আমার ছোট ভাই কার্তিকের কাছে রয়েছে।

শ্রীশ্রীমা আমাদের খুব আশীর্বাদ করেছেন। এখনো তাঁর কৃপায় এই ৮৫ (১৯৯১ খ্রীঃ) বছর বয়সে সুস্থ শরীরে চলাফেরা করছি। *

"দিদির যখন চব্বিশ বছর বয়স তখন তাঁর জীবনে একটি চরম বিপর্যয় ঘটে। জামাইবাবু (যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ) একদিন খিদিরপুরে তাঁদের বাসাবাড়ির কাছে বড় গঙ্গায় (পাশেই ছিল আদিগঙ্গা, তাই হুগলী নদীকে ওখানকার লোকেরা 'বড় গঙ্গা' বলত।) স্নান করতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরে আসেননি। তিনি স্নান করতে গিয়ে গঙ্গায় ডুবে যান অথবা নিরুদ্দিষ্ট হন তা জানা যায়নি। স্নান করে ফিরে না আসায় সবাই ভাবেন তিনি নিশ্চয় গঙ্গায় ডুবে গিয়েছেন। তাই গঙ্গায় ডুবুরি নামানো হয়, কিন্তু তাঁর দেহ পাওয়া যায়নি। ঐসময় গঙ্গার ধারে একজন সাধুকে দেখা যায়। তিনি জামাইবাবুর বাড়ির লোকজনদের বলেন : 'ওকে খুঁজে লাভ নেই, ওকে আর তোমরা কোনদিন পাবে না।' তারপর সাধুটি সেখান থেকে চলে যান, তাঁকে পরে আর কোনদিন দেখা যায়নি। এই ঘটনার সময় জামাইবাবুর বয়স ছিল তিরিশ বছর। সেসময় দিদির একমাত্র কন্যা রতনের বয়স চার বছর এবং একমাত্র পুত্র হরির বয়স মাত্র নয় মাস। সতের বছর বয়সে স্বামী সারদানন্দের কাছে দিদি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন।"—সম্পাদক

* উদ্বোধন, ৯৩ তম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৯৮

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা

মনোরঞ্জন চৌধুরী

আজ ৫ বৈশাখ ১৩৬৮, অক্ষয়তৃতীয়া। আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগের কথা। স্কুলের ছুটি। তাই সময় কাটানোর জন্য বন্ধুগৃহে গিয়েছি। বছর খানেক আগে (১৩০৯/১৯০২) স্বামীজী দেহরক্ষা করেছেন। বন্ধু একখানা বই হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন। পড়ে দেখি, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীম কথিত'। প্রথম খণ্ড। এক নিঃশ্বাসে বইখানা শেষ করে বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম ঃ "চমৎকার বই!" ফিরে আসি নোয়াখালি জেলার নোয়াখোলা গ্রামে (বর্তমানে বাংলাদেশে) নিজের বাড়িতে। তারপর খাই-দাই, বেড়াই, পড়াশুনা করি। এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। এর মধ্যে আমার বিবাহ হয়েছে, চাকরিও হয়েছে। প্রথমে চট্টগ্রামে, পরে কক্সবাজারে চাকরিসূত্রে অবস্থান। দ্বিতীয় স্থানে সারারাত জপ-ধ্যান করতাম, আর দিনের বেলা ১০টা-৫টা অফিস চলছিল। নির্জন সমুদ্রতটে, কখনো নিস্তব্ধ পাহাড়ের পাদদেশে ঘুরে বেড়াতাম। রাত্রে বাড়ি ফিরে খেয়ে-দেয়ে শয্যাগ্রহণ। স্বপ্নে বহু সাধু-সন্ন্যাসীকে দেখতাম। একদিন স্বপ্নে দেখি, সমুদ্রতীরে বেশ তন্ময় অবস্থায় আছি। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেলাম, চারদিক আলোময় হয়ে গেছে, মধ্যে নারায়ণ—শ্রীরামকৃষ্ণরূপী। চারদিকে মুনিঋষিরা তাঁর স্তব-স্তুতি করছেন। এমন সময় খেতে ডাক পড়ল। কিন্তু যাব কি করে? আমি যে আমার পা খুঁজে পাচ্ছি না। শেষে টিপে টিপে তবে পা খুঁজে পাওয়া গেল।

এরপরেও বেশ কিছুদিন কেটে গেল। অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে কখন পাহাড়ে বা সমুদ্রতীরে যাওয়া হবে—সেই চিন্তা। আমি ছিলাম মা-কালীর ভক্ত। মাকে দেখব। তাঁর দর্শন হবে—এই ভাবনা মনকে ব্যাকুল করত। দেখতাম, তাঁর স্মরণ-মননে কী আনন্দ!

মনে আনন্দ যেন ধরে না। কখনো আবার চোখে নামে অবিরাম অশ্রুধারা, সে-ধারা আর থামে না। কিন্তু জলে ডুবে প্রাণ আঁটুপাঁটু হলো কৈ? তবে তো মা দেখা দেবেন! নির্জনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। তিনি দয়া করেন। তবে বুঝি আমার ব্যাকুলতা নেই? তবে বুঝি আমি কাঁদতে পারিনি, তবে বুঝি কাঁদতে শিখিনি? মনে হলো, জীবন বৃথা।

একদিন এলাম কলকাতায়। তারপর দক্ষিণেশ্বর হয়ে বেলুড় মঠে। মঠে দেখা হলো স্বামীজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজ (ব্রহ্মচারী জ্ঞান)-এর সঙ্গে। তিনি বললেন: "ধ্যান করবে?" আমি বললাম: "হ্যাঁ, মহারাজ।" স্বামীজীর মন্দিরের কাছে বেলতলা দেখিয়ে দিতে আমি সেখানে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে ধ্যান করে উঠলাম। জ্ঞান মহারাজ আমাকে সঙ্গে করে বেলুড় মঠ ঘুরে দেখালেন। পরদিন সকালে আবার মঠে গিয়েছি। জ্ঞান মহারাজ বললেন: "মাস্টার মশায়ের সঙ্গে পরিচয় আছে?" বললাম: "না, মহারাজ।" এক যুবক ব্রহ্মচারী কলকাতা যাচ্ছিলেন নৌকা করে। জ্ঞান মহারাজ তাঁকে ডেকে বললেন: "একে নিয়ে যাও সঙ্গে করে। মাস্টার মশায়ের বাড়ি দেখিয়ে দেবে।" নৌকায় উঠে পড়া গেল। তারপর বাগবাজারে নৌকা থেকে নেমে ব্রহ্মচারী আমাকে মাস্টার মশায়ের বাড়ি নিয়ে গেলেন। তাঁর কাছে গিয়ে সভয়ে তাঁর পদপ্রান্তে উপবেশন করি। ছোট্ট একটি তক্তপোশের ওপর মুসলমানরা যেভাবে নামাজ পড়তে বসে ঠিক সেইভাবে শ্রীম উপবিষ্ট। তিনি আমার সব কথা শুনে বললেন: "আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, মা হাত তুলে তোমায় ডাকছেন।" খুব কম কথা বলেন। কিন্তু সদা হাস্যমুখ। মুচকি মুচকি হাসছেন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন। বললেন: "মা আছেন জয়রামবাটীতে।" কিভাবে সেখানে যেতে হবে তাও তিনি বলে দিলেন।

পরদিন সকালের ট্রেনে বিষ্ণুপুর গেলাম। ট্রেন থেকে নেমে হোটেলে ভাত খেয়ে গেলাম সুরেশ্বর সেনের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই দেখি, সুরেশ্বরবাবু বেলফুলের বাগান কোপাচ্ছেন। মায়ের বাড়ির

যাত্রী শুনে খুব যত্ন করে রাতে খাওয়ালেন। রাত দশটা নাগাদ গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। সারারাত গাড়ি চলল। সকাল সাতটা নাগাদ কোয়ালপাড়া আশ্রমে এসে পৌঁছালাম। সেখানে স্নান-খাওয়া সারা গেল। ব্রহ্মচারীদের খুব যত্ন। খেয়ে-দেয়ে জয়রামবাটী রওনা হলাম। বিকালের দিকে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে এসে পৌঁছালাম। মাকে উঠানে দেখেই তাঁর পায়ের ওপর আমি লুটিয়ে পড়লাম। চোখের জল আর বাধা মানল না। ঐ অবস্থায় মায়ের চরণে "ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মময়ী, কৃপা, কৃপা" বলে অজস্র অশ্রুবিসর্জন। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আর বললেন ঃ "কৃপার পাত্রই বটে !" মা আমায় মুড়ি, বেগুনী, জিলিপি খেতে দিলেন। সন্ধ্যা হয়ে এল।

আনন্দ, আনন্দ ! যেন আনন্দের হাট বসে গেছে। জলে মাছেরা যেমন আনন্দে ভেসে বেড়ায় তেমনি যেন আমারও আনন্দে ভাসতে ইচ্ছা করছিল। যেদিকে তাকাই আনন্দ বৈ আর কিছু নেই। যেন চোখে ন্যাবা লেগে গেছে ! মায়ের ভাষায়, চারিদিক যেন "আনন্দের ঘট পূর্ণ" হয়ে গিয়েছে। আমারও চারিদিক আনন্দময়। রাত্রে ভরপেট খেয়ে ঘুম। খুব ভোরে প্রাতঃকৃত্য ও হাত-মুখ ধোয়ার জন্য বাড়ির বাইরে গেলাম। মায়ের জপ-ধ্যান তার আগেই শেষ হয়ে যায়। পরে শুনেছিলাম, জনৈক ব্রহ্মচারীকে তিনি বলেছিলেন ঃ "চট্টগ্রাম থেকে গত সন্ধ্যায় যে-ছেলেটি এসেছে তাকে ঘুম থেকে তুলে দাও।" ব্রহ্মচারী আমাকে ঘরে না পেয়ে মাকে বললেন ঃ "কাউকে তো দেখছি না।" মা বললেন ঃ "আবার খোঁজ। আমি ওর জন্য অপেক্ষা করছি।" এদিকে যদৃচ্ছাক্রমে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ভানুপিসির বাড়িতে এসে আমি উপস্থিত। পিসি দুধের কড়াই-চাঁচছেন ঝিনুক দিয়ে। একটা বল বানিয়েছেন চাঁছিগুলি দিয়ে। আমি ঢুকতেই তিনি বললেন ঃ "গোপাল, ছানা খাবে ?" অমনি হাঁটু গেড়ে হাত পেতে বলটা নিয়ে মনের আনন্দে খাচ্ছি। পিসি বললেন ঃ "কী অনুরাগ-বাঘেই ধরেছে গো !" জ্ঞানী মানুষ। দেখেই অবস্থা বুঝে ফেলেছেন। ঠিক তখনই হরিপ্রেম মহারাজ (তখন ব্রহ্মচারী) এসে বললেন ঃ "আপনি এখানে ? মা আপনাকে খুঁজছেন।" তাড়াতাড়ি

হাতের বলটা গলায় পুরে দৌড় দিলাম। গিয়ে দেখি, মা পূজা সেরে অপেক্ষা করছেন। আমি যেতেই বললেন : "দীক্ষা নেবে ?" বললাম : "মা, আমি কিছু জানি না। সব তোমার ইচ্ছা।" "যাও স্নান করে এস"—বলে মা ডানদিকে মায়ের কুটিরের পূর্বদিকের পুকুরটা দেখিয়ে দিলেন। তাড়াতাড়ি পুকুরে ডুব দিয়ে মায়ের কাছে এসে আমি হাজির হলাম। শ্রীম আমায় বলে দিয়েছিলেন : "মায়ের জন্য একখানা লাল নরুনপেড়ে কাপড়, একটি টাকা আর কয়েকটা জবাফুল নিয়ে যেও।" নিয়ে গিয়েছিলাম। স্নান করে সেগুলি মাকে দিলাম। মা আমাকে দীক্ষা দিলেন। নিজ আঙুলে জপ করে করজপ করা শেখালেন। ঠাকুরের ছবির দিকে হাত দেখিয়ে বললেন : "উনিই তোমার ইষ্ট।" দীক্ষার পর মাকে প্রণাম করে ওঠার সময় স্পষ্ট দেখলাম, মা নন—মায়ের জায়গায় বসে আছেন মা-কালী স্বয়ং ! আবার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লাম চেতনা হারিয়ে।

আমার পরে আরেক জনেরও দীক্ষা হলো। সে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল : "মা, উনি কি সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন ?" তার উত্তরে মা বলেছিলেন : "না, ওর কিছু ভোগ বাকি আছে।"

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ। সেদিন রাত্রেও আমার মাতৃগৃহে থাকার সৌভাগ্য হলো। পরদিন প্রাতে খোকা মহারাজ (স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ) কামারপুকুরে যাচ্ছেন। মাকে বললাম : "খোকা মহারাজের সঙ্গে যাব ?" মা অনুমতি দিতেই মহারাজের সঙ্গে কামারপুকুর রওনা হলাম। কামারপুকুরে রামলালদাদা আর লক্ষ্মীদিদিকে দেখলাম। খেয়েদেয়ে রামলালদাদার কাছে ঠাকুর ও মায়ের কিছু গল্প শুনে মায়ের বাড়িতে ফিরে এলাম। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, ভুবনেশ্বর মঠে রাজা মহারাজের দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করার সুযোগও আমার পরে হয়েছিল।

তারপর আবার সেই পূর্বের মতো জীবনযাপন। বেশ কিছুদিন পর অমৃতবাজার পত্রিকায় একদিন দেখলাম, মা দেহরক্ষা করেছেন। এগারো দিন অশৌচ পালন করলাম। বারো দিনের দিন খুব ভোরেই

থালা, বাটি, ঘটি ইত্যাদি ব্রাহ্মণকে দান করলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভোগ দিয়ে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করলাম। পাতানো মা তো নয়, আপন মা যে! জন্মজন্মান্তরের মা যে! তাই তো এসব করা।

তারপর বহু বছর কেটে গেছে। আজ দেখছি, মরদেহে অবর্তমান হলেও মা আমার কাছে, আমার জীবনে নিত্য আরও জীবন্ত হয়ে উঠছেন।*

* উদ্বোধন, ৯৫ তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৪০০। অনুলিখন : পরিতোষ মজুমদার। পরিতোষ মজুমদার মনোরঞ্জন চৌধুরীর জামাতা। —সম্পাদক

তিনটি অলৌকিক ঘটনা

শ্রীশচন্দ্র সান্যাল

আমার পরিচিত শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীশচন্দ্র ঘটকের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে তিনটি অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছি। ১৩১৭ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে রমণীমোহন ভট্টাচার্য (স্বামী জগদানন্দ), শ্রীশচন্দ্র ঘটক, প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জয়রামবাটী যান শ্রীমাকে দর্শন করার জন্য। তাঁদের একজনের দীক্ষা আগেই হয়েছিল, বাকি তিনজনের মনে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা নেবার বাসনা ছিল তাদের মধ্যে দুজন মনে মনে খুব চাইছিলেন দীক্ষার আগে শ্রীমায়ের অলৌকিক শক্তির কিছু প্রকাশ দেখতে। শ্রীমায়ের চরণপূজা করার বাসনায় একদিন সকালে সেই দুজন গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়লেন পদ্মফুল সংগ্রহ করতে। কিন্তু গ্রামে তাঁরা কোথাও পদ্মফুল পেলেন না। খুঁজতে খুঁজতে উপস্থিত হলেন পাশের গ্রামে। সেই গ্রামের শেষপ্রান্তে দেখলেন একটি ছোট পুকুর। সেখানে বেশ কিছু পদ্ম ফুটে ছিল। জয়রামবাটীতে তখন ভীষণ কালাজ্বর-ম্যালেরিয়ার প্রকোপ তাঁরা ইতস্ততঃ করছেন পুকুরে নামবেন কিনা। ঠিক সেই সময়ে সেখানে এক বৃদ্ধা এসে উপস্থিত। সে বলল: "বাবা, পদ্মফুল নেবে? আমি তুলে দিচ্ছি।" এই বলে বৃদ্ধা পুকুরে নেমে অনেক পদ্মফুল তুলে নিয়ে এসে তাঁদের দিল। তাঁরা খুব খুশি। তারা বললেন: "আমরা তোমাকে কিছু পয়সা দেব।" কিন্তু তাঁরা দেখলেন, যে-জামাতে তাঁদের পয়সা ছিল, ভুলক্রমে সে-জামা তাঁরা পরে আসেননি। বৃদ্ধাটি সব শুনে বলল: "তাতে কি হয়েছে বাবা? বিকেলে এখানে এসে দিয়ে যেও।" কিন্তু বিকেলে তাঁরা সেই জায়গাতে গিয়ে বৃদ্ধার কোন খোঁজ পেলেন না। এমনকি সেই পুকুরটিও দেখতে পেলেন না তাঁরা আশপাশের লোকজনদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলেন,

সেখানে ঐরকম কোন বৃদ্ধা থাকে না এবং ঐখানে কোন পুকুরও কখনো ছিল না। আমার মনে হয়, তাঁদের মনে মায়ের অলৌকিক শক্তির প্রকাশ দেখার যে বাসনা হয়েছিল তা পূরণ করার জন্যই 'অঘটন-ঘটন পটিয়সী' মা এই রকম একটি ঘটনা ঘটালেন।

আর একবার শ্রীশচন্দ্র ঘটক, সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত বড়দিনের সময় শিলং থেকে জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে আসছেন। পথে আসতে আসতে তাঁদের সাধ হয়েছে জয়রামবাটীতে মায়ের কাছে পিঠে খাবার। পরস্পরের সঙ্গে সেই নিয়ে আলোচনা করলেন কিন্তু অপর কাউকে বলেননি। জয়রামবাটীতে পৌঁছাবার পর যখন তাঁরা প্রসাদ খেতে বসেছেন তখন তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন সেদিন প্রসাদে পিঠেও রয়েছে। শুধু তাই নয়, যখন পিঠে পরিবেশন করা হলো তাঁদের পাতেই প্রথম পিঠে পড়ল। বিস্ময়ে ও আনন্দে ঐ ভক্তদের হৃদয় তখন অভিভূত, চোখ অশ্রুসিক্ত।

ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আদর্শের প্রতি অনুরাগী ভক্তরা মিলে শিলং-এ একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে নিয়মিত কথামৃতপাঠ, ভক্তি-সঙ্গীতাদি হতো। একবার ওঁরা অবিশ্রান্ত মাতৃসঙ্গীত শুরু করলেন। শ্রীশ্রীমা তখন উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ী'তে। ওরা অবশ্য শ্রীশ্রীমাকে কিছু জানাননি। দু-তিন দিন ধরে খুব মাতৃসঙ্গীত চলছে ; এ দিকে কলকাতায়, 'মায়ের বাড়ী'তে শ্রীশ্রীমা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এক সেবককে ডেকে তিনি বললেন : "আর পারি না। শিলং-এর ভক্তদের ভজন-কীর্তনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল যে! ওদের থামতে বল। টেলিগ্রাম করে দাও।"*

---

* শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীশচন্দ্র সান্যাল তাঁর এই লেখাটি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দকে দিয়েছিলেন ২১ জুলাই ১৯৮৫। লেখাটিতে তাঁর স্বাক্ষরের তারিখও ঐ দিন। —সম্পাদক

মায়ের করুণাকাহিনী

ধীরেন্দ্রকুমার গুহঠাকুরতা

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২ জানুয়ারি। বেলুড় মঠে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ কেষ্টলাল[১] মহারাজকে বললেন : "কেষ্টলাল, ধীরেনকে মায়ের কাছে নিয়ে 'বলি' দিয়ে নিয়ে আয়।" বাবা নেই, মা-ও বহুদিন আগে মারা গেছেন। মন উদাস। মনে শুধু ভাবনা কোথায় যাব—কি করে হারানো মাকে পাব। মাতৃহারা কিশোরের মর্মবেদনা কেউ বুঝবে না।

'বলি'ই বটে—আমরা বাঙাল—বরিশালে বাড়ি। অতএব বলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এরা সরস্বতী পূজায়ও পাঁঠা বলি দেয়।

উদ্বোধনের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি। পূজনীয় শরৎ মহারাজ ডেস্ক-এ বসে লিখছেন। সিঁড়ির কাছে যেতেই হেঁকে বললেন : "কে যায় ? মায়ের শরীর ভাল নয়, যেও না।" আমি তাঁর কথা না শুনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি দেখে তিনি উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : "মায়ের শরীর ভাল নয়, যেওনা।" কিন্তু আমার তখন এমনই রোক যে, তাঁকে ধাক্কা মেরেই মায়ের কাছে গেলাম। উদ্বোধনের পূজার ঘরে মা পূজায় বসেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়েই বুঝলেন দীক্ষাপ্রার্থী। একটু হেসে বললেন : "কাল এস।"

পরদিন ৩ জানুয়ারি। স্নান সেরে গেলাম। মা তাঁর বাঁদিকের আসনে বসতে বললেন। এদেশের মেয়েরা যেমন চিবুক স্পর্শ করে বধূবরণ ইত্যাদি করে, মা তেমনই আমার চিবুকে হাত দিয়ে চুমু খেয়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগলাম মায়ের পূজা—সামনে নৈবেদ্যের থালা, ফল, ফুল। মা কিছুক্ষণ ধ্যান করে, আমার দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন : "তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব ?" আমি বললাম : "মায়ের মৃত্যু আমার ছয় বছর বয়সে, বাবা

---

১ কৃষ্ণলাল মহারাজ—স্বামী ধীরানন্দ।

চোদ্দ বছরে, ওসব তো জানিনে মা। তবে মায়ের মৃত্যুর সময় শিয়রে বাবা কালীমূর্তি রেখেছিলেন।" মা বুঝে নিলেন। চিবুকে হাত রেখে কানে মহামন্ত্র দিলেন। একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মতো পা থেকে মাথা অবধি চলে গেল। সে আনন্দময় অনুভূতি শুধু অনুভবের—বর্ণনার নয়। এবার করগণনা দেখালেন। আমার ভুল হতে লাগল—মাকে কিছু না বলে শুধু তাকিয়ে রইলাম। আবার দেখিয়ে দিলেন। আবার ভুল হলো। আবার দেখিয়ে দিলেন করুণাময়ী।

দীক্ষাশেষে হাত পাতলেন। গুরুদক্ষিণা। আমার পকেট শূন্য জেনে মা নৈবেদ্যের থালা থেকে একটি ফল নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন: "বল, আমার ইহকাল পরকালের পাপপুণ্য সব তোমায় দিলাম" ।' আমি বললাম: "মা, ছেলে মাকে ভাল জিনিস দেয়। আমি পাপ-টাপ দিতে পারব না।" হেসে বললেন: "থাক বাবা, তোমায় কিছু করতে হবে না। শুধু সকাল-সন্ধ্যা জপ করো। জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি।" মাকে বললাম: "হাতে জপ আমার হচ্ছে না।" মা কেষ্টলাল মহারাজকে ডেকে এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা আনিয়ে দিলেন। সেইটেই এখনো আমার সম্পদ।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে চাকুরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করি। জীবনে মায়ের কৃপায় পেয়েছি অনেক। জীবনে অনেক শূন্যতা তাঁর কৃপায় ভরেছে। কিন্তু যায়নি আমার গুরুদক্ষিণা না দেবার বেদনা। জীবনপাত্র ভরে মাকে গুরুদক্ষিণা দেব—আমার আজীবন লক্ষ্য। কিন্তু লক্ষ্য এখনো ছুঁতে পারিনি। জানি না এ-জীবনে আর পারব কি না।

কামারপুকুরে যুগী শিবমন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে গ্যারিসন সাহেব আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন: "তুমি মাকে দেখেছ। তাঁর কিছু 'মিরাকল' দেখেছ? মায়ের কিছু অসাধারণ ঘটনার কথা বল।"

উত্তরে তাঁকে বলেছিলাম: "তুমি নিজেই তো তাঁর একটি 'মিরাকল'—মায়ের করুণার বড় উপমা। খুব কম সময় আর অল্প অর্থ ব্যয় করে আমরা এসেছি কলকাতা থেকে। তুমি ক্যালিফোর্নিয়া

থেকে কামারপুকুরে এসে হাজির হয়েছ। এটাই মায়ের মিরাকলের একটি বড় দৃষ্টান্ত নয় কি?"

পূজনীয় শরৎ মহারাজ—মায়ের দ্বারী। তিনি বলতেন: "তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।" আমরাও হতবাক তাঁর লীলা দেখে।

রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক বিদেশী সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: "মহারাজ, আপনি কেন জয়রামবাটী এসেছেন?" স্মিতহাস্যে মহারাজ জবাব দিয়েছিলেন: "আমার ব্যাটারী চার্জ দিয়ে নিতে।"

মা নিজে বলেছেন: "জয়রামবাটী 'শিবপুরী', তেরাত্র থাকলে দেহ শুদ্ধ হয়।" আমায় যদি কেউ বলে, "অমরনাথ, ক্ষীরভবানী যাবে?" আমি বলি: "সব তীর্থের সেরা তীর্থ জয়রামবাটী। যদি পার সেটি দর্শন কর, ধন্য হবে।"

স্বামীজীর ভাই মহিমবাবু[২] আমাকে বলেছিলেন: "সব বলবে, কিন্তু মায়ের কথা বলবে খুব সাবধানে। কৃপা পেয়েছ, এইটে ধরে থাক। বলতে গিয়ে ছোট করে ফেলবে।" মায়ের কথা বলতে তাই বড় ভয়—পাছে তাঁকে ছোট করে ফেলি। *

---

২ মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

* [illegible], ১২তম বর্ষ, পূজা সংখ্যা, ১৩৮১, পৃঃ ২১৯-২২১। স্মৃতিকথাটি 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থেও (পরিশিষ্ট) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।—সম্পাদক।

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি আমি প্রথম বেলুড় মঠে আসি। দুমাস মঠে থাকার পর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে জয়রামবাটী যাই। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল জুন মাস। এক ভদ্রলোক জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দ আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে একখানা চিঠিও লিখে দিলেন তিনি। আমরা জয়রামবাটীর পথে বেরিয়ে পড়লাম। হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন রেলে চেপে আমরা চাঁপাডাঙায় পৌঁছালাম। হাওড়া থেকে চাঁপাডাঙার দূরত্ব কতটা তা আমার জানা ছিল না। তবে এটা মনে আছে হাওড়া থেকে বিকেল তিনটে বা সাড়ে তিনটেয় ট্রেনে চেপেছিলাম, আর চাঁপাডাঙায় পৌঁছেছিলাম রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। মার্টিন ট্রেন চলত ধীর গতিতে, ঠিক যেমন ট্রাম চলে তেমনি, এমনকি ট্রামের চেয়েও ধীরে ধীরে। ঐ ট্রেনে আরও দুজন যুবক যাচ্ছিল, তারাও আমাদের সঙ্গে চাঁপাডাঙায় নেমে পড়ল। সে রাতটা আমরা চাঁপাডাঙা স্টেশনেই কাটালাম। স্টেশন মানে ছোট একটা কামরা, তার অর্ধেকটায় আবার ছাদ নেই। পরদিন সকালে জয়রামবাটীর পথে হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুদূর যাবার পর যে দুজন যুবক আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিল, তাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ল।[১]

---

১ এই দুজন যুবক পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। যিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তিনি হলেন স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ। আমেরিকার সেন্ট লুইসে রামকৃষ্ণ মিশনের যে কেন্দ্র আছে, দীর্ঘকাল তিনি সেই কেন্দ্রের প্রধান ছিলেন। অপরজনের নাম স্বামী বিশ্বনাথানন্দ। দীর্ঘকাল ইনি মিশনের দিল্লী কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামী বিশ্বনাথানন্দ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

দেখা গেল তার আমাশা, কাজেই তার বন্ধুটি তার জন্যে একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করল। কিন্তু আমাশা বেড়েই চলল। ঐ যুবক দুটি তখন বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফিরে গেল। তাদের জন্যে আমাদের বেশ অনেকটা সময় পথে দেরি হলো। যাহোক, আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। বড় গরম ছিল। আমার মনে পড়ে না দুপুরের খাওয়ার জন্য অথবা বিশ্রাম করার জন্য আমরা পথে কোথাও থেমেছিলাম কি না। যাহোক, আমরা যখন দ্বারকেশ্বর নদ পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। সে রাতে আর কামারপুকুরে যাবার সময় ছিল না। সে রাতটা আমরা দ্বারকেশ্বরের পাড়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। অনেক গাড়োয়ানকেও দেখলাম বালুর চড়াতে শুয়ে থাকতে। তারা গাড়ি থেকে গরুগুলোকে খুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে আমরা কামারপুকুরের দিকে রওনা হলাম। কামারপুকুরে পৌঁছাতে দশটা বেজে গেল। শিবুদা-র (ঠাকুরের ভাইপোর) সঙ্গে দেখা হলো। তিনি তখন বৈঠকখানায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি আমাদের পরিচয় নিয়ে যখন বুঝলেন যে, আমরা জয়রামবাটী যাচ্ছি তখন তিনি বাড়ির ভিতর চলে গেলেন আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। আমরা হালদারপুকুরে স্নান করে খেয়ে নিলাম এবং একটু বিশ্রামের পর জয়রামবাটী রওনা হলাম। আমরা যখন জয়রামবাটীতে পৌঁছালাম তখন বিকেল চারটে কি সাড়ে চারটে। এখন যেটাকে মায়ের 'নতুন বাড়ি' বলা হয় সেটা তখনো সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। তার সংলগ্ন বাইরের দিকটায় যে বৈঠকখানা, সেখানে পুরুষ-ভক্তরা কেউ মায়ের কাছে এলে তাদের থাকতে দেওয়া হতো। আমাদেরও সেখানে থাকতে দেওয়া হলো। মা তখন থাকতেন তাঁর 'পুরনো বাড়ি'তে। আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। বাড়ির উঠনে ঢুকে দেখি মা বারান্দায় বসে রাত্রের রান্নার জন্য তরকারি কাটছেন। আর কেউ তখন সেখানে ছিল না। পুরুষরা আসছে বলে বোধহয় মেয়েরা সব সরে গিয়েছিল। আমরা মাকে প্রণাম করলাম। আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন তিনি মাকে

স্বামী প্রেমানন্দের চিঠির কথা বললেন। মা একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন চিঠিটা তাঁকে পড়ে শোনাতে। চিঠি পড়া হলে মা বললেন ঃ "বেশ, কালই ওদের দীক্ষা হবে।" আমরা নতুন বাড়ির বৈঠকখানায় ফিরে এলাম।

পরদিন আমরা দীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। মা সকালবেলা ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষার জন্যে আমাদের এক এক করে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের দীক্ষা হয়ে গেল। মা সাধারণতঃ ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষা দিতেন। তবে এ-বিষয়ে তাঁর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। যে-কোন সময়ে, যে-কোন অবস্থাতেই দীক্ষা দিতেন। একবার বিষ্ণুপুর স্টেশনের এক কুলিকে রেল-প্ল্যাটফর্মেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনটি খড় মাটিতে পর পর সাজিয়ে তাতে তাকে বসতে বললেন—যেন ঐ খড়-তিনটে আসন। তারপর তাকে দীক্ষা দিলেন। আর একবার একটি মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এই মহিলাকে ছোটবেলা থেকেই চিনতেন, একসঙ্গে খেলাধুলোও করেছেন। দুপুরবেলা খাওয়ার পর একসঙ্গে মায়ের ঘরে পাশাপাশি শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। এই অবস্থাতেই মা তাঁকে দীক্ষা দিলেন। এ-থেকে বোঝা যায় দীক্ষার ব্যাপারে মা কোন বিশেষ নিয়ম মানতেন না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবার ছিল এই যে, কেউ আধ্যাত্মিক উপদেশ-প্রার্থী হয়ে এলে মা তাকে কখনো ফিরিয়ে দিতেন না। যে এসেছে সে-ই পেয়েছে। মা বলতেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ সেরা সেরা আধারগুলিকে বেছে নিয়েছেন, যত আজেবাজেগুলি আমার জন্যে রেখে গেছেন। এজন্যেই আমার যত ভোগ।" একথা বললেও কেউ দীক্ষা নিতে চাইলে মা তাকে হতাশ করতেন না। দেশের সর্বত্র তখন জোর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন চলছে। যেসব ছেলেরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তারা মাঝে মাঝে মায়ের কাছে আসত প্রণাম জানাতে বা দীক্ষা নিতে। পুলিস তাদের পিছনে পিছনে ঘুরত, আর তাদের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখত। পুলিসের গোয়েন্দারা মায়ের

বাড়ির ওপরও নজর রাখত। মা কিন্তু সেসব গ্রাহ্য করতেন না। একবার দুজন যুবক এল। দুজনই রাজদ্রোহী। মা তাদের স্নান করতে পাঠালেন, তারা স্নান করে এলে তাদের দীক্ষা দিলেন। তারপর তাদের খাইয়ে-দাইয়ে তাড়াতাড়ি অন্যত্র চলে যেতে বললেন। এসব ছেলেদেরও দীক্ষা দিতে মা এতটুকু ভয় পেতেন না। মা তাঁর জীবনের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত দীক্ষা দিয়ে গেছেন। মা যখন উদ্বোধনে অত্যন্ত অসুস্থ, তখন একদিন এক পারসী যুবক এসে উপস্থিত। তিনি মঠে অতিথি হয়ে কয়েকদিন ধরে বাস করছিলেন। এখন মায়ের কাছে এসেছেন তাঁকে দর্শন করতে এবং তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে। মায়ের তখন এত অসুখ যে দর্শন একেবারে বন্ধ। এই যুবকটি নিচে বসে রইলেন, তাঁকে দোতলায় যেতে দেওয়া হলো না। মা কিন্তু কিভাবে জেনে গেলেন যে, এই যুবকটি নিচে তাঁর দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি তখন একজনকে বললেন তাঁকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে আসতে। মা তাঁকে দীক্ষা দিয়ে নিচে পাঠিয়ে দিলেন। স্বামী সারদানন্দ এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করলেন : "মায়ের যদি এক পারসী শিষ্য করার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তাহলে আমার আর কি বলার আছে ?" এই পারসী যুবকটি পরবর্তী কালের চিত্রজগতের বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক বম্বের সোরাব মোদি।

শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি : বাইরে থেকে তাঁর চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যেত না, যাতে বোঝা যায় যে, তিনিই শ্রীশ্রীমা। তাঁকে দেখে মনে হতো তিনি এক সাধারণ পল্লীনারী। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে যখন তিনি বসে থাকতেন, তখন তিনি যে আমাদের 'মা' তা বুঝতে পারা যেত না। গিরিশবাবু তাই বলতেন : "এই যে মহিলা, গ্রামের সাধারণ বউটির মতো আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিই যে জগতের রাজরাজেশ্বরী, তা কে বলবে ?" স্বামী সারদানন্দ একবার বলেছিলেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরের ভাব বাইরে থেকে খানিকটা ধরা যেত, মায়ের কিন্তু কিছুই বোঝা যেত না। ভাব চেপে রাখার

অসম্ভব ক্ষমতা ছিল তাঁর। বাইরে তাঁর ভাবের এতটুকু প্রকাশ নেই। মা যেন মোটা কাপড়ের এক ঘোমটা দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে রেখেছেন। তাই কেউ তাঁকে একটুও দেখতে পাচ্ছে না।" মায়ের যে দিব্য ব্যক্তিত্ব তা সহজে কেউ বুঝতে পারত না। মা মাদ্রাজে আসছেন শুনে সেখানকার লোকেরা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল মা বক্তৃতা করবেন কিনা। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বললেন ঃ "না।"

মা কারও মধ্যে ত্যাগের ভাব দেখতে পেলে খুশি হতেন। যাদের মধ্যে ত্যাগের ভাব দেখতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন। একবার মা বলেছিলেন ঃ "সবাই বলে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মসমন্বয় প্রচার করতে এসেছিলেন। তিনি যে বিভিন্ন ধর্ম সাধন করেছিলেন, তা কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধর্মে কিভাবে ঈশ্বরকে ডাকে তা জানা।" তাই মায়ের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ্য শিক্ষা ধর্মসমন্বয় নয়, তিনি ত্যাগ কি বস্তু তা তাঁর জীবন দিয়ে লোককে শেখাতে এসেছিলেন। এই যুগের আদর্শ হিসাবে তিনি জগৎকে যা দিয়ে গেলেন তার মধ্যে এই ত্যাগের আদর্শই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। মা বলতেন ঃ "শ্রীশ্রীঠাকুরের মতন ত্যাগের কথা এর আগে কেউ কখনো শোনেওনি।" মা নিজেও এই ত্যাগের আদর্শের উপর জোর দিতেন। স্বামীজী বলতেন ঃ "ত্যাগ ও সেবা হচ্ছে এই জাতির মহান আদর্শ। যদি এই আদর্শ ধরে আমরা থাকতে পারি, তাহলে আমাদের সব ঠিক চলবে।" মা-ও তাই তাঁর নিজের জীবনের ভিতর দিয়ে এই ত্যাগের আদর্শ দেখিয়ে গেলেন। আজ বিশ্বব্যাপী স্বার্থপরতা, যেন-তেন-প্রকারেণ স্বার্থসিদ্ধি, অসদুপায়ে অর্থোপার্জন ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, এই ত্যাগের আদর্শের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী।

আমি আগেই বলেছি, মা সবাইকে এই ত্যাগের পথে চলতে উৎসাহ দিতেন। একবার এক ভদ্রলোক বাংলার কোন এক অঞ্চল থেকে মায়ের কাছে এলেন। তাঁর ইচ্ছা—তিনি সংসার ত্যাগ করে হৃষীকেশ বা ঐরকম কোন জায়গায় গিয়ে সাধনভজনে জীবন কাটান।

কিন্তু তিনি বিবাহিত, একটি সন্তানও আছে। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে তুমুল তর্কের ঝড় উঠল—এরকম লোক কি করে সাধু হতে পারে। এসব অনেক কথা অনেকে বলতে লাগল। মা কিন্তু একটি কথাও বলছেন না, একেবারে চুপ। কয়েকদিন পরে যখন সব ঝড় থেমে গেছে, তখন একদিন মা ঐ ভদ্রলোকটিকে ডেকে 'গেরুয়া' দিয়ে হৃষীকেশে যাবার অনুমতি দিলেন। পরবর্তী কালে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন বিশেষ সম্মানীয় সাধুরূপে গণ্য হয়েছিলেন।

জয়রামবাটীতে একটি যুবক ছিল—খুব ভাল। সে ভাল গান গাইতে পারত। আর সবাই তাকে ভালবাসত। একদিন হঠাৎ সে নিরুদ্দেশ, কোথায় গেছে কেউ জানে না। কয়েকবছর পরে সে গ্রামে ফিরে এল। সে ফিরে এসেছে দেখে গ্রামে খুব উত্তেজনা। অনেকে তাকে দেখতে এসেছে। তাকে যেন সবাই ঘেরাও করে রেখেছে, আর প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে। গ্রামে এমন সাড়া পড়ে গেছে যে, মায়েরও কৌতূহল হলো কি ব্যাপার জানতে। সাধারণতঃ মা পাড়ায় কারও বাড়িতে যেতেন না। সেদিন কিন্তু মা ভাবলেন—যাই ব্যাপারটা কি দেখে আসি। মা ঐ ছেলেটির বাড়িতে গেলেন। দেখেন তখনো বহু লোক তাকে ঘিরে রয়েছে, আর বলছে, "কেন তুমি না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে", "এত বছর কোথায় ছিলে", "এভাবে আর পালিয়ে যেও না" ইত্যাদি। মা কিন্তু কিছু বললেন না, চুপ করে সব শুনতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন: "বাবা, তুমি সাধু হয়ে ভালই করেছ।" তিনবার এই কথাটি বললেন। তারপর দুপুরে তাঁর কাছে এসে প্রসাদ পেতে বললেন।

মাঝে মাঝে কলকাতায় ভক্তেরা এসে মাকে বলতেন যে, ভাল পাত্র পাচ্ছেন না বলে তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছেন না। এ-সম্পর্কে মা বলতেন: "কেন বাবা-মা মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না বলে এত দুঃখ-আক্ষেপ করে? মেয়েকে নিবেদিতার স্কুলে সুধীরার কাছে পাঠায় না কেন?" এই হচ্ছে মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি।

সবার প্রতি মায়ের কী দরদ, কী ভালবাসা ! যে একবার এই ভালবাসার আস্বাদ পেয়েছে, সে কখনো তা ভুলতে পারবে না। একটি মেয়ে মায়ের কাছে আসত তরি-তরকারি বেচতে। দেখা গেল—মায়ের শরীর যাবার পরেও সে মাঝে মাঝে আসে, কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো : "এখন আর তুমি কি জন্যে আস ?" তখন সে উত্তরে বললে : "মায়ের এত ভালবাসা পেয়েছি যে, তাঁকে আর কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তাই এখানে আসি, কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যাই। এতেই আমার খুব আনন্দ হয়।"

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাজারে স্পিরিট পাওয়া খুব শক্ত ছিল, কারণ যুদ্ধের কাজে স্পিরিটের তখন ভয়ানক চাহিদা। সাধারণতঃ এক বোতল স্পিরিটের দাম ছিল ছ-আনা, কিন্তু তখন অনেক দাম দিয়েও বাজারে স্পিরিট পাওয়া যেত না। একজন ভক্ত কোন রকমে জয়রামবাটীর ডিসপেন্সারির জন্যে কয়েক বোতল স্পিরিট জোগাড় করেছিলেন। মায়ের পায়ে বাত ছিল, সেজন্যে বেশ কষ্ট পেতেন। স্পিরিট দিয়ে মালিশ করলে তাঁর একটু আরাম হতো। ঐ ভদ্রলোক যে-স্পিরিট এনে দিয়েছিলেন, তা থেকে একটু নিয়ে মাকে ব্যবহার করতে বলা হলো। মা কিন্তু রাজি হলেন না। তিনি বললেন : "ঐ স্পিরিট এসেছে গরিবদের জন্যে, তাদের বঞ্চিত করে আমার নিজের আরামের জন্যে তা আমি ব্যবহার করতে পারব না।" মায়ের কি দৃষ্টিভঙ্গি, তা এ-থেকেই বোঝা যাবে।

আর একবার এক ভক্ত এসে মাকে বললেন : "মা, অমুক মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে এক উইল করে তিনি বেলুড় মঠ এবং প্রাচীন সাধুদের জন্যে প্রচুর সম্পত্তি রেখে গেছেন।" মা চুপ করে সব শুনলেন। ঐ ভক্তের কথা শেষ হলে মা বললেন : "তা বেশ, তিনি যা করেছেন তা তো সব শুনলাম, কিন্তু তিনি গরিব-দুঃখীদের জন্যে কি কিছু রেখে গেছেন ?" ভক্তটি আর কি বলবেন, চুপ করে থাকলেন, কারণ সত্যি সত্যিই ঐ ব্যক্তি গরিবদের জন্যে কিছু রেখে যাননি।

গরিব-দুঃখীদের জন্যে তাঁর প্রাণ কিরকম কাঁদত, তা এ-থেকে বোঝা যায়। স্বামীজীও বলতেন ঃ গরিব-দুঃখী বা যারা সমাজে পিছিয়ে আছে, তাদের অবহেলা করার ফলেই আজ বিদেশী শক্তি এদেশে রাজত্ব করতে পারছে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষকে আমরা উপেক্ষা করে এসেছি, তাই আজ হাজার বছর ধরে আমরা বিদেশী শক্তির পদানত হয়ে রয়েছি। তাই মা-ও আমাদের এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, গরিব-দুঃখীদের তোলা যেন আমাদের প্রথম কর্তব্য হয়। স্বামীজী আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন—এই আদর্শ থেকে যেন আমরা কখনো বিচ্যুত না হই।

যা আমার মাথায় এখন আসছে এমন দু-চারটে বিক্ষিপ্ত কথা বলব।

একদিন মায়ের মা শ্যামাসুন্দরী দেবী মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আচ্ছা, বল তো এক পায়ের উপর আর এক পা দিয়ে বসেন ঐ দেবীর নাম কি?" মা বললেন ঃ "জগদ্ধাত্রী।" শ্যামাসুন্দরী দেবী বললেন ঃ "আমার ওঁর পুজো করতে ইচ্ছে করছে।" পর পর দুবছর জগদ্ধাত্রীপুজো হলো। পরের বছর আবার যখন মায়ের মা পুজো করার কথা বললেন, তখন মা আপত্তি করে বললেন ঃ "এসব হাঙ্গামা পোয়াতে আমার আর ভাল লাগে না।" শেষপর্যন্ত মা অবশ্য রাজি হলেন, পুজোও হলো। প্রথমবার পুজোর আগে কদিন ধরে খুব বৃষ্টি হয়। মা স্বামী শান্তানন্দকে পরে বলেছিলেন ঃ "বৃষ্টির জন্যে পুজোর প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র শুকোনো হলো না। কিন্তু মজা এই, দেখা গেল চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু আমাদের উঠোনে রোদ।" এ এক অলৌকিক ব্যাপার, কিন্তু এটা সত্য ঘটনা।

আর একবারের ঘটনা—সে ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। মহাসমাধির পরদিন মায়ের শরীর মঠে আনা হলো। এখন যেখানে তাঁর মন্দির সেখানেই তাঁর স্থূল শরীর দাহ করা হয়। তখনো কোন ঘাট হয়নি। তবে ওখানে গঙ্গার পাড়টা নদীর দিকে ঢালু ছিল। যথাসময়ে চিতা সাজিয়ে আগুন দেওয়া হলো। চিতা জ্বলছে। ঠিক

ঐ-সময় দেখা গেল গঙ্গার অপর তীরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এমন বৃষ্টি যে ওপারের ঘরবাড়ি, গাছপালা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বৃষ্টি গঙ্গার মাঝামাঝি পর্যন্ত এল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এপারে তখন বেলুড় মঠে খটখটে রোদ। চিতা যথারীতি জ্বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর মায়ের দেহ সম্পূর্ণ দাহ হয়ে গেল। এবার চিতার আগুন নেভাতে হবে। সেখানে একজন ছিলেন—তিনি তান্ত্রিক। তিনি চেয়েছিলেন, তান্ত্রিক বিধিতে আগুন নেভানো হোক। সেজন্য যেসব জিনিসের দরকার ছিল, তা তখন ওখানে ছিল না। তিনি তাই সেসব আনতে বাজারে গিয়েছিলেন। তাঁর ফিরতে দেরি হচ্ছিল। স্বামী নির্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) অধৈর্য হয়ে বড় একটা কলসি নিয়ে গঙ্গা থেকে জল ভরে এনে শরৎ মহারাজকে (স্বামী সারদানন্দকে) বললেন ঃ "আপনি জল ঢেলে চিতা নেভান। আমাদের আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।" শরৎ মহারাজ চিতায় জল ঢাললেন। অনেকেই এর মধ্যে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে এসেছে চিতায় ঢালবার জন্য। কিন্তু কারুরই আর ঢালা হলো না। শরৎ মহারাজের যেই চিতায় জল ঢালা শেষ হলো সঙ্গে সঙ্গে ওপারের বৃষ্টি এপারেও এসে গেল। সে এমন জোর বৃষ্টি যে, তাতেই তৎক্ষণাৎ চিতার আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেল। ফলে শরৎ মহারাজের পরে কারও আর জল ঢালা হলো না। আমরা সবাই বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে গেলাম। এরকম ঘটনাও ঘটে। শুনতে অস্বাভাবিক ও অলৌকিক মনে হলেও বাস্তব এ ঘটনা।

একবার এক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "মা, আমাদের দেশ কবে স্বাধীন হবে ?" মা স্পষ্টভাষায় বলে দিলেন ঃ "বাবা, তোমরা কি তাদের (ব্রিটিশদের) দেশ থেকে তাড়াতে পারবে ? তা পারবে না। ওদের যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই লাগবে তখন তোমরা স্বাধীন হবে।" ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে, বহুদিন আগে তিনি যা বলেছিলেন তা-ই সত্য হয়েছে। আমরা অবশ্য বলতে পারি আমরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিলাম, তাই স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু আসল কথা এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যদি না হতো, তাহলে আমাদের

স্বাধীনতা পেতে আরও অনেক বছর লেগে যেত। স্বামীজীও বলতেন ঃ "এরা অর্থাৎ 'ব্রিটিশরা' চোরের মতো পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের দেশে ঢুকেছে, আর তারা এদেশ ছেড়ে যাবেও সেইভাবে. কোন রক্তপাত ঘটবে না। রক্তপাতহীন এক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ভারত স্বাধীন হবে।" আজ আমরা জানি, আমাদের স্বাধীনতালাভের সময় রক্তপাত হয়নি। বিনা রক্তপাতেই এক বিপ্লব ঘটে গেল।

মাঝে মাঝে ভক্তেরা মাকে বলত ঃ "মা, আমাদের কিছুই হচ্ছে না। ধ্যান-জপ করি, কিন্তু তাতেও কোন আনন্দ পাই না।" মা বলতেন ঃ "একথা অনেকেই এসে বলে আমাকে, কিন্তু তারা রোজ দশ-পনের হাজার জপ করুক দেখি, তখন কেমন আনন্দ না পায় দেখব।" এইটি মা প্রায়ই বলতেন। মা আরও বলতেন ঃ "মুনিঋষিরা ঈশ্বরলাভের জন্যে কত জন্ম কাটিয়েছেন তপস্যা করে, আর তোমরা ঈশ্বরলাভ করতে চাও কিছু না করে ফাঁকি দিয়ে। বিনা চেষ্টাতেই কি তা সম্ভব ? যা চাও তা পেতে গেলে উঠে-পড়ে লাগতে হবে। সবাই আসে, আর বলে—'কৃপা, কৃপা।' কৃপা কি করবে ? কৃপা গিয়ে ফিরে আসে।" কৃপা যার কাছে এল, সে যদি প্রস্তুত না থাকে, তাহলে কৃপা এসেও ফিরে যাবে। তবে মা সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন ঃ "এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে ঈশ্বরলাভের পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গেছেন. যে-কেউ একটু উদ্যোগী হয়ে ঈশ্বরচিন্তা করবে, সে-ই তাঁকে পেয়ে যাবে।"

মায়ের শেষ উপদেশ ছিল ঃ "কারও দোষ দেখো না।" আর একটি কথা বলতেন ঃ "যখন তোমরা কোন সমস্যায় পড়বে, যখন কোন মানসিক অশান্তি আসবে, তখন মনে রাখবে তোমাদের একজন মা আছেন।" বিপদ-আপদ যা-ই আসুক আমরা যেন মাকে ডাকতে পারি, তাহলে মা আমাদের দেখবেন, আর আমাদের ভয়-ভাবনা সব দূরে চলে যাবে। মা আমাদের কৃপা করুন—এ-ই তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা। ✳

অনুবাদ ঃ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

✳ মূল ইংরেজী স্মৃতিকথাটি নয়া দিল্লী রামকৃষ্ণ মিশন প্রকাশিত 'Sri Sarada Devi : The Great Wonder' (1st Edition 1984) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। মূল স্মৃতিকথা থেকে ভাষান্তর স্বামী লোকেশ্বরানন্দের। বঙ্গানুবাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুমোদিত। (দ্রঃ শতরূপে সারদা, পরিশিষ্ট)—সম্পাদক

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা

স্বামী অশেষানন্দ

স্বামী অখিলানন্দ আর আমি কলকাতায় একই কলেজে পড়তাম। কলেজের নাম সেন্ট পলস কলেজ। অখিলানন্দ পড়তেন এক ক্লাস উঁচুতে। অখিলানন্দই আমাকে প্রথমে রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) কাছে নিয়ে যান। রাজা মহারাজ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ। আছেন বলরাম বসুর বাড়িতে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমরা বলরাম-মন্দিরে গিয়ে তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করে আসতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা বলরাম-মন্দিরে গিয়ে দেখি, মহারাজ বাইরে কোথাও গেছেন। কয়েকজন ভক্ত সেখানে ছিলেন। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি উদ্বোধনে গিয়ে মাকে দর্শন করে আসতে চাই কিনা। আমি অখিলানন্দকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কি ইচ্ছা। অখিলানন্দ বললেন : "এখানে একজন সাধুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। আমি যেতে পারছি না। তুমি বরং যাও। আমি মাকে দেখেছি, তুমি তো দেখনি। তোমার কাছে এটা একটা মহা ভাগ্যের কথা।"

বলরাম-মন্দির থেকে উদ্বোধন হেঁটে যেতে বড় জোর দশ মিনিট লাগে। উদ্বোধনে গিয়ে আমি অফিস-ঘরে বসে আছি। এমন সময় স্বামী ধীরানন্দ (কৃষ্ণলাল মহারাজ) আমাকে সেখানে দেখতে পেয়ে বললেন : "আমি তোমাকে বলরাম-মন্দিরে কয়েকবার দেখেছি। তোমার ধর্মজীবনের ভার কে নেবে, সে-সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ ?" সেই সময় আমি কান্ট, হেগেল, প্লেটো—এইসব খুব পড়ছি। এঁদের মধ্যে প্লেটো ছিলেন আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে তাঁকেই আমি সর্বাগ্রগণ্য মনে করতাম। অ্যারিস্টটলকেও পছন্দ করতাম তাঁর যুক্তিপ্রণালীর জন্য। কিন্তু প্লেটো আমার কাছে শ্রদ্ধা

পেতেন তাঁর অতীন্দ্রিয় আদর্শের জন্য। কৃষ্ণলাল মহারাজকে আমি বললাম : "আমি অনেকটা ইয়াঙ্কি ছোকরাদের মতন। খুব কট্টর স্বভাবের ; আর অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। বাইবেল পড়েছি, কারণ সেন্ট পলস কলেজে বাইবেল পড়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু গীতা-টীতা আমি পড়িনি।" আমার কথা শুনে কৃষ্ণলাল মহারাজ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে বললেন : "আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে তুমি কিছুই বোঝ না। ধর্মজীবনে একজন পথপ্রদর্শকের দরকার। তিনি যেন মশাল হাতে করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন। মনে কর, তুমি একটা গুহামন্দিরে গিয়েছ। সেখানে তো সব অন্ধকার। যদি তুমি একা যাও, নির্ঘাত তোমার মাথা দেয়ালে ঠোক্কর খাবে। কিন্তু একজন পাণ্ডা যদি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিয়ে চলে, তাহলে তোমার আর আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে না। তুমি নিশ্চিন্ত-মনে দেবদর্শন করতে পার।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম : "আপনি কি বলতে চাচ্ছেন ?" তিনি উত্তর দিলেন : "আমি এই বলতে চাই যে, শ্রীশ্রীমা ওপরে রয়েছেন। তোমার উচিত তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করা ; তাঁর কাছে প্রার্থনা করা যাতে তিনি তোমায় দীক্ষা দেন।"

এটা ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের কথা। সেই সময় শ্রীমার কথা বাইরে খুব বেশি প্রচার হয়নি। মায়ের কোন জীবনীগ্রন্থ বা ফটোও তখন পাওয়া যেত না। মা যখন কলকাতা আসেন, তখন যাতে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী-সঙ্গিনীদের থাকবার সুবিধা হয়, সেইজন্য স্বামী সারদানন্দ উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ী' তৈরি করেছিলেন। আমি যে অফিস-ঘরে বসে ছিলাম, সেটা ছিল একতলায়। ওপরের তলায় ঠাকুরঘরে মা থাকতেন। স্ত্রী-ভক্তদের জন্য প্রতিদিনই মায়ের দর্শনের ব্যবস্থা থাকত। পুরুষ-ভক্তেরা শুধু মঙ্গল ও শনিবার মায়ের কাছে যেতে পারতেন।

রাসবিহারী মহারাজ উদ্বোধন এবং জয়রামবাটী দু-জায়গাতেই মায়ের সঙ্গে তাঁর সেবার জন্য থাকতেন। তিনি ঐ অফিস-ঘরে এসে বললেন : "যাঁরা মাকে দর্শন করতে চান, আমার সঙ্গে আসুন।" তিনি

আমাদের বলে দিলেন, আমরা যেন মায়ের সঙ্গে কোন কথা না বলি, তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করে অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসব। রাসবিহারী মহারাজের পিছন পিছন মায়ের কাছে গিয়ে দেখলাম, মা ঘোমটা দিয়ে বসে আছেন। মাকে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে সিঁড়ি দিয়ে যখন নেমে আসছি, কৃষ্ণলাল মহারাজ আমায় বললেন ঃ "মাকে বলেছিলে তোমায় কৃপা করতে? তোমায় দীক্ষা দিতে?" আমি বললাম ঃ "না, মহারাজ। আমাদের বলা হয়েছিল কথা না বলতে।" তিনি তখন রাসবিহারী মহারাজকে বলে দিলেন ঃ "রাসবিহারী, তুমি এই ছেলেটিকে মায়ের কাছে নিয়ে যাও। মাকে বলো, এর মহারাজের কাছে যাতায়াত আছে। তিনি যেন অনুগ্রহ করে একে কৃপা করেন।" রাসবিহারী মহারাজ একটু গোঁড়া ছিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজ সেটা জানতেন। সেইজন্য তিনি আরও বলে দিলেন যে, আমি ব্রাহ্মণ ছেলে, সম্ভ্রান্তবংশীয়, কলেজে পড়ি ইত্যাদি। কাজেই, আমি আবার মাকে দর্শন করার সুযোগ পেলাম। এবার দেখলাম, মায়ের মাথায় ঘোমটা নেই। মা বললেন ঃ "কেন বাবা, তুমি তো রাখালের কাছে যাও; রাখালই তো তোমায় দীক্ষা দিতে পারে। সে দেবার অধিকারীও বটে—তবে আমার কাছে কেন চাচ্ছ?" আমি বললাম ঃ "মা, আপনি যদি আমায় কৃপা করেন, আমি মনে করব, সে আমার পরম সৌভাগ্য। আমার কাছে সেটা ভগবৎ-অনুগ্রহ বলে মনে হবে।" মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন ঃ "আচ্ছা, তাই হবে। তুমি দুদিন পরে এস। গঙ্গাস্নান করে আসবে। সকালবেলাটা কিছু খেও না। নিচের অফিস-ঘরে এসে অপেক্ষা করো। ঠাকুরের পুজো শেষ করে আমি কাউকে পাঠাব তোমায় ওপরে নিয়ে আসতে। তারপর তোমার দীক্ষা হবে।"

মা যা যা বললেন, নিচে নেমে এসে কৃষ্ণলাল মহারাজকে সব বললাম। উনি খুব খুশি হলেন। মনে হলো, তাঁর আনন্দ আমার চেয়েও বেশি। সেদিন আমি ভেবে যাইনি যে, দীক্ষা প্রার্থনা করব। আকস্মিকভাবে সব যোগাযোগ হয়ে গেল। আমার তখন সতেরো

বছর বয়স। দীক্ষার তাৎপর্য কি, তা-ই আমি তখন জানতাম না। আমার খালি এই মনে হয়েছিল যে, মা আমাকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি আমার খুব নিকটজন, আমি অপরিচিত হলেও তিনি আমার অত্যন্ত আপন। সত্যিকথা বলতে কি, মা যে স্বয়ং জগন্মাতা একথা আমার তখনো মনেই হয়নি। পরবর্তী কালে পূজনীয় শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। মা তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক বিভূতি গোপন করে রাখতেন। আমি শুধু অনুভব করতাম, তাঁর অসীম দয়া, অফুরন্ত স্নেহ আর অপার করুণা। কিন্তু তিনিই যে মানবীরূপে অবতীর্ণা স্বয়ং আদ্যাশক্তি—একথা আমি তখন বুঝতে পারিনি।

মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার কথা অখিলানন্দকে সব বললাম। আরও বললাম যে, দীক্ষা কি, আমাকে কি কি করতে হবে বা কিভাবে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হবে—সেসব আমি কিছুই জানি না। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, চিন্তার কোন কারণ নেই, তিনি আমাকে সব বুঝিয়ে দেবেন। যেদিন দীক্ষা হবে, তার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা কলেজস্ট্রীট বাজারে গেলাম। কিছু ফল, মিষ্টি আর ফুল কিনলাম। আর কিনলাম একটা লালপেড়ে ধুতি—মাকে দেব বলে।

সেই রাতটা আমার একটু দুশ্চিন্তায় কাটল। অখিলানন্দের কাছে শুনেছিলাম, দীক্ষার সময় গুরু শিষ্যকে যে মন্ত্র দেন, সেই মন্ত্রই শিষ্যকে গ্রহণ করতে হয়। সে-ব্যাপারে শিষ্যের কোন অভিমত প্রকাশ করতে নেই। আমি কিন্তু এতদিন একটা নির্দিষ্টভাবে আমার ইষ্টমূর্তির চিন্তা করে এসেছি। যদি মা সেটা পরিবর্তন করে দেন, তাহলে আমি কি করব? আমি তো তাহলে চুপ করে সেটা মেনে নিতে পারব না। আমাকে তো মুখ ফুটে বলতেই হবে যে, "মা, আমার এইটা পছন্দ।" বেশ কিছুক্ষণ এরকম দুর্ভাবনায় কাটল—আমি ঘুমোতে পারলাম না।

পরদিন সকালে অখিলানন্দ এবং আমি গঙ্গাস্নান সেরে উদ্বোধনের সেই অফিস-ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। যথাসময়ে ডাক

আসতেই আমি ওপরে গেলাম। মা নিজেই পুজো করলেন। তারপর মা আমাকে মন্ত্র দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়তন্ত্রীতে যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি যেমনটি মনে মনে চেয়েছিলাম, ঠিক সেই রকম মন্ত্রই মা দিয়েছেন। আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম ঃ মা অসাধারণ সন্দেহ নেই। তিনি অন্তর্যামী—আমার মনের কথা সব তিনি জানেন। আমার অন্তর তৃপ্তিতে ভরে গেল। দীক্ষার পর মা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "তুমি দুপুরে এখানে প্রসাদ পাবে তো?" আমি বললাম ঃ "মা, আমি পুরো দিনের ছুটি নিইনি। শুধু একবেলার ছুটি নিয়েছি।" মা তখন আমাকে কিছু ফলমিষ্টি প্রসাদ দিলেন। আমি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম।

রাসবিহারী মহারাজের সঙ্গে দীক্ষার পর দেখা হলো। তিনি বললেন ঃ "মা তোমাকে দীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তোমার তো জপের মালা নেই দেখছি।" আমি বললাম ঃ "আপনি কি মালার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন?" তিনি রাজি হলেন। আমি তাঁকে মালার জন্য কিছু টাকা দিলাম। তিনি আমাকে বললেন, দুদিন পর যেতে। এর মধ্যে তিনি মালা আনিয়ে শ্রীমাকে দিয়ে শোধন করিয়ে রাখবেন। দুদিন পরে গেলে তিনি আমাকে বললেন যে, আমার জন্য তিনি মালার প্রতিটা দানা খাঁটি কিনা পরীক্ষা করে দেখেছেন। আমি খুব অবাক হলাম। বললাম ঃ "মালার দানা খাঁটি কিনা কিভাবে পরীক্ষা করা হয়? আমরা একটা মানুষ খাঁটি কিনা পরীক্ষা করে দেখতে পারি। কিন্তু মালার দানা কি সেরকমভাবে পরীক্ষা করা যায়?" তিনি তখন পদ্ধতিটি বুঝিয়ে দিলেন। একটা পাত্রে জল নিয়ে ঐ জলে একটা দানা ফেলে দেওয়া হয়। যদি দানাটি ডুবে যায়, তবে বোঝা যাবে সেটি খাঁটি। আর ভেসে উঠলে বুঝতে হবে খাঁটি নয়। আমি তখন মালা নিয়ে ওপরে মায়ের কাছে চলে গেলাম। শ্রীমা মালা নিয়ে তাতে আমার মন্ত্র জপ করে দিলেন, দেখিয়ে দিলেন কিভাবে মালায় জপ করতে হয়। ইষ্টমূর্তির চিন্তা ও ধ্যান কিভাবে করতে হয়, তা-ও তিনি সেদিন আমায় শিখিয়ে দিলেন।

ঐ শুভদিনে আমি শ্রীমার কাছ থেকে যে সম্পদ লাভ করেছিলাম, তা ধারণার উপযোগী বোধশক্তি পেয়েছিলাম অনেক পরে স্বামী সারদানন্দের কাছে। আমি কিছুদিন স্বামী সারদানন্দের ব্যক্তিগত সেবক হিসাবে কাজ করেছিলাম। মায়েরই কৃপায় এটা সম্ভব হয়েছিল বলে আমি মনে করি। সেই সময় স্বামী সারদানন্দ আমাকে দিয়ে যেসব চিঠি লেখাতেন, তাতে শিষ্যদের আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে বিশদভাবে উপদেশ দিতেন। কোন শিষ্য মন্ত্র ভুলে গিয়ে থাকলে তার চিঠিটা তিনি নিজে লিখতেন। তা না হলে অন্য সব চিঠি আমাকে দিয়েই লেখাতেন। একদিন মহারাজের ধ্যানের পরে তাঁকে গিয়ে প্রণাম করে বললাম: "মহারাজ, শ্রীমা আমায় খুব সরলভাবে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিয়েছেন। তিনি আমায় সকাল-সন্ধ্যা নির্দিষ্ট সংখ্যায় মন্ত্র জপ করতে বা বিশেষ দিনেও কিছু করতে বলে দেননি। তিনি আমায় নির্দিষ্ট কোন সাধনপদ্ধতিও বলে দেননি। মহারাজ, আমার এমন কোন পদ্ধতির প্রয়োজন যাতে আমি ধাপে ধাপে এগোতে পারি। আপনি অনুগ্রহ করে অতিরিক্ত কিছু বলে দেবেন?" স্বামী সারদানন্দ বললেন: "তোমার মতো মূর্খ আমি দুটো দেখিনি। শ্রীমা জগন্মাতা স্বয়ং। তুমি যেসব সাধনপ্রণালীর কথা বলছ, সেগুলি সাধারণ গুরুরা দিয়ে থাকেন। কিন্তু শ্রীমার কথা স্বতন্ত্র। মা তোমাকে যা দিয়েছেন, তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে সেটাই শেষকথা জানবে। তোমার মন্ত্রটা আঁকড়ে ধরে থাক। সেই মন্ত্র জপ কর, তোমার ইষ্টমূর্তির ধ্যানচিন্তা কর—ব্যস। যখন তোমার মনে ঈশ্বর-দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগবে, দেখবে যে তোমার মনই সেটা জানতে পারছে। তখন তোমার মন সেই দিব্যসত্তাতে স্থির হয়ে যাবে, তোমার সব মনোবাঞ্ছা তখন পূর্ণ হবে। তুমি বলতে চাও, মা যা দিয়েছেন তার উপরেও আমাকে আরও কিছু দিতে হবে? আমি নিজে যে তাঁর কৃপাতেই এখানে আছি!" স্বামী সারদানন্দের কথাতেই আমার চোখ খুলে গেল। বুঝলাম যে, শ্রীমা কোন সাধারণ সাধিকা নন।

তিনি স্বয়ং ভগবতী, জগজ্জননীর মূর্তবিগ্রহ, ব্রহ্মের লীলাচঞ্চল রূপ। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি অভিন্ন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং সারদাদেবীও এক অচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ। সেই আধ্যাত্মিক বন্ধনের স্বরূপ আমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না, কোন দার্শনিক জ্ঞানের সাহায্যেও উপলব্ধি করতে পারি না।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন—শ্রীমার জীবন কি নির্দেশ করে?—তার উত্তরে আমি প্রথমেই বলব, তাঁর জীবনে আমরা মূর্ত দেখি চির-আরাধ্যা কুমারী, পরিপূর্ণ পবিত্রতার বিগ্রহ প্রতীচ্যের সেই ম্যাডোনার আদর্শকে। এছাড়াও, গার্হস্থ্য পরিমণ্ডলের মধ্যে নীরবে নিজের পবিত্র জীবনটি অতিবাহিত করে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি গৃহি-জীবনের আদর্শ। তাঁর জীবন দেখিয়ে দেয় কিভাবে গৃহি-ভক্তরা ভগবানলাভের চেষ্টা করবে এবং ঈশ্বর-উপলব্ধি করবে। আমার মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সন্ন্যাসের আদর্শই বেশি প্রকট। তাঁর যুবক-ভক্তদের তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, তা থেকে সেটাই পরিষ্কার হয়। কিন্তু গৃহি-ভক্তরা যদি আলো পেতে চায়, তবে তাদের বিশেষ করে শ্রীমার দিকেই তাকাতে হবে। তিনি আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন অতি সহজভাবে। আমরা ভাবি, যা অ-সাধারণ তা নিশ্চয়ই চমকপ্রদ, অ-প্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক কিছু হবে। যাকিছু স্বাভাবিক, সহজ-সরল, তাকেই আমরা অত্যন্ত সাধারণ মনে করে অবজ্ঞা করি। শ্রীমার উপদেশ দেওয়ার পদ্ধতি ছিল অতি সরল। তাঁর জীবন থেকে যে-দুটি জিনিস আমি শিখেছি, তার একটি পবিত্রতা, অপরটি এই সরলতা। বস্তুত, জীবনের প্রতিটি মহৎ জিনিসই অত্যন্ত সরল। শিশু-অবস্থায় আমরা যে মাতৃস্নেহ আস্বাদ করি, তা কত সরল। কিন্তু শ্রীমার এই অসাধারণ সরলতার মধ্যেও এমন একটা সূক্ষ্মতা মেশানো ছিল যে, তাঁকে বোঝা কঠিন হতো। আমিও তাঁকে খুব সামান্যই বুঝেছি। তবে লক্ষ্য করেছি, তাঁর উপস্থিতিতে সৃষ্ট হতো এক আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল, অনুভূত হতো সুস্পষ্ট কৃপা ও শান্তির স্পর্শ, আর স্থানটি হয়ে উঠত তীর্থস্বরূপ। তিনি কি

ছিলেন এবং কোন্ মহান আদর্শের তিনি প্রতীক—কেবল শ্রীরামকৃষ্ণই তা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই তিনি গোলাপ-মাকে নিচের এই ঘটনার সূত্রে শ্রীমার স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন।

একদিন আমি গোলাপ-মাকে বলেছিলাম : "শ্রীমা স্থূল-শরীরে থাকার সময় আমি যদি সঙ্ঘে যোগ দিতাম, তাহলে তাঁর সেবা করতে পারতাম।" গোলাপ-মা তখন কথায় কথায় বলেছিলেন : "কে তাঁকে বুঝতে পেরেছে ? আমি মায়ের এত কাছে কাছে থেকেছি, তবুও তাঁকে বুঝতে পারিনি।" এই বলে তিনি নিজেই আমাকে ঘটনাটি বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে যখন শ্যামপুকুর চলে গেলেন, তখন গোলাপ-মা কারও কাছে শুনলেন যে, শ্রীমা ঠাকুরকে খুব বেশি খাওয়াচ্ছিলেন বলে ঠাকুরের অসুখ বেড়ে যাচ্ছিল। তাই ঠাকুর রেগে শ্যামপুকুর চলে গেছেন। একদিন মায়ের কানে কথাটা যেতেই মা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি নাকি আমার সেবায় অসন্তুষ্ট ? সেইজন্যই নাকি তুমি শ্যামপুকুর চলে এসেছ ?" মায়ের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ স্তম্ভিত। বললেন : "এরকম কথা কে বলেছে ?" শ্রীমা বললেন, তিনি অমুকের কাছে শুনেছেন যে, গোলাপ-মা এরকম বলেছেন। এইকথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন : "সেই বাম্‌নী আসুক দেখি এখানে। আমি ওকে উচিত শিক্ষা দেব।" যখন শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হতেন, কেউ তাঁর কাছে এগোতে পারত না।

এই ঘটনার ঠিক পরদিনই গোলাপ-মা ঠাকুরের কাছে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি এরকম কথা বলেছ ? যাও, ওর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও। ও যদি তোমার উপর অসন্তুষ্ট থাকে, তাহলে আমার কাছেও তোমার ঠাঁই হবে না।" তার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : "সারদা সরস্বতী। সাধারণ মানবীর মতো দেখতে হলেও, ও আসলে জগন্মাতা স্বয়ং—যাঁর কৃপাকটাক্ষে মানুষের জ্ঞানলাভ সম্ভব। ও অবতীর্ণা হয়েছে মানুষকে ঈশ্বরজ্ঞান দান করতে,

জগৎকে আলোর সন্ধান দিতে।" গোলাপ-মা আমাকে বলেছেন, ঠাকুরের এইকথা শুনে তিনি শ্যামপুকুর থেকে সারা রাস্তা কাঁদতে কাঁদতে দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন। সেখানে শ্রীমায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেন ঃ "মা, দয়া কর তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি অমুকের কাছ থেকে শুনে বলেছিলাম। এরকম করা আমার উচিত হয়নি। ঠাকুর আমার উপর খুব রেগে গেছেন। তুমি যদি ক্ষমা না কর, তিনি আর আমাকে তাঁকে দর্শন করার অনুমতি দেবেন না।" শ্রীমা তাঁর পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে বললেন ঃ "ভুলে যাও গোলাপ, ভুলে যাও। তুমি তো আমার মেয়ে। মা কি কখনো মেয়ের ওপরে রাগ করতে পারে? ঠাকুরকে বলো, আমি তোমার ওপর সম্পূর্ণ খুশি।" শ্রীরামকৃষ্ণই গোলাপ-মার চোখ খুলে দিয়েছিলেন—যার ফলে শ্রীমার অনুপম দৈবী-মহিমা ও শক্তি তিনি কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

শ্রীমার শিষ্য চন্দ্রমোহন দত্তর কাছে আমি আর একটা ঘটনা শুনেছি। আমি তখন উদ্বোধন-অফিসের ম্যানেজারের সহকারী হিসাবে কাজ করতাম আর চন্দ্রবাবু বই প্যাক করার কাজ দেখাশোনা করতেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ, যিনি পরে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে তিনি একদিন গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ চন্দ্রবাবুকে বললেন ঃ "তুমি তো মায়ের কাছে যাও। তাঁর কাছে গিয়ে কি চাও?" চন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন ঃ "আমি তাঁর কাছে কিছু মিষ্টি প্রসাদ চাই।" তখন মহারাজ বললেন ঃ "তুমি কি মায়ের কাছে শুধু প্রসাদ চাইতেই এসেছ? শুধু সেইজন্যই কি এসেছ তুমি? মা মুক্তিদায়িনী। তুমি মায়ের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান চাও, মুক্তি চাও।" চন্দ্রবাবু বললেন ঃ "ঠিক আছে, মহারাজ। তা-ই চাইব আমি।" উদ্বোধনে ফিরেই চন্দ্রবাবু মায়ের ঘরে গেলেন। মা তখন দুপুরের পুজোয় বসেছেন। মা তাঁকে দেখতে পেয়েছেন, কিন্তু পুজোয় বসেছেন বলে কোন কথা বললেন না। ইঙ্গিতে জানতে চাইলেন, তিনি কি চান। চন্দ্রবাবু পরে বলেছিলেন ঃ "আমার বুক তখন দুরদুর করে কাঁপতে

লাগল। আমি ভেবে রেখেছিলাম, বলব, 'মা, আমায় কৃপা করে ব্রহ্মজ্ঞান দাও। যদি সেটা খুব বেশি হয়, তবে মুক্তি দাও। যদি তা-ও না হয়, অন্ততঃ মোক্ষ।' কিন্তু মুখ দিয়ে কোন কথা এল না আমার। দম বন্ধ হয়ে আসছে মনে হতে লাগল। কোনমতে বলে ফেললাম, 'প্রসাদ চাই, মা'। শ্রীমা আঙুল দিয়ে খাটের নিচে দেখিয়ে দিলেন। সেখানে একটা প্লেটে প্রসাদ ঢাকা ছিল। আমি তা থেকে কিছু রসগোল্লা, সন্দেশ আর চমচম নিয়ে নিচে নেমে এলাম। স্বামী শুদ্ধানন্দকে এসে বললাম: "মহারাজ, আমি ঠিক করেছিলাম ব্রহ্মজ্ঞান চাইব। কিন্তু কিছু একটা ঘটে গেল। কি ঘটল, আমি ঠিক জানি না।" এ-থেকে বোঝা যায়, এই ধরনের প্রার্থনা কাউকে শিখিয়ে দেওয়া যায় না। মায়ের কাছে শিশু যেভাবে চায়, মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাকুলতা জাগা চাই। তবে মায়ের প্রতি চন্দ্রবাবুর যেমন ভক্তি ছিল আর মা-ও তাঁকে যেমন ভালবাসতেন, তাতে আমি বিশ্বাস করি, শেষ মুহূর্তে তিনি নিশ্চয়ই এই আপেক্ষিক জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে শ্রীমায়ের স্নেহময় অঙ্কে শাশ্বত আশ্রয় লাভ করেছেন।

চন্দ্রবাবুর জন্যই আমি স্বামী সারদানন্দের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলাম এবং তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলাম। তাঁর কাছে শুনেছিলাম, মায়ের কাছে গিয়ে তিনি একবার আন্তরিক প্রার্থনা জানিয়েছিলেন: "মা, আমি তোমার সেবা করতে চাই।" শুনে মা বললেন: "না বাবা, সরলাই তো আছে—(সরলা অর্থাৎ যিনি পরে সারদামঠের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন—নাম হয়েছিল প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা)। তুমি বরং আমার ছেলে শরতের সেবা কর। যদি তুমি সর্বদা তার অনুগত থেকে অবিচলিত ও আন্তরিকভাবে তার সেবা করে যাও, তাহলে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হবে। যে-কেউ এভাবে শরৎকে সেবা করবে, তার সর্বোচ্চ গতি হবে।"

মায়ের এই কথাটি চন্দ্রবাবুর কাছ থেকে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই আমি শরৎ মহারাজকে ছেড়ে কখনো অন্য কোথাও যেতে

চাইনি। ঠিক করেছিলাম, যতদিন এই মহাপুরুষ আমাকে তাঁর সেবার সুযোগ দেবেন, তাঁর কাছে থাকব। একবার সাধুরা সব এলাহাবাদ যাচ্ছেন কুম্ভমেলা উপলক্ষে। স্বামী সারদানন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে অনেক সাধু সমাবেশ হবে, আমি যেতে চাই কিনা। আমি বললাম ঃ "মহারাজ, আমি আপনার কাছে বেশ আছি। আমি আর কোথাও যেতে চাই না।"

প্রথম যেদিন আমি মায়ের কাছে গিয়েছিলাম, সেদিন অন্যমনস্ক ভাবে আমার জুতোজোড়া চৌকাঠে ফেলে রেখে যাওয়ার জন্য স্বামী সারদানন্দ আমাকে খুব বকেছিলেন। এর ফলে স্বামী সারদানন্দ সম্বন্ধে আমার মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং আমি তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। পরে যে তাঁর এবং আমার মধ্যকার দূরত্ব দূর হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি যে আমাকে তাঁর সেবার সুযোগ দিয়েছিলেন—তা-ও মায়েরই কৃপায় সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করি।

যীশুখ্রীস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমার মতো মহান আচার্যরা পৃথিবীতে আসেন এক-একটি আদর্শ-জীবন যাপন করতে। তাঁরা মানবজাতিকে দেখিয়ে দেন, ঈশ্বর-উপলব্ধি অন্য যে-কোন ঘটনার মতোই বাস্তব। তাঁদের পুণ্যজীবন মানবজাতির কাছে সর্বোচ্চ আশীর্বাদ-স্বরূপ। আমি বিশ্বাস করি, যতদিন আমি শ্রীমায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলব, তাঁর অসীম কৃপায় আমাকে যে-মন্ত্র তিনি দিয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত আমি তার মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারব, ততদিন আমি, অন্ততঃ আমার সন্তুষ্টি অনুযায়ী, তাঁর কাজ করতে সমর্থ থাকব। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন। আমি শুধু তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করেছি, তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেছি, আর তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেছি। তাঁর শ্রীচরণে আমার বিনম্র প্রণতি এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, এই জীবনে আমি যাকিছু পেয়েছি, তা তাঁর কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। এখন আমার সমগ্র চিত্ত উন্মুখ হয়ে চেয়ে রয়েছে তাঁরই দিকে—এই আশায় যে, এই মায়ার জগৎ থকে উত্তরণ

স্বামী যোগানন্দের কাছ থেকেই আমি জানতে পারি যে, শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এসে শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক তরুণ-ভক্ত শরৎ সরকারের বাড়িতে অবস্থান করছেন। বলরাম-মন্দিরের পশ্চিমে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বাড়িটি।

পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করে কিছু ফুল, প্রধানতঃ লাল পদ্ম ও মিষ্টান্ন নিয়ে আমি সেখানে হাজির হলাম। বাড়ির দরজায় শরৎ সরকার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে দোতলার একটি বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, মাতাঠাকুরানী পূজা করছেন, তাই আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে দিয়ে ভিতরে শ্রীশ্রীমার কাছে খবর পাঠালেন, আমি দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছি। পনের মিনিটের মধ্যেই গোলাপ-মা এসে শ্রীমার দর্শনের জন্য আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। যে-ঘরে আমি অপেক্ষা করছিলাম, তার সংলগ্ন উত্তরদিকের একটি ঘরের চৌকাঠের উপর গোলাপ-মা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দুরুদুরু বক্ষে, ভাবাপ্লুত হৃদয়ে আমি আস্তে আস্তে ঘরটির দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর মিষ্টান্নাদি গোলাপ-মায়ের হাতে দিয়ে (যাঁকে আমি তখনো পর্যন্ত জানি না, পরে শরৎ সরকারের কাছে জেনে নিয়েছিলাম) দেখি, শ্রীশ্রীমা গোলাপ-মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শুভ্রবস্ত্রে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা, কিন্তু শ্রীচরণ মুক্ত, কোন আবরণ নেই। ভক্তিভরে সবকয়টি ফুল তাঁর পায়ে দিয়ে প্রণাম করলাম। চারিদিকে পূর্ণ নীরবতা। আমি ওঁদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। শ্রীশ্রীমা নিঃশব্দে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। স্নেহ ও আশীর্বাদের সেই দিব্যস্পর্শ আমাকে অভিভূত করে ফেলল। তাঁর সান্নিধ্যে যে-শিহরণ বোধ করেছিলাম, তখন বালক আমি, সেই পবিত্রকারী প্রভাবের গভীরতা পরিমাপ করতে পারিনি, তথাপি সেই গম্ভীর ভাবময় পরিবেশ যে একটা বিরাট মহিমার বোধ আমার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছে, তা অনুভব করেছিলাম। কোন কথাবার্তা হয়নি, তিনি কোন প্রশ্নও করেননি। কয়েক মিনিট পরে মা চলে গেলেন।

গোলাপ-মা কিছু ফল এবং মিষ্টান্ন প্রসাদ আমাকে দিলেন। বিপুল আনন্দে ভরপুর হয়ে আমি নিচে নেমে এলাম—দরজার কাছে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সঙ্গে দেখা। তিনি হেসে বললেন ঃ "আরে, তুই তো বড় চালাক দেখছি। আমি ছিলাম না, সেই ফাঁকে তুই চুপি চুপি এসে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করে নিয়েছিস!"

এখানে বলে নেওয়া যায়, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ তখন শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণের যে-সমস্ত ভক্তবৃন্দ মায়ের দর্শনের জন্য আসতেন, তাঁদের দেখাশোনা করবার জন্য ঐ বাড়িতে থাকতেন। স্বামী যোগানন্দও মায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখতেন। আমার পরম ভাগ্য, আমি স্বামী যোগানন্দের কৃপাতেই মাকে প্রথম দেখার সুযোগ পাই।

তার পর থেকে প্রায় প্রত্যেক দিনই আমি মায়ের কাছে গেছি। গঙ্গায় স্নান করে ফুল হাতে শরৎ সরকারের বাড়িতে যেতাম মাকে দর্শনের জন্য। শ্রীশ্রীমা সেখানে প্রায় একমাস কাটিয়ে জয়রামবাটী ফিরে যান। তিনি কেবল আমার নাম শুনেছিলেন, কিন্তু কখনো খোঁজ করেননি কে আমি। তবু তাঁর কত করুণা, যখনই গেছি, তখনই গোলাপ-মা অথবা অন্য কোন সঙ্গিনীর সঙ্গে আমাকে দর্শন দিয়েছেন। তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলির অনুমতিও দিয়েছেন। কিন্তু কোন কথা হতো না, বা আমি কে, কোথা থেকে আসছি, সে-বিষয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্নও করতেন না। লোকে যেমন দেবীপ্রতিমার পাদপদ্মে অঞ্জলি দেয়, সেইভাবে আমি তাঁর শ্রীচরণে পুষ্প নিবেদন করেছি। সত্যই দেবীপ্রতিমা—মাটির, পাথরের বা ধাতুর নয়, একেবারে জীবন্ত প্রতিমা—মানবদেহে আদর্শের বিগ্রহ। দর্শনকালে অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করত। কিন্তু তা মূক বা নিশ্চেতন নয়, উচ্চারিত শব্দের অপেক্ষা অনেক বেশি ভাবগ্রাহী। সে নৈঃশব্দ্য সুমহান, সমুন্নত, সুপবিত্র এবং অন্তর্ভেদী। তা করুণাকিরণে আলোকিত, দিব্য-জননীর প্রাণময় প্রেমের নিত্য উৎস থেকে উৎসারিত প্রাণময় রসধারা। ...মায়ের সঙ্গে এই সকল নীরব সাক্ষাতের কালে আমি এমন একটি

দিনের কথাও মনে করতে পারি না, যখন নতুন প্রেরণা, আশা ও শান্তিতে আমি উজ্জীবিত হইনি। অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি, আমি এমন একজনের সান্নিধ্যে উপনীত, যিনি আমার পিতামাতার থেকেও অনেক বড়।

আমি বলরাম-মন্দিরে এবং আলমবাজার মঠে প্রায়ই সাধুদের কাছে যেতাম। তাতে পড়াশোনার ক্ষতি হতো, এই ভেবে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ প্রায়ই আমাকে ধমক দিতেন। আমায় ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন ঃ "ওহে, মন দিয়ে পড়ার বই পড়বে। কি ভাবছ, ঈশ্বরদর্শন করা বুঝি খুব একটা সহজ ব্যাপার? পড়াশোনায় যে মন দিতে পারে না, সে কখনই পূজা-প্রার্থনা এবং জপধ্যানেও মন বসাতে পারবে না। পরীক্ষায় পাস করার থেকে ওটা অনেক শক্ত ব্যাপার। আগে পড়াশোনা করে জ্ঞানার্জন কর এবং পবিত্র নির্মল জীবন যাপন কর, তা-ই তোমাকে প্রার্থনা ও জপধ্যানে সাহায্য করবে।" আমি নীরবে শ্রদ্ধাভরে তাঁর উপদেশ শুনলাম। প্রায় প্রত্যেক দিনই শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতাম বলে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে সংস্কৃতে তাঁর রচিত একটি স্তোত্রও আমাকে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর অনুসরণে সেটি লেখা। প্রত্যূষে সেটি পাঠ করতে বলেছিলেন। স্তোত্রটি বেশ দীর্ঘ। দুর্ভাগ্যের কথা, আমার প্রতিবেশী সেটি আমার কাছ থেকে নিয়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহি-শিষ্য মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত আমার একেবারে প্রতিবেশী এবং নিকট-বন্ধু। তিনি বাংলার প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাতি, এবং নিজেও সাহিত্যিক। ঈশ্বর গুপ্ত যে বাংলা দৈনিক পত্রিকাটি চালাতেন, পরবর্তী কালে সেটি মণীন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ও সম্পাদনায় বের হতো। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলেন, মণীন্দ্রের তখন অত্যন্ত আর্থিক সঙ্কট। স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের কাছে সেকথা শুনেছিলেন। একদিন মণীন্দ্রকে ডেকে স্বামীজী গোপনে একহাজার টাকা উপহার হিসাবে

দিলেন। মঠের সাধুরা এবং অন্যান্য ভক্তরা মাঝে মাঝে মণীন্দ্রের বাড়িতে আসতেন। তাঁরা তাঁকে গুরুভাই বলেই মনে করতেন, খোকা বা মণি বলে ডাকতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা আমাকে বললেন ঃ "মণীন্দ্র নিতান্ত বালক-বয়সেই ঠাকুরের কাছে এসেছিল। তাঁর অসুখের সময় মণীন্দ্র এবং তার সমবয়সী একটি ছেলে দোলের দিনে তাঁকে বাতাস করছিল। অন্য ছেলেরা তখন বাইরে রঙ নিয়ে খেলছে। ঠাকুর বার বার তাদের দোল খেলতে যেতে বললেন। কিন্তু তারা গেল না, বাতাস করেই চলল। ঠাকুর তখন সজল চোখে বলেছিলেন, 'আহারে ! আমার রামলালা এইসব ছেলেদের মধ্য দিয়ে আমার সেবা করছে। এরাই আমার রামলালা'।"

একদিন আমাদের উপস্থিতিতে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী বিবেকানন্দের একটি চিঠি শ্রীশ্রীমাকে পড়ে শোনালেন। মঠের গুরুভাইদের সম্বোধন করে চিঠিটা লেখা। চিঠিতে তিনি খোঁজ নিয়েছেন কিভাবে মায়ের খরচপত্রাদি চলছে। তিনি বলেছেন, চিঠিটা যেন মঠের সকলেই পড়ে, তা যেন শ্রীশ্রীমা, গোলাপ-মা এবং যোগীন-মাকেও পড়ে শোনানো হয়। ঐ চিঠিতে স্বামীজী ব্যাকুল হয়ে তাঁর গুরুভাইদের বলেছেন, ঠাকুরের বাণী প্রচারে এবং লোককল্যাণে তাঁরা যেন যথাসর্বস্ব, এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। সেকথা শুনে প্রত্যেকে স্তব্ধ, ঠাকুরের উচ্চ ভাবকে স্বামীজী যেভাবে উপস্থিত করেছেন তা সকলকে আলোড়িত করে তুলল। কিছু পরে গোলাপ-মা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "সারদা (এটাই ছিল ওঁর সন্ন্যাস-পূর্ব নাম), মা বলছেন, 'নরেন ঠাকুরের যন্ত্র, তাই তাকে দিয়ে তিনি এসব লিখিয়েছেন, যাতে তাঁর ছেলেরা এবং ভক্তরা তাঁর কাজ করতে পারে, জগতের কল্যাণ করতে পারে। নরেন যা লিখেছে সব ঠিক, কালে নিশ্চয়ই সফল হবে।" মায়ের এসব কথা শুনে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। যেকথা তারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিল অথচ প্রকাশ করতে পারছিল না, মা তা খুলে বলেছিলেন। সত্যই সে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। ভরপুর মন নিয়ে আমরা

বাড়ি ফিরে এলাম। মনে তখন স্বামীজী সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি। আর কানে বাজছিল মায়ের সময়োপযোগী কথাগুলি।

শরৎ সরকারের বাড়িতে মায়ের এই অবস্থান প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা বলেছিলেন ঃ "শরৎ, লোকে তিনদিন দুর্গাপূজা করে, আর তুমি একমাস ধরে দুর্গাপূজা করছ ! লোকে মাটির মূর্তি পূজা করে, আর তুমি করলে জ্যান্ত দুর্গার পূজা।"

প্রতি বৎসরের মতো ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজা করলেন। বিশেষ কারণে আমি তখন জয়রামবাটী যেতে পারিনি। কিন্তু আমার বন্ধুরা সেখান থেকে ফিরে এসে সেখানকার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছিল। কী চমৎকার সেখানকার পরিবেশ ! মা নিজের ছেলের মতো করে তাদের কত না যত্ন করেছেন। তাদের সুখের শেষ ছিল না। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলল ঃ নিজের বাড়িতেও এমন মাতৃস্নেহ পাইনি।

ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক জয়রামবাটী থেকে ফিরে এসে মণীন্দ্রের বাড়িতে দু-তিন দিন থাকেন। তিনি আগে থেকেই উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করছিলেন। দৈনন্দিন কাজকর্ম তাঁর পক্ষে অসহ্য লাগছিল। তিনি সর্বদা ভাবতেন কি করে আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হবেন। একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তি দেখলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই মতো একটি জ্যোতির্ময় মূর্তিকে দেখিয়ে তাঁকে জয়রামবাটী যেতে বলছেন। ভদ্রলোক অবিলম্বে একাকী জয়রামবাটী যাত্রা করলেন। সেখানে শ্রীশ্রীমার দর্শন পেলেন। মা তাঁকে খুবই স্নেহের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং জগদ্ধাত্রী পূজার দিনই দীক্ষা দিলেন। ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে তিনি অবাক; কী আশ্চর্য, স্বপ্নে যাঁকে দেখেছেন—এ যে একেবারে সেই দেবীমূর্তি ! এই প্রসঙ্গে মণীন্দ্র বলেছিলেন, অসুখের সময় তিনি ঠাকুরকে বলতে শুনেছিলেন : "আমি অর্ধেক করেছি, বাকিটা ও (অর্থাৎ তাঁর লীলা-সঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা) করবে মানুষের মঙ্গলের জন্য।"

"কার ছেলে তুমি ?"

"আমি তোমারই ছেলে, মা।"

সেই প্রথম আমি মায়ের কণ্ঠস্বর শুনেছিলাম। তিনি আমাকে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। আমার উত্তর যেন তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর কলকাতার বাগবাজার এলাকার একটি বাড়িতে (হলুদের গুদাম একতলা থাকায় বাড়িটি 'গুদাম বাড়ি' নামেই পরিচিত ছিল)। তিনতলা বাড়ি—একতলায় গুদাম, দোতলা এবং তিনতলা বসবাসের জন্য ভাড়া দেওয়া। দোতলার পূর্ব অংশে দুটি ঘর, মধ্যে কিছু খোলা জায়গা। ঐ খোলা জায়গাটির পূর্ব অংশ দিয়ে একটি ছোট সিঁড়ি তিনতলায় উঠে গেছে। সেখানে শ্রীশ্রীমা গোলাপ-মায়ের সঙ্গে থাকতেন। গোপালের মা এবং অন্য স্ত্রীভক্তরা সেখানে প্রায়ই এসে দু-এক দিন করে থাকতেন। সেখানে তিনটি ঘর, সামনে দক্ষিণদিকে চওড়া ঘেরা বারান্দা, পশ্চিমে বড়-সড় খোলা ছাদ, শ্রীশ্রীমা সেখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতেন। গঙ্গার প্রতি মায়ের বিশেষ ভক্তি-ভালবাসা একেবারে বাল্যকাল থেকেই।

যাই হোক, আমার উত্তর শুনে গোপালের মা, তিনি আমার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন, শ্রীশ্রীমাকে বললেন ঃ "বৌমা, আমার গোপাল তোমার কাছে চমৎকার সব ছেলেদের এনে দেবে। আমার গোপালের টানে তারা এসে যাবে।" অপরিচিতের সামনে মায়ের মুখ ঘোমটায় ঢাকা থাকত। কিন্তু সেই মুহূর্তে তা নেই। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে। সেই দর্শনে আমার প্রাণে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। কী অপরূপ ! শান্ত মুখচ্ছবি—করুণায় সুকোমল, দিব্য আলোকে ঝলমল, মাতৃত্বের মহিমায় উন্নত। আশা-বিশ্বাসে ভরে গেল মন, অনুভব করলাম আমি পরম আশ্রয় পেয়েছি। তাঁর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন আমার বাড়ি কোথায়, মা-বাবা জীবিত আছেন কিনা। বললাম ঃ "না মা, কেউ নেই। এক বছরের মধ্যে তাঁদের দুজনকেই হারিয়েছি।" স্নেহ-দরদ ভরা গলায় মা বললেন ঃ "আ-হা, কী দুঃখের কথা ! কিন্তু বাছা, সেজন্য চিন্তা করো না। পার্থিব

বন্ধন ক্ষণিকের। আজ মনে হয় যথাসর্বস্ব, কাল তারা নেই। তোমার সত্যিকারের বন্ধন ভগবানের সঙ্গে, ঠাকুরের সঙ্গে। এখানে নিয়মিত আসবে, প্রসাদ নেবে।" গভীর ভাবাবেগে দুচোখ-ভরা জল নিয়ে বললাম ঃ "মা, আমি তোমাকে পেয়েছি, তুমি আমার জগজ্জননী, আমার সত্যিকারের মা, এটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি শুধু আমাকে করুণা কর, আশীর্বাদ কর।" মা বললেন ঃ "বাছা, ঠাকুর এরই মধ্যে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন। স্কুলে ছুটি থাকলেই এখানে এসে থাকবে। এখন প্রসাদ নিয়ে যোগেন, রাখালের কাছে যাও। তাদের পবিত্র সঙ্গ তোমার মনকে উঁচুতে তুলে দেবে, মন থেকে সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাবে।" শ্রীশ্রীমা আমাকে নিজহাতে ফল, মিষ্টান্ন দিলেন, আমি তখনই নেমে এলাম।...

মাস্টারমহাশয় প্রত্যেক শনিবার বিকেলে এখানে আসতেন। এবং রবিবার সন্ধ্যা, কখনো কখনো সোমবার সকাল পর্যন্ত থাকতেন। আমিও প্রায়ই রাত্রে মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে থাকতাম। তিনি আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমা সম্বন্ধে অনেক প্রেরণাপ্রদ ঘটনা বলতেন। ভক্তেরা সবাই এখানে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মায়ের কাছে দীক্ষাও পেতেন। আমি শুনলাম তিনি একদিন এক শিষ্যাকে বলছেন ঃ "অনেক সময়ে লঘু, চঞ্চল মনের মানুষ দীক্ষার জন্য আসে। আমি তাদের চেহারা, ভাবভঙ্গি দেখেই পূর্বজীবন বুঝতে পারি। জিজ্ঞাসা করি, আগে তারা অন্য কারও কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে কিনা। যখন বলে হ্যাঁ, তখন তাদের বলি, 'কী আশ্চর্য, তুমি আবার দীক্ষার জন্য এসেছ! তোমার গুরু যে-মন্ত্র দিয়েছেন তার উপর এতটুকু বিশ্বাস নেই? মন্ত্র ভগবানের পবিত্র নাম ছাড়া আর কি! তার পরেও তুমি দীক্ষার জন্য এলে কেন?' তখন তারা ক্ষমা চায়, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে মন্ত্রের জন্য অনুনয় করে। কারও কান্না আমি সহ্য করতে পারি না। তখন ঠাকুরকে ডেকে বলি, এদের বিশ্বাসে জোর এনে দাও। তারপর ঠাকুরের নির্দেশে নতুন মন্ত্র দিই। এই অতিরিক্ত মন্ত্র দিই ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভক্তি-বিশ্বাস

বাড়াবার শক্তি হিসাবে।" সেকথা শুনে শিষ্যা বললেন : "তোমার কৃপা এবং আশীর্বাদে তারা বেঁচে গেল।" মা তৎক্ষণাৎ বললেন : "না না, আমি কেউ নই। ঠাকুরই তাদের আশীর্বাদ করেন। আমি তাঁর যন্ত্রমাত্র।"

একদিন সন্ধ্যায় মাকে দর্শন করতে গেছি। কিন্তু মায়ের কাছে প্রথমেই না গিয়ে স্বামী যোগানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহি-ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে যেসব মনোহারী কথা বলছিলেন তা শুনতে বসে গেলাম। স্বামী যোগানন্দ বলছিলেন : "ঠাকুর জ্ঞানমূর্তি। ঠাকুর প্রায়ই আমাদের বলতেন, মা-কালীর কাছ থেকেই তাঁর সকল শিক্ষা। ঠাকুরের উপদেশ, কথা, গল্প—এ সবই তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, গভীর চিন্তাশক্তি এবং সূক্ষ্ম ক্ষমতার পরিচায়ক। ঐসব মনের মধ্যে নতুন আলো জ্বালায়, সমস্ত সন্দেহ দূর করে, সমস্যার সমাধান করে দেয়। তখন তাঁকে বুঝতে পারিনি। এখন যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন ঝলকে ঝলকে বুঝছি, ঐ মানবদেহমন্দিরে আশ্রয় পেয়েছিল কোন্ অনন্ত জ্ঞান ও অসীম প্রেম! সাধারণ কথা ও কাজও কত গভীর অর্থদ্যোতক তা বুঝতে পারি। বৈষ্ণবেরা যে বলে, শ্রীচৈতন্য গভীর সমাধিতে বা ঈশ্বর-উন্মত্ততায় যা-কিছু করেছেন সবই দিব্যলীলা—সেকথা ঠাকুর সম্পর্কেও সত্য, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝছি। ঠাকুর বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত। তাঁর প্রজ্ঞা, চরিত্র, অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়েছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ; উচ্চতম, নিম্নতম সব মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসত। কাউকে তিনি অবজ্ঞা করেননি—পাপী বা পুণ্যবান, যে-ই হোক। সাধারণ মানুষ তাঁর অপূর্ব জীবন, অম্লান পবিত্রতা, সীমাহীন ভালবাসা, অভূতপূর্ব তপস্যা, সর্বাত্মক অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এবং সুগভীর বাণী ও শিক্ষার পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধিতে সমর্থ নয়। পূর্ব পূর্ব ঋষি ও অবতারদের উপলব্ধি এবং শাস্ত্রসমূহে লিখিত অধ্যাত্ম-সত্যের উন্মোচন-কক্ষ তাঁর জীবন। নরেনকে তিনি সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে বিশেষভাবে এনেছিলেন তাঁর উচ্চ

আদর্শের প্রচারের জন্য, যাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণ হয়, মানবসমাজ উন্নীত হয়।"

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করলেন। তিনি বিশেষভাবে ঠাকুরের ভালবাসা-করুণার কথা বললেন। তিনি যখন সংসারত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ঠাকুর তাঁর শোকার্ত বৃদ্ধা মাতার কথা স্মরণ করিয়ে বলেন : "দেখ, তোমার ভাই সুরেন্দ্র মারা গেছে, এখন তোমার কর্তব্য জগন্মাতা জ্ঞানে নিজের মাকে সেবা করা। সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট থেকে বৈরাগ্য এলে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সংসারে থেকে মায়ের সেবা কর—তা-ই তোমার আদি কর্তব্য, তা-ই তোমার ধর্ম। আন্তরিকতার সঙ্গে তা করলে তুমি আধ্যাত্মিকতার পথে এগোতে পারবে।"

আমি একান্ত নিবিষ্ট মনে এই সব কথা শুনছিলাম। রাত বেশি হলে দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার চলে গেলেন। তখন আমার খেয়াল হলো মাকে দর্শন তো করা হয়নি। অথচ বিশেষভাবে সেজন্যই এসেছি। স্বামী যোগানন্দকে সেকথা বললাম। তিনি গোলাপ-মাকে ডেকে শ্রীশ্রীমাকে জানাতে বললেন। গোলাপ-মা উত্তরে জানালেন : "মা শুয়ে পড়েছেন।" আমাকে হতাশ এবং বিষণ্ণ দেখে স্বামী যোগানন্দ বললেন : "আর কিছু করার নেই। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কাল এস।" তাঁর কথা যেই শেষ হয়েছে, অমনি গোলাপ-মা আমাকে ডেকে বললেন : "মা তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। এখনই এস।" আমার বুক নেচে উঠল। তখনই উপরে উঠে গেলাম এবং মায়ের পাদস্পর্শ করার সৌভাগ্য হলো। মা জিজ্ঞাসা করলেন : "এত দেরি করলে কেন ?" উত্তরে বললাম : "মা, আমি যোগীন মহারাজ এবং দেবেন মজুমদারের কথাবার্তা এত মন দিয়ে শুনছিলাম যে, সময়ের খেয়াল ছিল না।" মা হাসলেন। তারপর বললেন : "তা বেশ। ঠাকুরের সঙ্গে দিব্যলীলায় মগ্ন ছিলে, তাই মাকে ভুলে গিয়েছিলে।" কোন যোগ্য উত্তর না দিতে পেরে আমি নিশ্চুপ। মা সস্নেহে বললেন : "বাবা, এখন বাড়ি যাও। অনেক রাত হয়ে গেছে।"

আনন্দে ভরপুর হয়ে নিচে নেমে এলাম, সাধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। নিজের মনে ভাবতে লাগলাম, শ্রীশ্রীমায়ের কী গভীর স্নেহ এবং দয়া আমার ওপর! রাত্রে বিছানা ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন কেবল আমাকে দর্শন দেবার জন্যই!

এখানে বলা দরকার, এই সময়ে জানাশোনা ভক্তদের পাঠানো বাইরের লোকেরা স্বচ্ছন্দে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে পারতেন ; আগে এ-ব্যাপারে যে কড়া বিধিনিষেধ ছিল, তা বহুলাংশে শিথিল করা হয়েছিল। নাগমহাশয় এই বাড়িতে (গুদাম বাড়ি) শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছিলেন ; তাঁকে শালপাতায় প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল। প্রসাদ খেয়ে পাতাটি ফেলে না দিয়ে সেটিও প্রসাদজ্ঞানে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন। তাঁর ভক্তি দেখে সকলে অবাক। প্রসাদের প্রতি কী ভক্তি—যে-পাতায় প্রসাদ দেওয়া হয়েছে সেটাও তাঁর কাছে পবিত্র এবং প্রসাদের অংশ। শ্রীশ্রীমা স্নেহচক্ষে নাগমহাশয়ের এই কাজ দেখে বললেন ঃ "ঠাকুরের কাছে অনেক ভক্ত এসেছেন, কিন্তু দুর্গাচরণের মতো ভক্ত মেলা ভার।" সেই দিব্যদৃশ্যের সাক্ষী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যখন ভাবাবেগে থরথর করতে করতে নাগমহাশয় কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছিলেন ঃ "কৃপাময়ী মা, কৃপার শেষ নেই, কৃপার শেষ নেই।"

ঐ বাড়িতে লক্ষ্মীপূজার দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে দীক্ষা দেন। মা সেদিন কত না আশীর্বাদ করেছিলেন, তা আমার মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল।

একদিন মাকে বললাম ঃ "ধ্যানের সময়ে ভালভাবে মনঃসংযোগ করতে পারছি না। আমার মন বড়ই তরল চঞ্চল।" মা হেসে উত্তর দিলেন ঃ "ওটা কিছু নয়। মনের ঐ স্বভাব, চোখ এবং কানের মতোই। নিয়মিত ধ্যান-জপ করে যাও। ভগবানের নামের আকর্ষণ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী। নিয়মিত অভ্যাস করলে সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। সর্বসময় ঠাকুরের কথা ভাববে, তিনি তোমাকে সর্বক্ষণ দেখছেন। তোমার ত্রুটি সম্পর্কে একদম

চিন্তা করবে না।" আমি বললাম ঃ "মা, আশীর্বাদ করুন যাতে আমি নিয়মিত অভ্যাস করতে পারি।" মা মিষ্টি হেসে বললেন ঃ "তোমার কথাবার্তা, কাজকর্ম ও অভ্যাস সম্পর্কে সৎ থাকবে। তাহলেই অনুভব করবে, কতখানি ধন্য তুমি। ঠাকুরের আশীর্বাদ সর্বক্ষণ জীবের উপর বর্ষিত হচ্ছে, তা চাওয়ার দরকার হয় না। ব্যাকুল হয়ে ধ্যান-জপ কর, তাঁর অসীম কৃপা বুঝতে পারবে। ভগবান চান ঐকান্তিকতা, সত্যবাদিতা, ভালবাসা। বাহ্যিক ভাবোচ্ছ্বাস তাঁর কাছে পৌঁছায় না। নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়ে নামজপ করবে, মন্ত্রোচ্চারণের সময়ে সর্বশক্তি দিয়ে মনকে একাগ্র করবে। যদি অন্য সমস্ত চিন্তা সরিয়ে দিয়ে হৃদয়ের গভীরতম আর্তির সঙ্গে তুমি প্রভুকে ডাকতে পার, তিনি সাড়া দেবেনই। করুণাময় তিনি, তোমার প্রার্থনা পূরণ করবেন।" ...

একবার মায়ের ইচ্ছায় আলমবাজার মঠের স্বামীজীরা মায়ের বাড়িতে প্রসাদ পেতে এলেন। ভাগ্যবশে তাঁদের সঙ্গে আমি একই ঘরে প্রসাদ পেয়েছিলাম। তবে মঠের মন্দিরের পূজায় ব্যস্ত থাকায় স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আসতে পারেননি। তাঁর অনুপস্থিতি সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দের হাত দিয়ে মা তাঁর জন্য প্রসাদ পাঠালেন। মায়ের ইচ্ছায় এবং গোলাপ-মায়ের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত নানা ধরনের সুখাদ্য সকলেই পরম পরিতোষ সহকারে আহার করেন।

বিখ্যাত নট ও নাট্যকার, শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহি-ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ওখানে মাঝে মাঝে আসতেন—স্বামী যোগানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। ...ঠাকুর ও মায়ের প্রতি গভীর ভক্তি, ওঁদের ঈশ্বরত্ব এবং সীমাহীন করুণা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস গিরিশচন্দ্রের উক্তিতে এমনভাবে প্রকাশ পেত যে, সেখানে উপস্থিত মানুষেরা অপূর্ব উদ্দীপনা বোধ করতেন। বহুদিন পরে একবার আমাকে তিনি বলেছিলেন, পূর্বে তিনি এবং সেইসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্য গৃহি-ভক্তেরাও মায়ের মহিমা বুঝতে পারেননি। "আমরা গুরুপত্নী

বলেই তাঁকে ভক্তি করতাম। তখন ঠাকুরই আমাদের কাছে সবকিছু—বন্ধু, পিতা, মাতা, পথপ্রদর্শক গুরু। নিরঞ্জনই (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) প্রথম আমার চোখ খুলে দেয়। জীবনের সেই পর্বে যখন প্রচণ্ড শোক-দুঃখে আমি আর্ত, বিচলিত, বিপর্যস্ত, কিছুতেই সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না, সেই সময় নিরঞ্জন প্রায়ই আসত, ধর্মপ্রসঙ্গ করে আমার মনকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করত। একদিন তাকে বললাম, 'ভাই নিরঞ্জন, কী দুর্ভাগ্য, এখন ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছি না—তিনিই ছিলেন আমার একমাত্র আশ্রয়।' নিরঞ্জন বাধা দিয়ে বলল, 'সেকি, মা তো আছেন। ঠাকুর আর মায়ের মধ্যে তফাত কোথায় ? লক্ষ্মী ছাড়া নারায়ণকে ভাবতে পারেন ? পার্বতী ছাড়া শিবকে, সীতাহীন রামকে এবং রাধা বা রুক্মিণীকে বাদ দিয়ে কৃষ্ণকে ?' আমি চমকে গেলাম, 'কি বলছ ?—ঠাকুর এবং মা এক, অভিন্ন ?' নিরঞ্জন উত্তরে বলল, 'বেশ, আপনি তো মনে করেন শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার। আপনি কি ভাবেন তিনি একজন সাধারণ নারীকে তাঁর লীলাসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন ? ঠাকুরের এই কথাগুলি অবশ্যই স্মরণে রাখবেন, ব্রহ্ম এবং শক্তি এক ও অভিন্ন—যদিও দুই রূপে আমাদের কাছে তাঁরা প্রকাশিত। মা স্বয়ং শক্তি, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি।' নিরঞ্জনের এই কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেল। মুহূর্তে মাতাঠাকুরানীর মধ্যে জগন্মাতাকে অনুভব করলাম। তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য আবির্ভূতা। শ্রীশ্রীমাকে দেখার জন্য তৎক্ষণাৎ জয়রামবাটী যাবার একান্ত তাগিদ মনে অনুভব করলাম। মাকে দেখবই, যিনি এই মহাদুঃখের দিনে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারেন, আমার শোক দূর করতে পারেন। নিরঞ্জন এই মনোভাবে সায় দিয়ে আমার সঙ্গী হতে চাইলেন। কিন্তু বলরাম বসু প্রবলভাবে আপত্তি জানালেন। আমি আমার পার্থিব দুঃখকষ্টের দ্বারা শ্রীশ্রীমাকে উৎপীড়িত করি, তা তিনি কোনমতেই চান না। সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার বাইরে ছিলেন। নিরঞ্জন তাঁকে পুরো ব্যাপারটি লিখে পরামর্শ চাইলেন। স্বামীজীর অনুমতি পেয়ে

আমরা দুজনে জয়রামবাটী যাত্রা করলাম। প্রথম কামারপুকুর যাওয়ার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। যে কুটিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেটিকে মনে হয়েছিল ঋষির পবিত্র তপোবন। তার নির্মল দৃশ্য ও পরিবেশ প্রাণমন কেড়ে নিয়েছিল। তারপর জয়রামবাটী গেলাম। সেখানে থাকাকালে সোজাসুজি মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তুমি কি আমার সত্যিকারের মা, না কি পাতানো মা?' মা বলেছিলেন, 'আমি তোমার সত্যিকারের মা'। গিরিশবাবু আমাদের কাছে তেজোময় ভাষায়, আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন : "হ্যাঁ, মা স্বয়ং জগজ্জননী—শহর থেকে বহুদূরে, এক গ্রামের গরিব মেয়ে হয়ে এসেছিলেন, যেখানে নগরজীবনের কর্মকোলাহল, বিষয়ী লোকের স্বার্থ, কৃত্রিম চটকদার জীবনযাত্রা নেই। আমি মায়ের কাছে কোন কিছুই প্রার্থনা করিনি। কিন্তু যখনই তাঁর কাছে গেলাম, আমার সমস্ত দুঃখকষ্ট এক মুহূর্তে চলে গেল, মনে অপূর্ব শান্তি অনুভব করলাম যা আগে কখনো পাইনি। আঃ, সেই দিনগুলি কী অপার্থিব আনন্দেই না কেটেছে!"

(স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও গিরিশ ঘোষের সেই জয়রামবাটী অবস্থিতি-কালে) একদিন জয়রামবাটীতে একটি ভিখারি এসে গান ধরল :

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা)।
(ও মা) লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবানী,
অন্নপূর্ণা নাম কি তোর, কাশীধামে?
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টিভিখারি।
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভঙ্করী—
বিশ্বেশ্বরী তুই বিশ্বেশ্বরের বামে?
খ্যাপা খ্যাপা আমার বলত দিগম্বরে,
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে,
এখন দ্বারী নাকি আছে দিগম্বরের দ্বারে,

দরশন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে।
হিমালয় বাস হর করিয়াছে,
ভিক্ষায় দিন রক্ষা এমন দিন গেছে,
এখন কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে।
ফিরেছে কি কপাল তোর কপালক্রমে ?
বিষয়বুদ্ধি বটে, বিশ্বাস হইল মনে,
তা না-হলে গৌরীর এতেক গৌরব কেনে ?
নয়নে না দেখে আপন সন্তানে,
মুখ বাঁকায়ে রয় শ্রীরাধিকার* নামে।
(* রাধিকা—সঙ্গীত রচয়িতার নাম)

ভিখারি গান শেষ করল। সেখানে উপস্থিত গিরিশবাবু, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ এবং অন্যান্যদের চোখ ততক্ষণে জলে ভরে উঠেছে। মা-ও এবং তাঁর মহিলা সঙ্গিনীরাও অশ্রুপাত করছিলেন। গানটি শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম জীবনের ঘটনাবলী মনে পড়িয়ে দিয়েছিল যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে জয়রামবাটী ও আশেপাশের গ্রামের লোকেরা 'পাগল জামাই' বলত, যখন মায়ের নিজের পিতা-মাতাই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মায়ের বিয়ে দেবার জন্য অনুতাপ করতেন, যখন প্রতিবেশীরা দুঃখ করত তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য। মা এইসব কথাবার্তার কোন প্রতিবাদ করতেন না, বা করতে পারতেন না। তিনি নীরবে এই সমস্ত অপমানের কথা সহ্য করতেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে জানতেন, তাঁর স্বামী সাধারণ পাগল নন, ঈশ্বরপাগল, সাধারণ মানুষের থেকে তিনি অনেক উন্নত স্তরের মানুষ। তারপর শ্রীশ্রীমা যখনই ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসতেন, তখনই উপভোগ করতেন দিব্য-আনন্দ। মা অন্য কারও বাড়িতে যেতেন না, কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেও নয়, পাছে লোকে তাঁর স্বামী সম্পর্কে অমর্যাদার কথা বলে, তাঁর মন্দভাগ্য নিয়ে ঠাকুরের দোষ দেয়। এখন শ্রীরামকৃষ্ণকে লোকে ঋষি, অবতার বলে মানছে, তাঁর পূজা হচ্ছে নানাস্থানে, লোকে ঐ গণ্ডগ্রামেও মায়ের দর্শনের জন্য আসছে, অনেক ভক্তই তাঁকে সাক্ষাৎ জগন্মাতা বলে মনে করছেন।

গানটি স্মরণ করিয়ে দিল পূর্বকথা, শ্রোতাদের মনে ভেসে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর প্রথম জীবনের কথা, তাই তাঁদের চোখে জল এসেছিল। আমি গিরিশ ঘোষের কাছে শুনেছি ঃ এক ঘণ্টারও অধিককাল সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো জলভরা চোখে বসে থেকেছিলেন।

আনন্দের দিনগুলি শেষ হয়ে এল। শুনলাম, কালীপূজার পর মা জয়রামবাটী ফিরে যাবেন। যাবার দিনে গিরিশবাবু এলেন। কোন কথা না বলে তিনি যোগানন্দ স্বামীকে ডেকে নিয়ে সোজা মায়ের কাছে চলে গেলেন। আমরা তাঁর পিছু পিছু গেলাম। গভীর ভাবাবেগ ও ভক্তিতে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তিনি করজোড়ে বললেন ঃ "মা, আমি যখনই তোমার কাছে আসি, আমার মনে হয় আমি তোমার কাছে ছোট শিশু, যেন নিজের মায়ের কাছে এসেছি। আমি যদি তোমার বড়সড় ছেলে হতাম, তাহলে মাকে সেবা করতে পারতাম। কিন্তু তার উলটোটাই হচ্ছে। তুমিই আমাদের সেবা করছ, আমরা করছি না। তুমি জয়রামবাটী যাচ্ছ লোকজনের সেবা করতে, এমনকি রান্না করেও খাওয়াবে। বল, কেমন করে আমি তোমার সেবা করতে পারি ? কি করে জগন্মাতার সেবা করতে হয়, তা কি আমি জানি ?" আবেগে রুদ্ধ হলো কণ্ঠ, মুখ রক্তাভ। আবার তিনি বললেন ঃ "মা, তুমি আমাদের মনের কথা সব জান। আমরা তো নিজের মনের ভাব বুঝতে পারি না। তোমার কাছে পৌঁছাবার যোগ্য আমরা নই। কিন্তু অসীম দয়া তোমার, সন্তানদের দেখা দিতে নিজেই এসেছ। যখনই তোমার এখানে আসার ইচ্ছা হবে, তৎক্ষণাৎ দ্বিধামাত্র না করে চলে আসবে। আমরা, তোমার সন্তানেরা, আমাদের মাকে দেখে কতই না আনন্দ পাই। তোমার সেবা করার সুযোগ দিয়ে আমাদের ধন্য করো।" আমরা পিছনে ছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ করে তারপর বললেন ঃ "মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, ঈশ্বর কখনো কখনো আমাদেরই মতো মানবদেহে আবির্ভূত হন। তোমরা কি অনুভব করতে পারছ, স্বয়ং জগন্মাতা গ্রাম্য নারীর বেশে

তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ? কল্পনা করতে পারছ কি, সাধারণ নারীর মতোই তিনি সমস্ত প্রকার গার্হস্থ্য ও সামাজিক কাজকর্ম করে থাকেন ? এসব সত্ত্বেও, তিনি স্বয়ং মহামায়া, মহাশক্তি, জীবের মুক্তির জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, একই সঙ্গে মাতৃত্বের পরম আদর্শও স্থাপন করে যাচ্ছেন।" উপস্থিত সকলের উপর তাঁর এই বক্তব্য গভীর প্রভাব বিস্তার করল। পরম প্রশান্তি ও মহিমায় ভরে গেল সম্পূর্ণ পরিবেশ। তা যেন তখন সাক্ষাৎ স্বর্গলোক—আধ্যাত্মিক আনন্দ ও আশীর্বাদে পূর্ণ।

মায়ের সঙ্গে আমরা রেলস্টেশনে গেলাম, তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলাম, তিনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীশ্রীমা কলকাতায় এসে কয়েকদিন কাটিয়ে গেলেন। বাগবাজারে গঙ্গার ধারে তাঁর জন্য ভাড়া করা একটি বাড়িতে তিনি ছিলেন। স্বামী যোগানন্দ মায়ের দেখাশোনা করবার জন্য ছিলেন। তাছাড়া আরও দুজন ছিলেন—দীন মহারাজ এবং কৃষ্ণলাল মহারাজ। কৃষ্ণলাল তখন ব্রহ্মচারী। শেষের দুজন বাজার-হাট ইত্যাদি ঘরকন্নার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা যখন কলকাতায় এলেন, ঘটনাচক্রে স্বামীজীকেও সেই সময় দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আসতে হলো তাঁর প্রিয় শিষ্য খেতড়ির রাজা অজিত সিংহের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখানে বলা প্রয়োজন, এর কিছুদিন আগে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী দার্জিলিং গিয়েছিলেন। মা তখন জয়রামবাটীতে তাঁর গ্রামে। ভারতে ফেরার পরে, কলম্বো থেকে কলকাতা আসার পথে স্বামীজীকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল। অনবরত সাক্ষাৎকার, মানপত্র গ্রহণ এবং একের পর এক বক্তৃতাদান—এ সব করতে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনের কয়েকদিন পরেই তিনি কয়েকজন গুরুভাই এবং তরুণ শিষ্যসহ দার্জিলিং চলে গিয়েছিলেন।

খেতড়ির রাজা আরও কয়েকজন দেশীয় রাজার সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন—সকলেই রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের হীরকজয়ন্তী

উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে লণ্ডনে যাচ্ছেন। মহারাজার একান্ত ইচ্ছা ছিল, স্বামীজী তাঁর সঙ্গী হবেন। সমুদ্রযাত্রাকালে বাধ্যতামূলক বিশ্রামে স্বামীজীর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটবে। তাই তিনি স্বামীজীকে কলকাতায় আসতে আহ্বান করেছিলেন যাতে যাত্রার পূর্বে প্রয়োজনমত ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। তদনুযায়ী স্বামীজী দার্জিলিং থেকে কলকাতায় এলেন। শিয়ালদহ্ স্টেশনে নামামাত্র সেখানে সমবেত গোটা মারোয়াড়ী সমাজের পক্ষে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হলো। তাঁকে মানপত্র দেওয়া হলো। মহারাজা অজিত সিংহকে অগ্রণী করে ব্যবসায়ী সমাজের শিরোমণিরা সংবর্ধনায় এগিয়ে এসেছিলেন। কারণ এই ব্যবসায়ীদের অনেকেই মহারাজার অধীনস্থ জমিদার, আর স্বামীজী মহারাজার সম্মানীয় অতিথি ও পূজনীয় গুরুদেব। স্বামীজীকে সরাসরি মহারাজার কলকাতার বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হলো। পরের দিন বিকালে স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গেলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে তাঁরা আলমবাজার মঠে নামলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সান্ধ্য আরতি দেখবার জন্য। যাবার পূর্বে উভয়েই প্রসাদ গ্রহণ করলেন। কথামৃতকার মাস্টারমহাশয়ের সঙ্গে দুই জায়গাতেই উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। পরদিন বিকালে দুজন তরুণ ব্রহ্মচারী শিষ্যকে নিয়ে স্বামীজী বাগবাজারে এলেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। আমি তখন স্বামী যোগানন্দের কাছাকাছি বসে ধর্মপ্রসঙ্গ করছিলাম। স্বামীজীর আসার সংবাদ শুনেই যোগানন্দ স্বামী তাঁকে অভ্যর্থনা করতে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। কুশল বিনিময়ের পর স্বামীজী যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন : "মা এবং তাঁর সঙ্গিনীরা ভাল আছেন তো ?" যোগানন্দ বললেন : "ঠাকুরের কৃপায় এখানে সব কুশল। কিন্তু দার্জিলিং-এ তোমার শরীর কেমন ছিল ?" ইত্যাদি কুশল বিনিময়ের পরেই স্বামীজী সোজা মায়ের কাছে চলে গেলেন, আমরা তাঁর পিছু পিছু গেলাম।

এক স্মরণীয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। পাশ্চাত্য থেকে বিপুল যশগৌরব নিয়ে প্রত্যাবৃত্ত স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের এই

সাক্ষাৎ-দৃশ্যটি দেখার সৌভাগ্য যে অল্প কয়েকজনের হয়েছিল তাঁরা প্রত্যেকেই তখন আনন্দে বিহ্বল। মা অন্য দিনের মতো অবগুণ্ঠনে আবৃত থেকে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্বামীজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। পৃথিবীখ্যাত বিবেকানন্দ শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে অনুগত সন্তানের মতো শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণত। দীর্ঘ সাত বছর পরে স্বামীজীকে দেখলেন শ্রীশ্রীমা। তিনিও গভীরভাবে আলোড়িত, স্থির, নির্বাক, যেন সমাধিমগ্ন। গোটা পরিবেশ অবর্ণনীয় মহিমা ও দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ।

প্রণাম করার সময়ে স্বামীজী মায়ের পাদস্পর্শ করেননি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে উপস্থিত সকলকে বললেন ঃ "যাও, মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, কিন্তু পাদস্পর্শ করো না। উনি এতই কৃপাময়ী, কোমলপ্রাণা, স্নেহাতুরা যে, কেউ ওঁর পাদস্পর্শ করলে উনি তৎক্ষণাৎ তার জ্বালা-যন্ত্রণাকে টেনে নেন নিজের মধ্যে। তার ফলে অপরের জন্য ওঁকে নিঃশব্দে ভুগতে হয়। একে একে ধীরে ধীরে গিয়ে ওঁকে প্রণাম কর, গোটা মনঃপ্রাণ দিয়ে ওঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা কর, কিন্তু মুখে কোন কথা নয়। উনি সর্বদা এমন অতিচৈতন্যালোকে থাকেন যে, প্রত্যেকের অন্তরের সংবাদ জানেন।" স্বামীজীর নির্দেশে আমরা সবাই গিয়ে আস্তে আস্তে মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। স্বামীজী শান্তভাবে বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমাদের প্রণাম শেষ হলে গোলাপ-মা নিস্তব্ধতা ভেঙে খুব স্নেহভরা স্বরে স্বামীজীকে ডেকে বললেন ঃ "মা জানতে চাইছেন দার্জিলিং-এ তোমার শরীর কেমন ছিল ? কোন উন্নতি হয়েছে কি ?"

স্বামীজী ঃ "হ্যাঁ, ওখানে আগের থেকে ভাল ছিলাম। মহেন্দ্র বাঁড়ুজ্জে এবং তাঁর সুশিক্ষিতা স্ত্রী আমাদের যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করেছেন। আমার মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

গোলাপ-মা ঃ "মা বলছেন, ঠাকুর সর্বদাই তোমার সঙ্গে আছেন। তোমাকে সমাজের উন্নতির জন্য আরও অনেক কিছু করতে হবে।"

স্বামীজী ঃ "মা, আমি পরিষ্কার দেখছি, মনেপ্রাণে অনুভব করছি যে, আমি ঠাকুরের হাতের যন্ত্র ছাড়া কিছু নই। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, কি করে এইসব ব্যাপার সম্ভব হচ্ছে, কি করে পাশ্চাত্যের স্ত্রী-পুরুষে ঠাকুরের বাণী প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসছে ! মা, আপনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম। তারপর যখন বক্তৃতা করে সেখানকার লোকেদের মুগ্ধ করতে পারলাম, তাদের কাছ থেকে বিরাট সংবর্ধনা পেলাম, তখন বুঝতে পারলাম মায়ের আশীর্বাদের ফলেই এই অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছে। যখন একান্তে থেকেছি, তখন স্পষ্টই অনুভব করেছি, ঠাকুর যাঁকে বলতেন মা-কালী, তিনিই আমার পথ দেখিয়েছেন।"

মায়ের উত্তর গোলাপ-মা স্বামীজীকে জানালেন ঃ "ঠাকুর মা-কালীর থেকে পৃথক নন। ঠাকুরই এই বিরাট জিনিসগুলি তোমাকে দিয়ে করিয়েছেন। তুমিই তাঁর নির্বাচিত শিষ্য এবং সন্তান। তোমার প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা, তিনি সকলকে বলেই গিয়েছিলেন, তুমি একদিন পৃথিবীর আচার্য হবে।"

গভীর আবেগের সঙ্গে স্বামীজী বললেন ঃ "মা, আমি তাঁর বাণী প্রচার করতে চাই, আর সেজন্য যত শীঘ্র সম্ভব একটি সঙ্ঘ স্থাপন করতে চাই। কিন্তু যত দ্রুত তা করতে চাইছি, ততটা দ্রুত পারছি না বলে কষ্ট পাচ্ছি।"

মা এবার নিজেই কোমল স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন ঃ "চিন্তা করো না তুমি যা করেছ, আর যা করবে সবই চিরকালের জিনিস। এই কাজের জন্যই তুমি এসেছ, হাজার হাজার মানুষ তোমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আচার্য বলে গ্রহণ করবে। স্থির জেনো, ঠাকুর শীঘ্রই তোমার ইচ্ছা পূরণ করবেন। দেখবে অল্পদিনের মধ্যে তোমার ভাব কার্যকরী হচ্ছে।"

প্রার্থনার সুরে স্বামীজী বললেন ঃ "মা, আশীর্বাদ করুন, আমার কাজের পরিকল্পনা যেন শীঘ্র রূপায়িত হচ্ছে দেখতে পাই। দু-এক

দিনের মধ্যে দার্জিলিং-এ ফিরে যাচ্ছি। কলকাতায় এসেছিলাম খেতড়ির মহারাজের অনুরোধে।" এই কথা কয়টি বলে, স্বামীজী আবার মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।...

স্বামী যোগানন্দ সর্বদাই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধার ভাষায় মায়ের প্রসঙ্গ করতেন। অনর্গলভাবে বলে যেতেন, কেমন করে একেবারে শিশুবয়স থেকে সকল পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মা উদাসীন থেকেছেন, কী তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ স্বভাব, অকলঙ্ক চরিত্র, শিশুসুলভ সারল্য, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সকলের প্রতি সহানুভূতি, সহৃদয়তায় পূর্ণ অন্তর, অসীম মাতৃস্নেহ, গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং অধ্যাত্ম-পথগামীদের অন্তরে উদ্দীপনা সঞ্চারে ও তাকে ঊর্ধ্বায়িত করায় তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা! তাঁর কথা এখনো সকলের বিশেষ জানা নেই, তবু নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের পুরাণ এবং ইতিহাসের বিরাট আধ্যাত্মিক চরিত্রদের মতোই মহামহিমময়ী।

ঠাকুর এবং মায়ের পবিত্র সম্পর্ককে ভুল বুঝে কিভাবে সন্দেহ করেছিলেন, সেকথাও স্বামী যোগানন্দ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বোধহয় রাত্রে গোপনে মায়ের ঘরে যান। দক্ষিণেশ্বরে মা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের কাছেই নহবতখানায় থাকতেন। একদিন রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নহবতখানার দিকে যেতে দেখে স্বামী যোগানন্দের মনে সন্দেহ জাগে। তিনি পিছনে অতি সাবধানে তাঁর অনুসরণ করতে থাকেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতখানার পাশ কাটিয়ে নিজের মনে এগিয়ে যেতে লাগলেন, মায়ের ঘরের দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। তিনি ঝাউতলার দিকে যাচ্ছিলেন শৌচাদির জন্য। জ্যোৎস্নাভরা রাত। যোগানন্দ মায়ের ঘরের দিকে নজর করে দেখলেন, শ্রীশ্রীমা সেই মধ্যরাত্রেও নহবতের বারান্দায় গভীর ধ্যানে মগ্ন। অধ্যাত্ম-আলোকোজ্জ্বল মায়ের মুখ, বাহ্যচেতনাহীন, আত্মনিমজ্জিত। সে এক দিব্য দৃশ্য! শ্রীরামকৃষ্ণের মতো শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষের সাধুত্বকেও তিনি সন্দেহ করেছেন, এর গ্লানিতে

যোগানন্দের মন পূর্ণ। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পদধ্বনি শুনতে পেলেন। তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে উত্তরের বারান্দায়, যেখানে তাঁর বিছানা সেদিকে চললেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, ঠাকুর তাঁকে আগেই ধরে ফেলেছেন। তিনি পুরো ব্যাপারটিই বুঝেছিলেন। অপ্রস্তুত শিষ্যকে সান্ত্বনা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে জোরের সঙ্গে বলেছিলেন ঃ "বেশ, বেশ। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।"

যোগানন্দ যখন এই ঘটনাটি বলছিলেন তখন গভীর আবেগে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। শেষে বললেন ঃ "ঠাকুর এবং মায়ের সেই ছবি আমার স্মৃতি থেকে কখনো মুছে যাবে না। আমি তখন বুঝেছিলাম, ওঁরা দুজনেই ঈশ্বরস্বরূপ, লক্ষ লক্ষ ভক্তের জন্য করুণায় দেহধারণ করেছেন। ন্যায়বোধ, পবিত্রতা, ঐশ্বরিকতা, স্বার্থহীন সেবা এবং সত্যের আদর্শ তাঁরা আমাদের কল্যাণে রেখে যাবেন। রেখে যাবেন দুর্বল, পতিত, অসহায়, পদদলিত মানুষের প্রতি তাঁদের ভালবাসা, মনুষ্যজাতির দুর্গতিমোচনের জন্য তাঁদের তুলনাহীন ত্যাগ। তাঁরা এসেছিলেন মানুষের মন থেকে সমস্ত সন্দেহ এবং হতাশাকে দূর করতে, বিশ্বাস এবং ভালবাসায় তাকে উজ্জীবিত করতে, উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত করতে ; কিকরে সুখদুঃখ সম্বন্ধে নির্লিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে থাকতে হয়, কিভাবে ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হয়ে কর্তব্য করতে হয় তা দেখিয়ে দিতে। ঠাকুরের মতো মা-ও অত্যন্ত সরল জীবন যাপন করতেন। তাঁর উপদেশ-নির্দেশ, তাঁর প্রজ্ঞাবচন— সকলই তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল, সেগুলি কারও ধার করা কথা নয়, গ্রন্থ থেকেও সংগৃহীত নয়। ঠাকুর এবং মা দুজনেই দেখিয়ে গেছেন, আধুনিক যুগের এই জটিল বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যেও কি করে শুদ্ধসত্ত্ব সরল জীবন যাপন করা যায়।"...

শ্রীশ্রীমা যাবতীয় গার্হস্থ্য এবং সামাজিক কাজে সক্রিয় থেকেও সর্বদা দিব্যভাবে আবিষ্ট থাকতেন, অবিচলিত থাকতেন জীবনের সঙ্কটে, যন্ত্রণায়। যখনই আমি তাঁর দর্শনে গেছি, তাঁকে সেই একই

প্রকার স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী মাতারূপে দেখেছি। করুণাঘন শান্ত তাঁর দুই নয়ন, জগজ্জননীর দিব্যজ্যোতিতে তা সমুজ্জ্বল। তাঁর উপস্থিতি আমার মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি করত, ভাষায় তার প্রকাশ সম্ভব নয়।

একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা এখানে বলা প্রয়োজন। কয়েক দিনের মধ্যে স্বামীজী দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফেরেন। তার পরেই তিনি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১ মে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে নিজের কল্পনাকে রূপায়িত করতে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সাপ্তাহিক সভাগুলি সাধারণভাবে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় বাগবাজারে বলরাম-মন্দিরে অনুষ্ঠিত হতো। এরকম কয়েকটি সভার সময়ে শ্রীশ্রীমা তাঁর সঙ্গিনী ও শিষ্যাদের নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। স্বামীজী প্রায়শঃ এইসব সভায় সভাপতিত্ব করতেন, অনেক গান গাইতেন, বিশেষতঃ যদি শ্রীশ্রীমা উপস্থিত থাকতেন।

বলরাম বসুর বাড়িতে স্বামী যোগানন্দ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের মধ্যে একবার একটি অসাধারণ তাৎপর্যময় আলোচনা হয়েছিল।... ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাইয়ের মাঝামাঝি স্বামী যোগানন্দ আলমোড়া থেকে কলকাতায় সবেমাত্র ফিরেছেন। দুমাস আগে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন।... গিরিশ ঘোষের সঙ্গে কথাবার্তার সময়ে স্বামী যোগানন্দ বলেছিলেন ঃ "স্বামীজী একটি স্ত্রী-মঠ স্থাপন করতে চান, সেটি সরাসরি শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে পরিচালিত হবে। এই মঠে ঠাকুরের সমস্ত শিষ্যারা একত্রে থাকতে পারবেন। অন্য মহিলারা, পাশ্চাত্যের মহিলারাও, যদি ত্যাগ-বৈরাগ্য-সাধনার জীবন যাপন করতে চান, এখানে বাস করতে পারবেন। তাঁরা ঠাকুরের শিষ্যাদের পবিত্র সঙ্গ করে অতীতের অনুষঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং দেখবেন আদর্শের জীবন্ত রূপ। বালবিধবা এবং অবিবাহিতা মহিলাদের মধ্যে যাঁরা উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য এবং সমগ্র দেশের মহিলাদের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করতে চান, তাঁরাও মহিলা-মঠের সদস্যা হতে পারবেন। শ্রীশ্রীমা হবেন তাঁদের কাছে আদর্শ-প্রতিমা, তাঁর আশীর্বাদে তাঁদের

ধর্মীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে, তাঁদের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হবেন প্রাচীনকালের গার্গী-মৈত্রেয়ীর মতো ব্রহ্মবাদিনীরা; এমনকি আমাদের পুরাণ ও ইতিহাস কথিত প্রাচীন বীররমণী ও ব্রহ্মবাদিনীদের থেকেও তাঁরা অনেক বড়মাপের হয়ে দাঁড়াবেন। মায়ের ব্যক্তিগত জীবন এবং চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিসম্ভূত বাক্যাবলী, তাঁর সমুন্নত ভালবাসা এবং যত্ন মঠের সদস্যাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে তাঁদের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলবে, তাঁদের সামনে খুলে দেবে নতুন আদর্শের জগৎ। তাঁরা সর্বোচ্চ মানবকল্যাণের পথে অগ্রসর হবেন নির্ভয় বিশ্বাসে।"

স্বামী যোগানন্দ বললেন ঃ "স্বামীজী গভীর আবেগের সঙ্গে আমাকে বলেছেন, 'আমাদের মাতাঠাকুরানী বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির ভাণ্ডার, যদিও আপাতভাবে গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত। তাঁর আবির্ভাব ভারতবর্ষের ইতিহাসে নবযুগোদয় সূচনা করেছে। যে-আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করেছেন, যার প্রকাশ তিনি করছেন, তা কেবল ভারতীয় নারীদেরই মুক্তি দেবে না, পরন্তু সমস্ত পৃথিবীর নারীদের মন ও হৃদয়ে প্রবেশ করে তাদের প্রভাবিত করবে। মাতৃত্বই নারীত্বের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তা প্রত্যেক নারীরই সহজাত বৈশিষ্ট্য যা ক্ষুদ্র বালিকার মধ্যেও দেখা যায়'।"

স্বামী যোগানন্দ আরও বললেন ঃ "পাশ্চাত্যের সামাজিক কাঠামো নারীর জায়ারূপের উপরে নির্ভরশীল। কিন্তু মাতৃত্বই ঐশ্বরিক ভালবাসার যথার্থ প্রকাশ—তা বিশাল, মহান, আকাশের মতো প্রশস্ত। ভারতীয় সমাজে এখন বিভিন্ন বিদেশীয় জাতি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে নানাপ্রকার রীতিনীতি, ভাব প্রবেশ করেছে। তার ফলে আমাদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত মাতৃত্বের যথার্থ আদর্শ বর্তমানে ক্রমেই বিদূরিত হয়েছে—ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মধ্যে এসেছিলেন নিজ জীবন এবং উপলব্ধির দ্বারা এই মহান আদর্শকে পুনর্জীবিত করে তুলে ধরতে। এমনকি বিভিন্ন ধর্মপথে সুকঠিন সাধনার কালেও শ্রীরামকৃষ্ণ কখনো

ঈশ্বরের মাতৃভাবের আদর্শ থেকে সরে যাননি। তিনি ভৈরবী-ব্রাহ্মণীকে তাঁর প্রথম পথপ্রদর্শক এবং গুরু বলে মেনেছিলেন। সম্পূর্ণ সন্ন্যাসের কালেও তিনি কখনো পত্নীকে ত্যাগ করেননি, যাঁকে তিনি নিজ মাতা চন্দ্রাদেবীর মতো জগজ্জননী বলে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে তিনি বিশুদ্ধ ভালবাসা এবং ভক্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর কাছে জগন্মাতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এই উপলব্ধি কোন ভাবগত বা আদর্শায়িত বিভ্রম নয়। ঐশ্বরিক উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে দিব্যানন্দজাত এই প্রত্যয়। শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ-করুণা পার্থিব সম্পর্কজাত নয়, তা দিব্যপ্রেমের উৎস থেকে স্বতোৎসারিত—অবতারের বৈশিষ্ট্য যা। সকল সন্তানের কল্যাণ ও সেবায় উৎসর্গীকৃত তাঁর জীবন, কোন পার্থিব সম্পর্কজনিত নীচ পার্থক্যবোধ সেখানে নেই—এ সমস্তই মাতৃত্বের চরম আদর্শ। তাঁর কৃপা কেবল আত্মীয়-পরিজন, ভক্ত অথবা গ্রামের লোকেদের উপরেই বর্ষিত হয় না, তা অফুরন্ত, অব্যাহত, অসীম। তা বর্ষিত হয় সমাগত সকল প্রার্থীর উপরই। ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সকল কাজই মাতার ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা আছে তাঁর জীবনে। স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃত্বের এই আদর্শ সম্পর্কে সর্বদাই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধায় বলে থাকেন, তাঁর ধারণায় প্রতিটি দেশের নারীদের আত্মোন্নতিতে সহায়ক হবে এই আদর্শ। আর শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশে এবং উৎসাহে পরিচালিত সন্ন্যাসিনীদের মঠটি হবে এই মহান আদর্শ প্রচারের মূল কেন্দ্র।"

গিরিশ ঘোষ উত্তরে বললেন ঃ "নতুনভাবে আমাদের সমাজ সংগঠন এবং নারীদের উন্নতির জন্য সত্যই কী অভিনব সাহসী চিন্তা স্বামীজীর! স্বামীজীর ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করতে আমার কোনই দ্বিধা নেই। কিন্তু বড়ই কঠিন কাজ, বিশেষতঃ এখন স্বামীজীর স্বাস্থ্যের যা অবস্থা। বর্তমানে তাঁকে এই দুরূহ দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেওয়াটা কতদূর সঙ্গত জানি না। অবশ্য তিনি আমাদের যা করতে বলবেন, বিনা দ্বিধায় আমরা তা করব।

কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন, ডাক্তারেরা তো সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতেই পরামর্শ দিয়েছেন।"

স্বামী যোগানন্দ বললেন ঃ "সমাজ এবং মানুষের উন্নতির জন্য যা করা উচিত বলে সে মনে করে, দৈহিক অসুস্থতা বা অন্য কোন বাধা তা থেকে তাকে নিরুৎসাহ বা নিবৃত্ত করতে পারবে না। স্বাস্থ্যের এই বর্তমান অবস্থাতেও এ ছাড়া তার মাথায় অন্য কোন চিন্তা নেই। তার স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন দেখে সে কেবল মৃদু হাসে। স্ত্রী-মঠ শুরু করার বিষয়ে তার সকল পরিকল্পনার কথা শোনার পর তাকে বললাম, 'সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যাকিছু করা প্রয়োজন মনে করছ, তা-ই কর। কিন্তু দোহাই, মাকে এখনই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরো না। ঠাকুর কি বলতেন, স্মরণ আছে তো—জনসমাজে তাঁর [শ্রীরামকৃষ্ণের] প্রচার শুরু করলে তাঁর শরীর থাকবে না? একই কথা মায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমি তাই হাবিজাবি সকলকে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, অন্ততঃ দর্শনকালে তাঁর পাদস্পর্শ করতে দিই না। আমি চাই শুদ্ধস্বভাব, আন্তরিক ভক্তেরাই তাঁর দর্শন পাক। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, মাকে এখন ব্যস্ত করো না। তুমি এখন অন্য পবিত্রচরিত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন মেয়েদের নিয়ে স্ত্রী-মঠের কাজ আরম্ভ করতে পার, যাঁরা জ্ঞান-কর্মের বিভিন্ন ধারায় নিষ্ণাত, পুরুষদের বা সাধুদের সাহায্য না নিয়েও যাঁরা সঙ্ঘ চালাতে সমর্থ।' আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র স্বামীজী আমাকে প্রাণ থেকে ধন্যবাদ দিয়ে সহাস্যে বললেন, 'মন্ত্রী, তুই আমাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছিস। ঠাকুরের সতর্কবাণীকে মনে করিয়ে ভালই করেছিস। আমি মাকে ব্যস্ত করব না। তাঁর অভিপ্রায় তিনিই ভাল জানেন, তাকে তিনিই সিদ্ধ করবেন। সেখানে কথা বলবার আমরা কে? তাঁর আশীর্বাদে আমরা সবকিছু সমাধা করব। তাঁর আশীর্বাদের শক্তি আমি দেখেছি, অনুভব করেছি তাঁর আশীর্বাদের অলৌকিক শক্তি।' সুতরাং স্ত্রী-মঠের পরিকল্পনায় থাকার জন্য স্বামীজী আর মাকে অনুরোধ করে বিব্রত করবে না।"

এসব শুনে গিরিশবাবু বললেন ঃ "যোগেন মহারাজ, তুমি মস্ত কাজ করেছ। এখন বুঝতে পারছি স্বামীজীর সঙ্গে তোমার আলমোড়া যাবার হেতু কি। যোগেন, শোন, মায়ের আশীর্বাদের অপূর্ব প্রকাশের আমিই এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত! একবার আমি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি, ডাক্তারেরা আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিদারুণ যন্ত্রণায়, রোগের অন্যান্য উপসর্গের ফলে ছটফট করছিলাম। একরাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক নারীমূর্তি, মমতায় ভরা মাতৃমুখ, তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাছা, শীঘ্রই তোমার অসুখ সেরে যাবে।' আমাকে পান করবার জন্য ওষুধ দিলেন। তারপর স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। আমি গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে রইলাম দীর্ঘসময়। খুব আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিন সকালে আমি প্রায় সুস্থ, রোগতাপ যেন নেই, পূর্ণ নিরাময় ঘটে গেল অচিরে। এ ব্যাপারটা তখন থেকেই আমার কাছে রহস্য হয়ে আছে। এ-জাতীয় অলৌকিকতার সঙ্গে আমি তখনো অপরিচিত। তখনো তো ঠাকুর অথবা মায়ের দর্শনের এবং তাঁদের আশীর্বাদলাভের সৌভাগ্য হয়নি। পরে জয়রামবাটী গিয়ে মাতাঠাকুরানীকে দেখে অবাক—আরে, এঁকেই তো স্বপ্নে দেখেছি—ইনিই তো স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে আমাকে ওষুধ দিয়েছিলেন, সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। আরও বুঝতে পারছি, মায়ের কৃপাতেই ঠাকুরের নিকটে এসে তাঁর চরণে আশ্রয়লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁরই আশীর্বাদে তাঁর করুণালাভের ভাগ্য, এবং তোমাদের সকলের বিশেষতঃ স্বামীজীর সঙ্গলাভের ভাগ্য আমার হয়েছে। স্বামীজী—আহা—কিশোর বয়সেই গুরুমহারাজের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন।" *

অনুবাদ ঃ সুদীপ বসু

---

* মূল স্মৃতিকথাটি 'Prabuddha Bharat' পত্রিকায় (Vol. LVII, 1952) প্রকাশিত হয়েছিল। 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে বর্তমান বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

ভগিনী সুনন্দাদেবী

মাদ্রাজের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ। তিনিই পথিকৃৎ—স্বামী বিবেকানন্দ যাঁকে দক্ষিণ ভারতে পাঠিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাজ শুরু করবার জন্য। সেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি ডঃ পি. বেঙ্কটরঙ্গমকে (আমার পিতৃদেবকে) একটি চিঠি লিখে জানালেন যে, জগজ্জননী সারদাদেবী ব্যাঙ্গালোরে আসতে সম্মত হয়েছেন এবং তাঁর ও তাঁর সঙ্গের আরও দশজনের সেখানে থাকবার সব ব্যবস্থা যেন করা হয়।[১] মহীশূর রাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে ডঃ বেঙ্কটরঙ্গম ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোক্তা এবং স্তম্ভস্বরূপ।

শ্রীশ্রীমা এলেন ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। বাসভনগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ঠাকুরঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হলো। মনে আছে, শ্রীমা ব্যাঙ্গালোরে এসেছিলেন কোন এক শুক্রবার এবং ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে গিয়েছিলেন কোন এক সোমবারে। তাঁর উপস্থিতিতে বহু লোকের ভিড় হতো। তাঁরা সকলেই তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতেন। ডঃ পি. বেঙ্কটরঙ্গম তাঁর স্ত্রীকে একদিন আশ্রমে পাঠালেন। সঙ্গে একটা চিঠি দিয়ে আশ্রমের স্বামীজীকে অনুরোধ করলেন, তাঁর স্ত্রীকে যেন শ্রীমার দর্শনলাভের সুযোগ করে দেওয়া হয়। আমিও আমার মায়ের সঙ্গে ছিলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে, শ্রীমা এবং আমার মায়ের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল। আমার মা বাংলা জানতেন না, শ্রীমাও তামিল জানতেন না। তবুও দুজনেই বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে গেলেন; মাঝে মাঝে হাসিকৌতুকও করছিলেন। যেভাবে তাঁরা কথা বলছিলেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, দুজনেই দুজনের কথা বুঝতে পারছেন—ভাষার বাধাটা তাঁদের

---

১ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের চিঠিটির ফটো কপি দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

দক্ষিণ ভারতে 'জগজ্জননী' সারদাদেবীর ভ্রমণ বিষয়ে সংবাদ দিয়ে ব্যাঙ্গালোরের ডঃ পি. বেঙ্কটরঙ্গামকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পত্রের ফটো

[শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সৌজন্যে]

Mylapore
1. 2. 11

My dear doctor,

A very happy news to you. Our most holy Mother is on Her way to Rameswaram. She is coming here to bless all of you. You should never lose this very rare and unexpected opportunity to worship the Motherhood of God in Her. She is your real Mother. Come and be blessed by Her. She is expected here on the 11th of this month. Please collect as much money as you can from your friends, and admirers of our Mission. We shall have to meet the expenses of a big party consisting of ten souls. See that our holy Mother does not lack in [anything]. Feel within your [being] that the whole responsibility is on you and you alone. It is so fortunate you are to have the Mother of the Universe at your very door ! Come to worship Her as soon as She places Her holy feet on this soil. With my best love and blessings.

I am
Yours affly.,
Ramakrishnananda

Dr. P. Venkatarangam,
Frasertown Dispensary,
Frasertown,
New Extension,
Bangalore.

কাছে কোন সমস্যা নয়। একদিন এইরকম কথাবার্তার মাঝে আমার মা-বাবা প্রস্তাব করলেন, আমাকে এবং আমার বোনকে তাঁরা শ্রীমায়ের সেবায় উৎসর্গ করতে চান। উত্তরে শ্রীমা বললেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবার পক্ষে আমরা তখন খুবই অল্পবয়স্ক ; আমরা যখন বড় হব তখন যেন তাঁর কাছে আসি। আমার তখন মাত্র তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স। শ্রীমায়ের কাজে (অর্থাৎ সন্ন্যাসিনীর জীবন বরণ করবার জন্য) নিজেদের উৎসর্গ করবার জন্য আমি এবং আমার মেজবোন কলকাতা যাত্রা করতে পেরেছিলাম ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর। সঙ্গে ছিলেন আমার মাসতুতো [?] বোন এবং স্বর্গত এম. রাজাগোপাল নাইডু। কলকাতায় পৌঁছে অবশ্য হতাশ হতে হলো। শুনলাম শ্রীমা স্থান-পরিবর্তনের জন্য জয়রামবাটী গেছেন। মনে সত্যিই একটা ধাক্কা খেলাম।

এই প্রসঙ্গে, একটি দূর-প্রদেশে নতুন পরিবেশে আমাদের প্রথম প্রথম কিরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা বর্ণনা করা অসঙ্গত হবে না। আমরা সেখানকার ভাষা জানতাম না। রেলস্টেশন থেকে সোজা উদ্বোধনে পৌঁছেছিলাম। তখন বিকেলবেলা। প্রথমেই যাঁর সঙ্গে দেখা হলো, তিনি হলেন স্বামী সারদানন্দ। আমরা যতদিন কলকাতায় ছিলাম, তিনিই ছিলেন আমাদের অভিভাবক। কলকাতায় থাকবার দ্বিতীয় দিন আমরা বেলুড় মঠে গেলাম। যখন বেলুড় মঠ দর্শন করতে গিয়েছিলাম, স্বামী ব্রহ্মানন্দ মঠে ছিলেন না। আমরা স্বামী শিবানন্দের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাদের নতুন জীবনে প্রবেশের জন্য অনেক উপদেশ ও উৎসাহ দিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমরা ইংরেজী ছাড়া আর কোন ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারতাম না। নতুন জায়গায় অপরিচিতির অস্বস্তি এবং বাড়ির জন্য মন-কেমন করা—এই দুয়ের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য নিবেদিতা স্কুল এবং শ্রীসারদা মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষা ভগিনী সুধীরা সন্ধ্যাবেলাগুলি আমাদের সঙ্গে কাটাতেন। তিনি ইংরেজী জানতেন, আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। আমাদের বাংলা না জানার ফলে

অনিবার্যভাবেই আমরা যেন শিশুদের 'সরাসরি পদ্ধতিতে' ইংরেজী শেখানোর দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছিলাম। দু-তিন মাসের মধ্যেই আমরা বাংলা শিখে ফেললাম। ভাষার ব্যাপারে আর কোন সমস্যা রইল না।

শ্রীমায়ের দেখা পাওয়ার আগে এই দু-তিন মাস[1] অতিক্রান্ত হবে—এটি সম্ভবতঃ দৈবনির্দিষ্টই ছিল। কারণ, আমরা যদি এর আগেই তাঁর দর্শন পেতাম, তাহলে আমাদের দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলতে হতো, এবং আমরা মন খুলে কথা বলতে পারতাম না। আমাদের কলকাতা পৌঁছানো এবং জয়রামবাটী থেকে ফেরার পরে শ্রীমায়ের সাক্ষাৎ লাভ—এই দুয়ের মাঝে আমরা যথেষ্ট সময় পেয়ে গিয়েছিলাম বাংলা শেখার জন্য। যখন তাঁর দর্শন পেলাম, তখন তিনি প্রথমেই যে-কথাগুলি আমাদের বললেন, তা হলো : "মা, আমি তোমাদের জন্য জয়রামবাটীতে অপেক্ষা করছিলাম। তোমরা এলে না বলে আমি নিজে তোমাদের কাছে এসেছি।" মাতৃস্নেহে ভরপুর এই কথাগুলি আমাদের প্রাণে শিহরণ জাগাল। যেটুকু অপরিচয়ের ভাব অবশিষ্ট ছিল, তা-ও চলে গেল।

মাতৃমন্দির থেকে উদ্বোধন হেঁটে যাওয়া যেত। আমরা প্রায়ই মাতৃমন্দিরের অন্যদের সঙ্গে গিয়ে শ্রীমাকে দর্শন করতাম। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে গিয়ে যতটা কায়িক সেবা তাঁকে করতে পারি, করতাম। আমার পরম সৌভাগ্য, আমাকে বলা হয়েছিল, প্রতিদিন সকাল নটা নাগাদ মা যখন স্নান করতে যেতেন, তার আগে তাঁর গায়ে-মাথায় তেল মাখিয়ে দিতে। এই সময় অনেক পাকা চুল তাঁর মাথা থেকে খসে পড়ত। আমি কখনো সেগুলি ফেলে দিতাম না। ছোটছোট গোছা সংগ্রহ করে আমি সেগুলি শাড়ির আড়ালে লুকিয়ে রাখতাম। মা একদিন আমাকে ওরকম করতে দেখে ফেললেন। হেসে বললেন যে, তাঁর কত চুল উঠে গেছে, তিনি সেসব ফেলে

---

[1] এই সময়কাল চার-পাঁচ মাস হওয়া উচিত। কারণ, ভগিনী সুনন্দা ব্যাঙ্গালোর থেকে রওনা হয়েছেন ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর, এবং পরে দেখব, ভগিনী সুনন্দা বলেছেন, শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে কলকাতা ফিরেছিলেন ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের [illegible] ১৯১৮।—সম্পাদক।

দিয়েছেন। আমি তাঁর চুল রেখে দিতে আগ্রহী জানলে, তিনি সেসব চুল আমাকেই দিতেন।

একদিন সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় শ্রীমাকে দর্শন করবার জন্য আমাদের ডাকা হলো। তিনি আমাদের বললেন, তাঁর সামনে তামিল ভাষায় কথা বলতে। আমাদের কয়েকটা তামিল গান গাইতেও বললেন। গান শুনে মা খুব খুশি হয়ে আনন্দে হাসতে লাগলেন। আর এক দিন আমরা যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছি, তিনি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন রাধুর জন্য কিছুটা দক্ষিণ ভারতের 'রসম' তৈরি করে পাঠাতে। আমরা তাড়াতাড়ি 'রসম' তৈরি করে তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। আর একটা দক্ষিণ ভারতীয় রান্না তিনি খেতে চেয়েছিলেন—সেটি হলো 'রাইস- আপ্পালমস্'। আমার বাবা এটি তৈরি করিয়ে রেলওয়ে পার্সেল করে ব্যাঙ্গালোর থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মা খেয়ে নিশ্চয়ই আনন্দ পেতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রেলওয়ে পার্সেলে এসেছে বলে কয়েকজন প্রাচীনপন্থী মহিলা মাকে তা খেতে দিলেন না।

একবার এক মেঘলা দিনে, আমি উদ্বোধনে গিয়েছিলাম মাকে প্রণাম করতে। তিনি সাদরে আমাকে গ্রহণ করলেন। আমি তখন প্রায়ই শূলবেদনায় ভুগতাম বলে তিনি সেদিন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। আকাশে মেঘ ছিল—সেদিনকার আবহাওয়ার সঙ্গে ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়ার মিল ছিল। মা সেটি লক্ষ্য করে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাঙ্গালোরের আবহাওয়াও কি সেই রকম নয়? তার পরে বললেন, ব্যাঙ্গালোর তাঁর খুব ভাল লেগেছিল। সেখানকার লোকের প্রশংসা করে মা বললেন, তাদের খুব ভক্তি। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মাতৃমন্দিরের মেয়েদের তীর্থভ্রমণের জন্য বেনারস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে গিয়ে আমি শূলবেদনায় ভুগেছিলাম। আমরা ফিরে আসার কিছু পরেই মা সেই খবর পেলেন। যে-মেয়েরা তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছিল, তাদের একজনের কাছে মা আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজখবর করলেন এবং

তিন-চারটে কমলালেবু খাবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এরকমই ছিল তাঁর মাতৃহৃদয় !

শ্রীমা জয়রামবাটী থেকে ফিরেছিলেন ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। তারপর যখন তাঁর কাছে দীক্ষার কথা তুলেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে, পরদিনই দীক্ষা দেবেন। কিন্তু আরও একটি মেয়ে বহুদিন ধরে তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রার্থী ছিল। সে তখন মাতৃমন্দিরের অন্যান্য আবাসিকদের সঙ্গে খাসীপাহাড় অঞ্চলে গিয়েছিল। তার জন্য আমার দীক্ষার দিনও স্থগিত থেকে গিয়েছিল। অবশেষে সেই পবিত্র অবিস্মরণীয় দিনটি এল ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। সেদিন ছিল রথযাত্রা। আমার সঙ্গে মাতৃমন্দিরের আরও তিনজন দীক্ষালাভ করল শ্রীমার কাছ থেকে। আমরা গঙ্গাস্নান করে নতুন কাপড় পরে উদ্বোধনে গিয়েছিলাম সকাল প্রায় আটটার সময়। আমাদের সঙ্গে আরও দীক্ষার্থী ছিল এবং সকলের দীক্ষা সকাল দশটার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। মা এক এক করে নাম ধরে ডেকে নিয়ে দীক্ষা দিচ্ছিলেন। দীক্ষা দেওয়ার পর মা প্রাতরাশ করলেন এবং মায়ের প্রসাদ আমাদের সকলকে দেওয়া হলো। প্রসাদ নেওয়ার আগে, আমরা যারা দীক্ষা নিয়েছিলাম তারা সবাই মায়ের শ্রীচরণে ফুল দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলাম। আমরা তারপর মাতৃমন্দিরে ফিরে এলাম। দুপুরের আহারের জন্য আবার উদ্বোধনে গেলাম।

একদিন আমার মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল যে, মায়ের কাছ থেকে বিশেষ কোন কৃপা পেতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলা মাকে প্রণাম করতে গেলাম। যারা উপস্থিত ছিল, তাদের সবাইকে শ্রীমা সেদিন কিছুটা সন্দেশ-প্রসাদ ভাগ করে দিলেন। যখন আমার পালা এল, তাঁর হাত থেকে ফসকে প্রসাদ তাঁর পায়ে গিয়ে পড়ল। তিনি সেটি তাঁর পা থেকে তুলে নিয়ে আমাকে দিলেন। আমি এই ঘটনাকে মায়ের বিশেষ কৃপা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। মায়ের এই মাতৃস্নেহের নিদর্শন আরও একদিন পেয়ে-

ছিলাম। সেদিন গঙ্গাস্নান করে সোজা তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। চুল ভিজে ছিল। মা স্নেহস্নিগ্ধভাবে বললেন যে, আমি চুল না শুকিয়ে ঐভাবে থাকলে আমার সর্দি লেগে যাবে। তিনি আমার চুল খুলে দিলেন যাতে শুকোতে পারে। আর একদিন আমার ইচ্ছা হলো প্রাতরাশ করার আগেই মায়ের দেখা পেতে। উদ্দেশ্য মাতৃদর্শনের পূর্ণ আধ্যাত্মিক ফল লাভ। আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, মা প্রথমেই যে-প্রশ্নটি করলেন সেটি হচ্ছে, আমি সকালের খাবার খেয়ে এসেছি কিনা। তিনি আমাকে কিছু প্রসাদ দিলেন ; তারপর আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। একদিন মা তাঁর নীলচে সবুজ রঙের শালটি সেলাই করবার জন্য আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেলাই করবার সময় একটা তিনকোনা টুকরো বাড়তি হয়ে যাওয়ায় কেটে ফেলার প্রয়োজন হলো। শালটাকে সেই অনুযায়ী ছেঁটে ঠিক করা হলো। মায়ের আশীর্বাদের নিদর্শনস্বরূপ ঐ টুকরোটি এখনো সযত্নে রাখা আছে।

আমরা দু-বছরের বেশি হলো বাড়ি ছেড়ে এসেছি। স্বামী সারদানন্দের মনে হলো, স্থান-পরিবর্তনের জন্য আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। যাবার জন্য সব ব্যবস্থা করা হলো। আমাদের যদিও অনিচ্ছাই ছিল, তবুও আমরা তখন বয়োজ্যেষ্ঠদের উপদেশ অনুযায়ীই চলতাম। যাত্রার দিন মায়ের কাছে গেলাম তাঁর আশীর্বাদ নিতে। তিনি শুধু আমাদের আশীর্বাদই করলেন না, আমাদের কিছু মিছরি এবং ঠাকুরের নির্মাল্য দিয়ে বললেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে।

ব্যাঙ্গালোরে আমরা মাত্র কুড়ি দিন ছিলাম। কারণ, খবর পেলাম যে, মা গুরুতর অসুস্থ ও শয্যাশায়ী। আমরা তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফেরবার জন্য যাত্রা করলাম। কলকাতা পৌঁছেই মায়ের কাছে গেলাম তাঁকে প্রণাম করতে। মা শয্যাশায়ী হলেও অত্যন্ত সজাগ। আমাদের ওখানকার সকলের খোঁজখবর করলেন তিনি। মায়ের স্বাস্থ্য দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে শুরু করল এবং তাঁকে সব সময় দেখাশুনো করার জন্য একজন সেবিকার প্রয়োজন হলো। প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (সরলা দেবী) মায়ের সেবাশুশ্রূষার ভার গ্রহণ করলেন। ইনি বিশেষ যত্নসহকারে ধাত্রীবিদ্যা শিখেছিলেন। মাতৃমন্দিরে

আমাদের সঙ্গে একই ঘরে থাকতেন ইনি। মাতৃমন্দিরের মেয়েদের পালা-করে মায়ের কাছে রাত্রি জাগার জন্য এবং তাঁর সেবা করার জন্য নিয়োগ করা হলো। আমার সময় ছিল রাত দুটো থেকে ভোর চারটে। সেবার জন্য যাকে পাঠানো হতো, মা তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি আমাকে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা শরীরে হাত বোলাতে বলতেন। আমরা সব সময় খুব সতর্ক থাকতাম। কারণ, সামান্য একটু শব্দ হলেই পাশের ঘর থেকে স্বামী সারদানন্দের গলা শোনা যাবে, তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন, কি হয়েছে। এরকম এক রাতে, মায়ের একটু বিকারের মতো হয়েছিল। কখনো বলছেন বেলুড় মঠে যাবেন, কখনো বা বলছেন ব্যাঙ্গালোরে। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম ঃ সেরে উঠুন, তারপর ঐসব জায়গায় যাবেন। এই শুনে তিনি শান্ত হয়ে গেলেন। মা মশারির মধ্যে শুয়ে থাকতেন বলে আমি মশারির ভিতরে ঢুকে মায়ের সেবা করতাম। বহুবার আমাকে তিনি বলেছেন, তাঁরই সঙ্গে মাদুরে শুয়ে পড়তে। (যখন তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁকে খাট থেকে মেঝেতে মাদুরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।) যদিও এটা একটা মহাসুযোগ ছিল, তবুও সব সময়ই আমি ইতস্ততঃ করতাম এবং মনে মনে খুব ভয় পেয়ে যেতাম। আমার সৌভাগ্য যে, প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণার সঙ্গে একই ঘরে থাকতে পেরেছিলাম। মায়ের সেবা ও শুশ্রূষা করতেন বলে তিনি মায়ের নখ-কাটার সুযোগও পেতেন ; সুযোগ পেতেন তাঁর গা-হাত-পা টিপে দেবারও। এই নখ-কাটা এবং গা-হাত-পা টিপে দেবার সুবাদে তিনি মায়ের নখ, চুল ইত্যাদি সংগ্রহ করে রেখে দিতেন। ভারতীপ্রাণার সংগ্রহে মায়ের যে নখ, চুল ইত্যাদি ছিল, সেগুলি তিনি, যখনই আমি অনুরোধ করেছি, তৎক্ষণাৎ আমায় দিয়ে দিয়েছেন। সেই পবিত্র স্মারক বস্তুগুলি বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরের মাতৃমন্দিরে পূজিত হয়। মায়ের সেবাশুশ্রূষা করবার সময় একবার তাঁর পুরনো একটি শাড়ি ব্যাজ (ব্যাণ্ডেজ ?) তৈরি করার জন্য ছিঁড়তে হয়। শাড়িটা ছিঁড়ে টুকরো করতে বলা হয়েছিল আমাকে। শেষে

পাড়-সহ একফালি কাপড় শুধু অবশিষ্ট ছিল। পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আমি সেটি রেখে দিয়েছিলাম। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমা যখন ব্যাঙ্গালোরে এসেছিলেন, তখন তাঁর যে পায়ের ছাপ নেওয়া হয়েছিল, সেটিও [ব্যাঙ্গালোরের] মায়ের মন্দিরে সুরক্ষিত আছে।

শ্রীমায়ের অবস্থা দিনের পর দিন, খুব দ্রুতগতিতে, খারাপ হয়ে চলল। মহাসমাধির তিনদিন আগে থেকে আমাদের আর তাঁর সঙ্গে থাকতে দেওয়া হলো না। আমরা শুধু তাঁকে দর্শন করে মাতৃমন্দিরে ফিরে আসতাম। অবশেষে একদিন ভোরবেলা গোলাপ-মা এসে আমার কানে কানে বললেন ঃ অবশ্যম্ভাবী মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে গেছে। অতঃপর মহাসমাধিতে মগ্ন শ্রীমায়ের স্নিগ্ধ মুখশ্রী আমরা দেখলাম। তাঁর নশ্বর দেহ এরপর বেলুড় মঠে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরাও বেলুড় মঠে রওনা হলাম। মাকে স্নান করানোর ভার আমাদের দেওয়া হলো। স্নান করানো শেষ হলে, মায়ের দেহ চিতায় শুইয়ে অগ্নিসংযোগ করা হলো। তাঁর সব 'মেয়ে'ই সুযোগ পেলেন চিতায় ঘি এবং অন্যান্য উপকরণ ঢালতে। যখন ঘি ইত্যাদি ঢালছি, তখন চিতার আগুনের শিখা আমার হাত ছুঁয়ে গেল। মায়ের সেই অন্তিম স্পর্শ আমি দীর্ঘকাল অনুভব করেছি। তাঁর সব 'মেয়ে'ই উপবাস করেছিলেন—এই ধরনের উপলক্ষে যা করতে হয়। আমরা দিনে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতাম। রাতটা কিছু ফল খেয়ে কাটিয়ে দিতাম। শ্রীমায়ের যে পুণ্য সান্নিধ্য আমি লাভ করেছিলাম, স্থূল জগতে এইভাবে তার পরিসমাপ্তি হলো।

শ্রীমায়ের কাছে রোজ যখন যেতাম, তখন একদিন খুব স্নেহভরে তিনি আমায় বলেছিলেন, অন্ততঃ একবারের জন্য জয়রামবাটী দেখে আসতে। মায়ের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে। কুড়ি দিন সেখানে ছিলাম। খুব আনন্দে অতিবাহিত হয়েছিল দিনগুলি।*

অনুবাদ ঃ স্বামী বলভদ্রানন্দ

---

* Vedanta Kesari, December 1973-সংখ্যায় প্রকাশিত 'Reminiscences of Sri Sarada Devi' (pp. 339-342) প্রবন্ধের অনুবাদ। (দ্রঃ শতরূপে সারদা, পরিশিষ্ট)—সম্পাদক